আযাদী ও লড়াই

ছয় মাস চব্বিশ দিন ভারতীয় জালেমদের কারাগারে বন্দী থাকার পর, আল্লাহপাকের অপার অনুগ্রহে কতিপয় নওজোয়ানের দুঃসাহসী অভিযান ও ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে অকল্পনীয়ভাবে আমার মুক্তিলাভ ও মুসলিম বিশ্বের গৌরব ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে উপস্থিতির বিস্ময়কর ঘনটাবলী ও পরবর্তী তৎপরতা
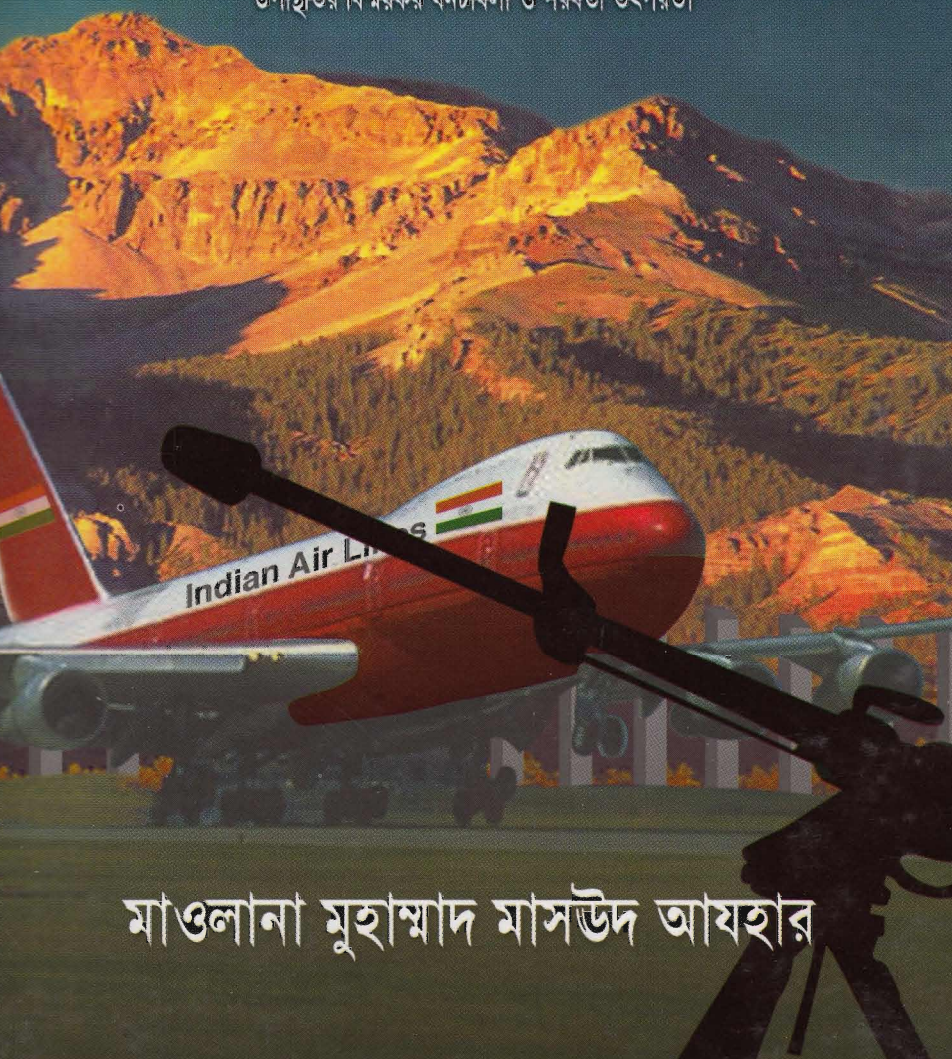
মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার

আযাদী ও লড়াই

ছয় বৎসর চব্বিশ দিন ভারতীয় জালেমদের কারাগারে বন্দী থাকার পর, আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে কতিপয় নওজোয়ানের দুঃসাহসী অভিযান ও ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে অকল্পনীয়ভাবে আমার মুক্তিলাভ ও মুসলিম বিশ্বের গৌরব 'ইমরাতে ইসলামিয়া' আফগানিস্তানে উপস্থিতির বিস্ময়কর ঘটনাবলী ও পরবর্তী তৎপরতা।

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার

অনুবাদ

আবূ উসামা

ইমাম, শিক্ষক ও অনুবাদক

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

....

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আযাদী ও লড়াই

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার
অনুবাদ ঃ আবূ উসামা

প্রকাশক
আবূ আবদিল কাদির
মুমতায লাইব্রেরী
ঢাকা, বাংলাদেশ

পরিবেশক
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
....
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১-১৪১৭৬৪, ০১৭২-৮৯৫৭৮৫

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ সফর ১৪২৬ হিজরী, মার্চ ২০০৫ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ রবিউল আউয়াল ১৪২৪ হিজরী, মে ২০০৩ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ শাওয়াল ১৪২৩ হিজরী, ডিসেম্বর ২০০২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে কাশ্মীরের আযাদীর জন্য **প্রাণ** উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে।

শহীদী কাফেলায় অন্তর্ভুক্তির বুক ভরা আশা নিয়ে।

—আবূ উসামা

কাশ্মীর রণাঙ্গনে

আমি কেন, কখন, কিভাবে ভারত গেলাম। সেখানে আমার মিশন কি ছিল। বাবরী মসজিদে কিভাবে উপস্থিত হলাম। কাশ্মীর কি উদ্দেশ্যে গেলাম। তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের স্তর কিভাবে পার হলাম। প্রাথমিক তিনটি টর্চারিং সেন্টারে আমার উপর কি কি নির্যাতন হল। কারাগারের দিনগুলো কিভাবে কাটলো ইত্যাদি সকল প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর নিয়ে এই বই।

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার

অনুবাদ

আবূ উসামা

শিক্ষক ও অনুবাদক

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসংখ্য ডাকটিকেটে আবৃত একটি প্যাকেট আমি অফিসে গিয়ে আমার ডেস্কের উপর পেলাম। প্রেরকের নাম–ঠিকানা দেখেই হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্যাকেটটি খুলে আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কিতাব معرکہ (আযাদী ও লড়াই) পেয়ে আনন্দের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)এর এ কিতাবটির জন্য আমি সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করেছি। স্নেহের ছোট ভাই মুসলেহ উদ্দীন করাচী থেকে আগেরবার যে কিতাবগুলো এনেছিল তার মধ্য হতে مسکراتے زخم (কাশ্মীর রণাঙ্গনে) কিতাবটি রহস্য উপন্যাসের মত গভীর রাত অবধি জেগে দ্রুত শেষ করেছি। কিতাবটি শেষ হওয়ার পর (ছোট গল্পের সংজ্ঞায় যেরূপ বলা হয়েছে) 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ' এর অবস্থা হৃদয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কারণ শেষোক্ত কিতাবটির বিষয়বস্তু ছিল মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেবের ভারত সফর, বাবরী মসজিদে উপস্থিতি, কাশ্মীর রণাঙ্গনে হাজির হওয়া, মুজাহিদদের সাথে মুলাকাত ও হঠাৎ গ্রেফতার হওয়ার মত ঘটনা। যার প্রতি ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে বিপদের ভয়ংকর আশংকা, ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ ও অনিশ্চয়তায় ভরা ভবিষ্যতসহ টর্চারিং সেন্টার ও জেলখানায় অত্যাচারিত হওয়ার মর্মান্তিক উপাখ্যান।

কিন্তু তিনি ছয় বৎসর চব্বিশ দিন ভারতীয় জালেমদের কারাগারে অমানবিক নির্যাতন সহ্য করার পর আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে কিরূপ অলৌকিকভাবে ইমারাতে ইসলামিয়া, আফগানিস্তানের তৎকালীন অস্থায়ী প্রশাসনিক রাজধানী কান্দাহারে পৌঁছলেন তার বিস্তারিত বিবরণ ও এ যুগের মুজাহিদদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দিক–নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব হলো معرکہ (আযাদী ও লড়াই)। যার দরুন স্বাভাবিকভাবেই مسکراتے زخم (কাশ্মীর রণাঙ্গনে) কিতাবটি পাঠ করার পর معرکہ (আযাদী ও লড়াই) কিতাবটি পাঠ করার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করেছি। তাই এ কিতাবটি হাতে পেয়ে অন্তর থেকে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করি এবং ভাই মুসলেহ উদ্দীনের জন্য প্রাণ ভরে দুআ করি।

পরবর্তীতে আমরা যখন مسکراتے زخم বইটি 'কাশ্মীর রণাঙ্গনে' নামে প্রকাশ করি এবং অচিরেই معرکہ –এর অনুবাদ 'আযাদী ও লড়াই' নামে প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করি, তখন আমাদের সুধী পাঠক সমাজ খুবই আগ্রহ ভরে 'কাশ্মীর রণাঙ্গনে' বইটি হাতে হাতে নেন, যার দরুন আমাদের বাইণ্ডিং সেকশন তাদের সমস্ত শ্রমিককে এ বই বাইণ্ডিং এর কাজে লাগিয়েও বারবার আমাদের চাহিদা মিটাতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমার মতো অন্যান্য পাঠকও 'কাশ্মীর রণাঙ্গনে' বইটি পাঠ করেই 'আযাদী ও লড়াই' বইটি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা সত্ত্বেও বইটি প্রকাশ করতে কাংখিত সময়ের চেয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। এ সময়ে আমাদের আগ্রহী পাঠকবৃন্দের অনেকেই বার বার চিঠি লিখে কেউবা ফোন করে বইটি সম্পর্কে জানতে চান এবং তাদের ব্যাকুল প্রতীক্ষার কথা জানান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه 'আযাদী ও লড়াই' নামক বইটি এখন আপনাদের হাতে। অনুবাদ প্রাঞ্জল, সাবলীল ও ঝরঝরে হয়েছে। ফলে পাঠক অনুবাদ পাঠ করেও ইনশাআল্লাহ মূলের স্বাদ পাবেন।

আমরা আমাদের সাধ্যমত বইটিকে মানসম্পন্ন ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে দিবো।

আমাদের এ বইটি পড়ে যদি কারো মধ্যে সত্যিকারের জিহাদী জযবা সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

আগামীতে আরো কতিপয় দুষ্প্রাপ্য জিহাদ বিষয়ক কিতাব আপনাদের খেদমতে পেশ করার আশা রেখে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জান–মাল নিয়ে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

২২শে রমাযানুল মুবারক
১৪২৩ হিজরী

আবূ আবদিল কাদীর
মুমতায লাইব্রেরী, ঢাকা

অনুবাদকের আরয

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকৃত মর্দে মুমিন, জিহাদী পথের সিপাহসালার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেব ১৪১৪ হিজরীর ২৮শে শাবান কাশ্মীর রণাঙ্গন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের জালিম সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন। তিনি কাশ্মীর ও ভারতের বিভিন্ন টর্চারিং সেন্টার ও কারাগারে দীর্ঘ ছয় বছর ২৪ দিন বন্দী থাকেন।

তিনি কিভাবে বন্দী হন, তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের স্তর কিভাবে অতিক্রম করেন, টর্চারিং সেন্টারসমূহে কেমন অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন, ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রকাশিত হয় আমাদের প্রথম বই 'মুসকারাতে যখমের' অনুবাদ 'কাশ্মীর রণাঙ্গনে'।

'আযাদী ও লড়াই' এ বিষয়ের পরবর্তী বই 'মা'রেকা'–এর বঙ্গানুবাদ। এটি আল্লাহ পাকের অপার নুসরাতে কতিপয় তরুণ মুজাহিদের ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের দুঃসাহসী অভিযানের মাধ্যমে ভারতের কারাগার থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহারের অকল্পনীয়ভাবে মুক্তিলাভ, আফগানিস্তান গমন, তারপর স্বদেশে এসে জিহাদী তৎপরতার বিবরণ স্বয়ং তাঁরই ক্ষুরধার লেখনীর সাবলীল ভাষা এবং হৃদয়ে নাড়া দেওয়ার মত আবেদনশীল উপস্থাপনার সমাহার।

জিহাদ সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের পাঁচ শতাধিক আয়াত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীস, তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্বে সত্তরাধিক জিহাদ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তীকালের মুসলিম নেতৃত্বের যুদ্ধসমূহের মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও উপকারিতা দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে। জিহাদ পরিত্যাগের কুফল চিহ্নিত করে।

কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ অসংখ্য রণাঙ্গনে অসীর লড়াইয়ে বারবার শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সম্মুখ সমরের পথ পরিহার করে তাদের ঐতিহ্যমত হীন চক্রান্তের কুপথ অবলম্বন করে মসীর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। তারা একদিকে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম, মুসলমানদেরকে

সন্ত্রাসী জাতি এবং জিহাদকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডরূপে জোর প্রচারণা চালায়। অপরদিকে পদ, নারী ও অর্থ দ্বারা মুসলমান নামধারী দেশ, জাতি ও ধর্মের দুশমনদেরকে ক্রয় করে মুসলমানদের মধ্যে 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' সত্য কথাটিকে কুমতলবে ব্যবহার করে জিহাদ থেকে মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে রাখার বহুমূখী হীন চক্রান্ত চালায়। এ ব্যাপারে তারা বিশেষভাবে সফলতাও লাভ করে। ফলে আজ মুসলমানদের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে নানারকম সন্দেহ–সংশয় ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। অথচ দেহের জন্য তপ্ত খুন যেমন জরুরী, মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জিহাদও ঠিক তেমনই জরুরী। খুন চলাচল বিঘ্নিত হলে, কিংবা খুন হিমশীতল হয়ে পড়লে দেহ যেমন নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়, এমনকি দেহের অস্তিত্ব ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তেমনি আজ মুসলিম উম্মাহর দেহ জিহাদের তপ্ত খুন থেকে শূন্য হওয়ায় বহুমূখী ব্যাধিতে জর্জরিত। এমনকি আজ তার অস্তিত্ব ধ্বংসের সম্মুখীন।

সুধী পাঠক! 'আযাদী ও লড়াই' পুস্তকটিতে বিদগ্ধ লেখক মুসলিম উম্মাহর ধ্বংসাত্মক এ ব্যাধির কারণ, উপকরণ ও প্রতিকার স্বচ্ছ ভাষা এবং শক্তিশালী বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। সত্যকে জানার নির্মল মনোবৃত্তি নিয়ে এ বই পাঠ করলে পাঠক সঠিক পথের সন্ধান লাভ এবং সমস্ত সংশয়ের যথার্থ উত্তর লাভে ধন্য হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই আমাদের অনুবাদের এ প্রয়াস।

অনুবাদের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা, দুর্বলতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু হয়ত নানা ভুল–ভ্রান্তি সুধী পাঠকের গোচরীভূত হবে। আমাদেরকে সেগুলো অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধনের পথ সুগম হবে।

অনুবাদ, প্রকাশনা ও পরিবেশনায় যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বইটি পাঠক–মুখ দেখছে, আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইহ–পরকালে এর যথার্থ পুরস্কার দানে ভূষিত করুন।

বই প্রকাশের এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি সর্বান্তকরণে মহান আল্লাহর শোকর গুজারী করছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর উৎসর্গপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম এবং নিবেদিতপ্রাণ আল ও আওলাদের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম পেশ করছি।

হে আল্লাহ! আমাদের এ মেহনতকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে জিহাদের পথে পরিচালিত করে ইহ–পরকালে সফলতায় ভূষিত করুন। আমীন।

বিনয়াবনত
আবূ উসামা
২৪শে রমাযান ১৪২৩ হিজরী
৩০শে নভেম্বর ২০০২ ঈসায়ী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থনা প্রসঙ্গে দু'টি কথা	১৫
সুতোর গুটি	১৫
অগ্নিশিখা ও শিশির	১৬
নৌকায় ছিদ্র	১৬
কৃপণের পাত্র	১৭
উর্দূ সাহিত্যের ট্রাজেডি	১৮
সাহিত্য রুচির পরিতৃপ্তি	১৮
এবার বই হাতে নিন	১৯
আসসালামু আলাইকুম	২১
জম্মু থেকে কান্দাহার	২৫
মুক্তিলাভ	৩০
আরেকটি দুআ	৩৫
একটি চিত্র, একটি জবাব	৪১
সূচনার সন্ধানে	৪৪
পরিস্থিতির এপিঠ ওপিঠ	৪৬
একটি ঘটনা, একটি শিক্ষা	৫০
আল্লাহপ্রেমিকদের সঙ্গে ঈদের কয়েকটি মুহূর্ত	৫৭
কিছু কাজের কথা	৬০
বিরান না আবাদ	৬৪
মধুবর্ষী সেই শব্দমালা	৬৮
আলোকময় প্রদীপ	৭২
প্রিয় এ উপঢৌকন	৭৬
কাশ্মীর জিহাদের উপর আরোপিত সন্দেহ-সংশয় ও তার অপনোদন	৭৮
শহীদদের খুনের শক্তি	৮১
সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিভাবে করব তীরের মুকাবেলা	৮৭
উদারমনা হোন	৯৩
দুরন্ত কাফেলা	৯৭
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বোনদের নামে	১০০
সৌভাগ্যবতী বোনেরা	১০৫
মুসলমান হত্যা	১০৭
কালিমার মান রক্ষা করুন	১১২
আকাবিরদের সবর ও শোকর	১১৭
অধিক কাজ করার পন্থা	১২০
জীর্ণগৃহের পরিচর্যা করুন	১২৩
দুটির যে কোন একটি	১২৭
মেলা শেষ হল	১৩০
বোমা বিস্ফোরণ নাকি জিহাদের কম্পন	১৩৩
তালিবে ইলম ভাইদের নামে	১৩৬
শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ)এর দুআ	১৩৯
আহ্ ! ইসলামের এ সকল জানবাজ মুজাহিদ	১৪২
খাদেমের পত্র	১৪৪
চোখে দেখা আল্লাহর নুসরাত	১৪৬
আমি আল্লাহর নুসরাত প্রত্যক্ষ করেছি	১৫১
মুক্তিলাভের পর প্রথম রমাযান	১৫৭
আইন যেখানে বিকল	১৬১
ঈদের শ্লোগান	১৬৩
যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি	১৬৬
যে প্রেমিক পানপাত্রের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না	১৬৮
হে আল্লাহ ! রহম কর !	১৭১
ভাওয়ালপুরের দুর্ঘটনা	১৭৬
আল্লাহু আকবার	১৭৮
বুদ্ধিজীবিরা উত্তর দাও !	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরাতন পথ নতুন পুলক	১৮৭
দেওবন্দ থেকে কান্দাহার	১৯৩
এক শতাংশ কারা	২০১
ঈর্ষণীয় গৃহ	২১০
প্রথম পর্ব	২১৫
হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর ফয়েয	২২১
উর্দী নাকি শেরওয়ানী	২২৭
ইসলামী সাংবাদিকতার বিকাশ একটি কঠিন পরীক্ষা	২৩০
শ্বেতাঙ্গদের কলঙ্ক	২৩৮
দিল্লীর ডায়েরী	২৪৪
বসন্ত ঋতুর পুষ্প কুড়িয়ে নিন	২৪৯

॥ ॥ ॥

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গ্রন্থনা প্রসঙ্গে দু'টি কথা

সুতোর গুটি ঃ

কথিত আছে যে, মিসরের বাজারে যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)কে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা হয়, তখন মিসরের বড় বড় পুঁজিপতিরা তাঁকে ক্রয়ের জন্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে আসে। সে সময় একজন বৃদ্ধাও একটি সুতোর গুটি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তার হযরত ইউসুফ (আঃ)কে ক্রয় করার আকাশ–কুসুম বাসনা এবং অসামর্থ্য দেখে লোকেরা বিস্ময়বোধ করে। তখন সেই বৃদ্ধা এভাবে তার মনোবাসনার ব্যাখ্যা দেয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)এর অপূর্ব রূপ–লাবণ্য এবং তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর নাগাল পাব না তা খুব ভাল করেই আমি অবগত আছি, কিন্তু তাঁর ক্রেতাদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করাই যে আমার হৃদয়ের বাসনা!

ঘটনাটি কতটুকু সত্য এবং প্রামাণ্য, তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু যেহেতু কাল্পনিক ঘটনা এবং পশুপাখির কাহিনী থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, সেমতে উক্ত ঘটনা থেকেও আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। বৃদ্ধার উৎকৃষ্ট রুচি, চমৎকার বাগ্মিতা এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কারণে তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধন্যবাদ দিতেই হয়। বৃদ্ধা সূতোর গুটির ন্যায় সামান্য বস্তুর বিনিময়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)এর খরিদ্দারদের দলে শামিল হয়ে স্বল্প পুঁজির লোকদেরকেও উচ্চ আকাংখার পথ করে দিয়েছে।

এ অধমের হাতে জাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (নামক মুজাহিদ বাহিনী)এর মুহতারাম আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেবের প্রবন্ধসমূহ সংকলনের কাজ সম্পাদন হওয়াও মিসরের সেই বৃদ্ধার মত দুঃসাহসিক পদক্ষেপই বটে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মিসরের বৃদ্ধা রিক্তহস্ত হওয়া সত্ত্বেও হয়ত বা শুধুমাত্র দর্শনার্থীদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে ক্রেতাদের দলে শামিল হয়েছিল। কিন্তু হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেবের প্রবন্ধসমূহকে পুস্তকরূপে সংকলন করার পিছনে আমার মধ্যে

ভিন্নরকম এক প্রেরণা কার্যকর রয়েছে। কি সেই প্রেরণা—তা বুঝতে হলে সুধী পাঠককে আরও কিছু সময় আমার সঙ্গ দিতে হবে।

অগ্নিশিখা ও শিশির ঃ

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন বক্তৃতায় যাদুর মত প্রভাব এবং কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞার মনি-মুক্তো ভরা থাকে। হাদীসটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মহান আল্লাহ কলমের মধ্যেও অগ্নিশিখার উত্তাপ এবং শিশিরের শীতলতা দান করেছেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, উর্দূ (বাংলা) সাহিত্যের নামকরা সাহিত্যিকরা তাদের কলম-শক্তিকে দ্বীনের খেদমত এবং মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেনি। তাদের কলম (ব্যতিক্রম ছাড়া) নির্মাণের পরিবর্তে ধ্বংস সাধনকে নিজেদের আদর্শ বানিয়েছে। তারা আদবের (সাহিত্য) নামে বেয়াদবীর (অশ্লীলতা) প্রসার ঘটিয়েছে। তাদের অধিকাংশের কলম কাগজের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে কুপ্রবৃত্তির দাসদের ন্যায় অর্থনৈতিক সুবিধাভোগ কিংবা খ্যাতি ও সুনাম অর্জন এবং প্রদর্শন ও লৌকিকতার হীনমনোবৃত্তি পূর্ণ করা ছাড়া আর কোন লক্ষ্য ছিল না। তাদের কলম ও মস্তিষ্কের সমস্ত শ্রম যেকোনভাবে সম্পদ ও খ্যাতির সেই টিলায় আরোহণের উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়, যার মধ্যে আবর্জনার স্তূপ এবং নানাপ্রকার অপবিত্র বস্তু জমা হয়ে সবুজ শ্যামল আগাছার জন্ম হয়েছে। আমার এ বক্তব্য তাদের প্রতি কুধারণাপ্রসূত নয়। আপনি (উর্দূ ভাষার) নামকরা কবি-সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন চরিত অধ্যয়ন করুন কিংবা তাদের লেখাকে টীকা-টিপ্পনির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করুন, তাহলে আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তারা স্বীয় প্রতিভাকে তুচ্ছ জাগতিক স্বার্থ লাভ করার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। আখেরাতকে সামনে রেখে আল্লাহ প্রদত্ত সে নিয়ামতকে ব্যবহার না করে তারা মরণোত্তর সময়ের জন্য কথ্য ও অকথ্য বক্তব্য সম্বলিত এমন সাহিত্য ভাণ্ডারই রেখে গেছে, যা তাদের জন্য 'স্থায়ী পাপের' কাজ করে যাচ্ছে।

নৌকায় ছিদ্র ঃ

উপমহাদেশের মুসলমানদের অধঃপতনের পিছনে সে সব অশ্লীল সাহিত্য রচয়িতাদেরও বিরাট ভূমিকা ছিল, যারা জৈবিক সুড়সুড়ি ভরা

লেখনি দ্বারা অপবিত্র প্রেমের বিষ ছড়িয়েছে। অসার ও অকথ্য বক্তব্যের এমন সব কবিদেরও এতে বিশেষ ভূমিকা ছিল, যারা নিজেদের রসকষহীন শুষ্ক বক্তব্য দ্বারা জাতির তরুণ প্রজন্মকে কল্পনার জগতে ভ্রমণ করাতে থাকে। আপনি তাদের অধিকাংশের লেখা গদ্য ও পদ্য পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা পাঠ করুন, তাহলে আপনার চেতনার গভীর থেকে ধ্বনি শুনতে পাবেন যে, অলীক সৌন্দর্য ও কাল্পনিক প্রেমে বিধ্বস্ত এই সাহিত্যিক এবং নিরাশা ও হতাশার জালে বন্দী এই কবিগণ লোভ-লালসা এবং অকর্ম ও অপকর্মের পঙ্কিলতায় বারবার নিপতিত হয়েছে, আর সেখান থেকে উঠে এসে মুসলমানদেরকে তাতে নিমজ্জিত করেছে। তাদের সমগ্র জীবনই প্রসিদ্ধ এ প্রবাদের বাস্তবতা ছিল যে, সাহিত্যিক হওয়ার জন্য শরাব (মদ) আর কবি হওয়ার জন্য প্রেম আবশ্যক। সুতরাং সেই বদ হাল শরাবী (মদ্যপায়ী) আর ব্যর্থ প্রেমিকরা উপমহাদেশের মুসলমানদের নৌকায় এমন এমন ছিদ্র করেছে, যার মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তি পূজা, বিলাসিতা ও ভোগের দুর্গন্ধময় পানি ভরে গিয়েছে, আর তারা দাসত্ব ও অধঃপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে।

কৃপণের পাত্র ঃ

মোটকথা (উর্দূ সাহিত্যের) যশস্বী সাহিত্যিকগণকে অশ্লীল রচনা, অসার বক্তব্য ও জৈব পূজার এমন জালে অবরুদ্ধ দেখা যায়, যা সমগ্র জাতিকে নিজের সূতায় আটকিয়ে প্রবৃত্তির দাস এবং স্বপ্নীল জগতের কল্পবিহারী বানিয়েছে। আপনি নামকরা সাহিত্যিকদের রচনায়—তারা রক্ষণশীলতার তিরস্কারবাণে বিদ্ধ হোক, কিংবা প্রগতিশীলতার দাবীদার হোক—সংস্কার ও বিনির্মাণের সাহিত্য এতটুকুই দেখতে পাবেন, যতটুকু হাড়কৃপণের গৃহ থেকে ভিক্ষুকের পাত্রে ভিখ দিতে দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকারে জাতিকে জাগৃতির পয়গাম পৌঁছানোর অলীক কল্পনা করেছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপের এমন বিষাক্ত জীবাণু ভরে দিয়েছে যে, সে উপন্যাস ইতিহাসের দর্পণ না হয়ে বরং মুসলমানদের সমগ্র ইতিহাসকেই উপন্যাস বানিয়ে ছেড়েছে। এমনিভাবে তাদের কোন কোন লেখক দ্বীনের গবেষণার অঙ্গনে প্রবেশ করে তাদের হীন স্বভাবের মন্দ প্রভাবে এমন

প্রলয় ঘটিয়েছে যে, তা থেকে তাওবা করাই মঙ্গলের পথ। এই শেষ শ্রেণীর কোন কোন কলামিষ্টের নির্ভীকতা এবং গবেষণার নামে তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ মানসিকতা ও ধর্মের ব্যাপারে লাগামহীনতা বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

উর্দূ সাহিত্যের ট্রাজেডি ঃ

কথা অনেক দূর গড়িয়েছে। আমি বলছিলাম যে, সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কলামিষ্ট খুব কমই পাওয়া যাবে, যারা আপন কলমকে 'খায়ের' (কল্যাণ)এর জন্য দায়বদ্ধ রেখেছে এবং নিজের কলমকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মাখলুকের উপকারার্থে ব্যবহার করেছে। আর এমন কলামিষ্ট তো খুবই কম পাওয়া যাবে, যারা সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলন নিয়ে পথ চলে এমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, বিরাট এক মানবগোষ্ঠীর উপর বিশেষ করে সংস্কারক ও আলেম সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। উর্দূ সাহিত্যের ট্রাজেডি এই যে, তার কলামিষ্ট ও সংস্কারকদের মধ্যে দূরত্ব বজায় থেকেছে। বিশেষত বর্তমান যুগে তার ভাগ্য মন্দ যে, সে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর মত চিন্তাবিদ, হযরত ইউসুফ লুধিয়ানবীর মত বিজ্ঞ সংস্কারক এবং হযরত মাওলানা জাষ্টিস মুহাম্মাদ তাকী উসমানীর মত বিশ্লেষক, গবেষক ও তথ্য বিশারদ এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক কমই পেয়েছে। বস্তুত যারা সাহিত্যাঙ্গনের সাথে জড়িত ছিলেন, তারা ইলম ও জিহাদের পতাকাতলে আসতে অনীহা দেখিয়েছেন। আর যারা বিপ্লবের পুরোধা কিংবা সংস্কার কর্মের 'দায়ী' ছিলেন, তাদের দাওয়াত এমন মানের সাহিত্যাশ্রিত হয়ে সাধারণ্যে পৌছায়নি, যে মানের সাহিত্যে নভেল, নাটক এবং নামকা ওয়াস্তের সাহিত্যের লেবেল আঁটা রচনা পৌছেছে।

সাহিত্য রুচির পরিতৃপ্তি ঃ

জাইশে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমীর জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেব (দাঃ বাঃ) রূপে জ্ঞান ও সাহিত্যের জগত এমন একজন কলামিষ্টের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে, যার যাদুময় বক্তৃতা, শক্তিশালী বাগ্মীতা, স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, সাচ্ছন্দ্য ও গতিশীল লেখনী এবং বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাই শুধু প্রবাদতুল্য নয়, বরং

ইলমে দ্বীনের প্রসার, মানব জাতিকে সৎপথের দিশা দান এবং সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলনেও তাঁর ঈর্ষণীয় অবদান রয়েছে। আপনি তাঁর লেখাসমূহকে উঁচুমানের সাহিত্যের যে কোন রত্নসম লেখার সঙ্গে তুলনা করে দেখুন, কোন দিক থেকেই তাঁর লেখাকে পিছনে পাবেন না। সুপ্রতিষ্ঠিত সমালোচক বা অলংকার শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ পণ্ডিত হোক, সাহিত্যাঙ্গনের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হোক বা কাব্য ও কথাশিল্পের অভিজ্ঞ উস্তাদ হোক, যে কেউ তাঁর গদ্যরাজির নিরীক্ষা করবে, সেই একথা বলতে বাধ্য হবে যে, তাঁর কলম থেকে উৎসারিত শব্দ সম্ভারে এমন সাবলিলতা, সরলতা, গতি ও সাচ্ছন্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অকৃত্রিমতা এবং তাঁর লেখায় অলংকার শাস্ত্রের অলংকারাজি, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা, বিরল দৃষ্টান্তসমূহ এবং সহজাত সাহিত্যের সেই সৌন্দর্য পাওয়া যায়, যা তাঁকে আন্তর্জাতিকমানের মহান সাহিত্যিকদের সারিতে এনে দাঁড় করায়।

তাঁর গদ্যতে ভারিক্কি বিদ্রূপ এবং রসাত্মক চুটকী নীরবে স্থান করে নিয়ে কথার সৌন্দর্য ও স্বাদ এমন বৃদ্ধি করে, যেমন খাঁটি দুধের মধ্যে দেশী চিনি মিশ্রিত করলে তার স্বাদ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বাহ্যিক সৌন্দর্য ছাড়াও তাঁর চিন্তা চেতনার গভীরতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও গবেষণালব্ধতা দেখার মত ও ধন্যবাদ যোগ্য। আমার এ বক্তব্যে অতিরঞ্জন আছে বলে কারো মনে হলে, সে যেন এ কিতাবের শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবার' প্রবন্ধটি পাঠ করে দেখে। এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এমন নতুনত্ব, বিরল প্রভাবপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক আঙ্গিকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব কি? উলামায়ে কেরাম, মুজাহিদীন এবং দ্বীনদার লোকদের জন্য বড়ই আনন্দের ব্যাপার যে, তাঁদের একজনের প্রবন্ধরাজি পরিপূর্ণ আস্থা এবং গর্ব সহকারে সাহিত্যের আন্তর্জাতিক হিরোদের মোকাবিলায় পেশ করা সম্ভব। এ সমস্ত প্রবন্ধকে অতীব আনন্দ এবং গর্ব সহকারে সেসব লোকের সম্মুখেও তুলে ধরা সম্ভব, যারা ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য পাঠ না করার পিছনে এ অজুহাত খাড়া করে যে, সেগুলো তাদের 'সুউচ্চ ও সূক্ষ্ম' সাহিত্য–স্বাদের পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে না।

এবার বই হাতে নিন ঃ

মুহতারাম আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেবের রচনাবলীকে মানসম্পন্ন ছাপা এবং সুন্দর প্রচ্ছদে সর্বসমক্ষে পেশ করার

আসল উদ্দেশ্য এই যে, উর্দূ সাহিত্যের উলামায়ে কেরামের সুদৃষ্টি ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আর যেন অভিযোগ না থাকে। উপরন্তু ধর্ম বিষয়ক, সংস্কারমূলক এবং জিহাদ ভিত্তিক রচনাসমূহকে নিখাঁদ সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষাকারীদের কোন ত্রুটি উপলব্ধির বা অতৃপ্তির অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। উচ্চ সাহিত্যের মান সম্পন্ন ও রাজকীয় এসব প্রবন্ধ 'যরবে মুমিন' পরিবারের নিকট সকল উর্দূভাষী লোকের সাধারণভাবে এবং তালিবে ইলম ও মুজাহিদদের বিশেষভাবে আমানত ছিল। যা তাদের নিকট পৌছানো আমাদের জন্য এক আনন্দপূর্ণ কর্তব্য। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে সে কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করেছেন। আমাদের সমাজের রীতি এই যে, গুণগরিমা ও উৎকর্ষতার অধিকারী ব্যক্তিদের জীবদ্দশায় তাঁদের কীর্তি ও অবদান আমাদের চোখে পড়ে না, তা থেকে উপকৃত হই না এবং তার মূল্যায়নও করি না। তবে তাঁদের অন্তর্ধানের পর এমন অপরিচিত ভক্তবৃন্দের এবং অতিরঞ্জনকারী জীবনীকারদের ঢল পড়ে যায়, যারা তাদের বাস্তব ও কাল্পনিক গুণাবলী ও উৎকর্ষতা জনসমক্ষে তুলে ধরে ব্যক্তিপূজার প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে। পাঠক আপনারাই ভেবে দেখুন, এতে কোন আন্দোলন বা দাওয়াতের কোন লাভ হতে পারে কি? আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে আকাবির ও জ্ঞানীগুণীদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের মূল্যায়ন করা উচিত। 'মারেকা'কে পুস্তকে রূপ দেওয়া এ বাসনারই বাস্তবায়ন। এ গ্রন্থে 'মারেকার' উৎসাহ ব্যঞ্জক নামে সাপ্তাহিক যরবে মুমিন পত্রিকায় প্রকাশিত সত্তরটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে এমন ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে, আগামীতে আরও সত্তরটি প্রবন্ধ পুরা হলেই তা পুস্তক আকারে প্রকাশ করার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে এসে সংক্ষিপ্ত বাসনা ও তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলো। সুধী পাঠক! এবার বই হাতে নিন এবং সাহিত্যের এমন পরিপূর্ণ, বিরল ও দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধমালা দ্বারা স্বীয় মনমগজকে আলোকিত এবং আত্মাকে মোহিত করুন, যার প্রভাব ও উপকারিতা অতুলনীয়।

আবু লুবাবা
২০শে জুমাদাল উলা, ১৪২২ হিজরী
১১ই আগষ্ট, ২০০১ইং

আসসালামু আলাইকুম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ! ছয় বছর ২৪দিন বন্দী থাকার পর মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাকে কাফেরদের কারাগার থেকে মুক্তি দান করেছেন। মুক্তিলাভের পর সাপ্তাহিক যরবে মুমিন পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বক্ষ্যমান প্রবন্ধ লিখছি। তার কারণ এই যে, বন্দী থাকাকালীন সময়ে 'যরবে মুমিন'–এর মাধ্যমে আপনাদের সাথে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পছন্দনীয় এ পত্রিকার বদৌলতে মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে লেখার নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্য আমাকে দান করেছেন। আল্লাহর এ নেয়ামতের যত শুকরিয়াই আদায় করি না কেন, তা কমই হবে। 'যরবে মুমিনের' পাঠক আমার গ্রেফতারী এবং তা থেকে মুক্তিলাভের বিরল বিস্ময়কর ঘটনাবলী অবগত হওয়ার জন্য অবশ্যই উৎসুক হয়ে আছেন। এতদিন আপনাদের নিকট যেসব তথ্য পৌঁছেছে। তা সবই রহস্যাবৃত। আমার মুক্তির ব্যাপারটি কয়েকদিন ধরে প্রচার মাধ্যমগুলোকে তোলপাড় করে রেখেছে। এ ব্যাপারে নানারকম কথা প্রচার হয়েছে। বিধায় এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার অধীর আগ্রহ আপনাদের মধ্যে বিরাজ করছে। ইনশাআল্লাহ, সত্বরই আপনাদের সে বাসনা পূর্ণ করা হবে। আপনারা কুফরী জগতে মাতম সৃষ্টিকারী এবং ঈমানদারদের হৃদয়কে শীতলকারী মহান ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা জানতে পারবেন। তবে আজকের এ আসরে অতীতের কিছু কথা তুলে ধরছি, যাতে করে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক গড়া সহজ হয়।

সুধী পাঠক! বন্দী হওয়ার পর আমার নিকট থেকে কলম ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে, আমি যদি কারাগারে বসে মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলি কিংবা ঈমান ও জিহাদের শিরোনামে কিছু লেখি, তাহলে সেজন্য আমাকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। নিষেধাজ্ঞা ও

বন্দীত্বের সে দিনগুলো আমার জন্য ছিল ভীষণ বিভিষিকাময়। সেসময় এ অনুভূতি আমার উপর আচ্ছন্ন হয় যে, এখন আমি দ্বীনের খেদমত এবং জিহাদের যে কোন শাখায় কাজ করা থেকে বঞ্চিত। এ অনুভূতি ছিল চরম কষ্টদায়ক, যা আমার ভিতরটাকে শূন্য করে ছাড়ে, কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। এ পরিস্থিতিতে আমি নিরাশ না হয়ে বরং মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করি। আমি আমার প্রভুর দরবারে আবেদন করি যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন আমি তাতে খুশী আছি, কিন্তু আপনি আমাকে দ্বীনের খেদমত থেকে কোনমতেই বঞ্চিত করবেন না। আমার অব্যাহত এ দুআ অবশেষে কবুল হয়। বন্দী হওয়ার প্রায় দেড়–দু'বছর পর কারাকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি একটি কিতাব লিখতে সক্ষম হই। কিতাবের নামকরণ করা হয় 'যাদে মুজাহিদ' (মুজাহিদের পাথেয়)। আমার পরামর্শ মত আমার মূল নাম বাদ দিয়ে ছদ্মনামে তা প্রকাশ করা হয়। কিতাবটি কারাগার থেকে বাইরে কিভাবে এলো, এমনিভাবে পরবর্তীকালে লিখিত কিতাবসমূহ কিভাবে বাইরে পৌঁছল ; সেও এক দীর্ঘ ও মনোমুগ্ধকর উপাখ্যান। কিন্তু কারাগারে অনেক মুজাহিদ এখনো বন্দী রয়েছেন। তাদের অনেকে কারাগারে থেকেও আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করতে ইচ্ছুক, তাদের খাতিরে আমি এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে অপারগ।

যাই হোক, আল্লাহ তাআলার বিশেষ নুসরাত এবং তাঁর বিশেষ অনুকম্পার কারিশমা যে, আমি কারাগারে বন্দী থেকে কয়েক হাজার পৃষ্ঠা লিখে বাইরে পাঠিয়ে দেই। আলহামদুলিল্লাহ! তার মধ্য থেকে একটি পৃষ্ঠাও দুশমনের হাতে ধরা পড়েনি এবং কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ ছাড়া অবশিষ্টগুলোও খোয়া যায়নি। 'যাদে মুজাহিদ' লেখার পর আমি কারাগার সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা এবং কিছু প্রবন্ধ লিখি, যার সিংহভাগই 'যরবে মুমিনে' প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সব প্রবন্ধ লেখার সময় 'যরবে মুমিন' এর প্রকাশনা শুরু হয়নি, কিন্তু আমি আমার সব প্রবন্ধ এবং লেখা তাঁদের নামেই পাঠাতে থাকি, যাঁরা পরবর্তীতে 'যরবে মুমিন' নামে এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা নিঃসন্দেহে ইসলামী সাহিত্যকে একটি নতুন দিকে প্রবাহিত করেছে।

সাহিত্যের যে গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি আহলে হকের (সত্যপন্থীদের) অমনোযোগিতার শিকার ছিল, এ পত্রিকার বদৌলতে তা আহলে হকের সুদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়। আমার প্রায় পঁচাত্তরটি প্রবন্ধ 'মুসকারাতে যখম' [১] নামে সংকলন করে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহঃ)এর নিম্নের এ কবিতা থেকে আমি কিতাবের এ নাম চয়ন করি।

نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے
کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے

"তোমরা আমার অধরের হাসি দেখে ভুল করো না। কেননা, আমার অধরে আমার আহত হৃদয়ের বেদনা হাসি হয়ে ঝরে পড়ছে।"

আল্লাহ পাকের হুকুমে 'যরবে মুমিন' ঈমানের বজ্রনিনাদ এবং প্লাবনের অপ্রতিরোধ্য গতি নিয়ে ময়দানে নেমে আসে। আমার এ সমস্ত প্রবন্ধ তাতে প্রকাশ হতে থাকে। সে সময়েই আল্লাহ তাআলা আমাকে 'তা'লিমুল জিহাদ' ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড সমাপ্ত করার এবং তা বাইরে পাঠানোর তাওফীক দান করেন। লেখালেখির এ সম্পূর্ণ কাজ দিল্লীর তিহার কারাগারে সম্পাদন করি। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামের দুশমনদের নিকট তা গোপন থাকে। একথা বুঝে আসা কঠিন হলেও, যে মহান রব তাঁর অপার কুদরতে মৃত্তিকা থেকে মানব সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম। তাঁর কাজ মানুষের বুদ্ধির নাগালের উর্ধ্বে। আমি আমার মহান এবং প্রিয় মালিকের দয়ার সাগরে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। আমি তাঁর শোকরের হক আদায় করতে অক্ষম।

তিহার কারাগার থেকে পুনরায় যখন জম্মুতে স্থানান্তর করা হয়, তখন আবারো কিছুদিন লেখার কাজ বন্ধ থাকে। অল্প দিনের বিরতির পর আল্লাহ তাআলা আমাকে আরো একটি কিতাব লেখার তাওফীক দান করেন। কিতাবটি 'আযাদী মুকাম্মাল ইয়া আধুরী' নামে প্রকাশিত হয়। এ সময় 'যরবে মুমিন'-ও প্রকাশিত হচ্ছিল। তার কয়েকটি সংখ্যা কোন

টীকা-১. 'কাশ্মীর রণাঙ্গনে' নামে যার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এক উপায়ে কারাগারে পৌঁছেছিল। বিধায় মাঝে মাঝে 'যরবে মুমিনের' জন্যও প্রবন্ধ লিখতে থাকি। তিরমিযী শরীফের দরস চলাকালে আল্লাহ তাআলা জিহাদ বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তাআলা সেগুলোও বাইরে প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করে দেন। প্রবন্ধগুলো 'যরবে মুমিনে' ছেপে বের হয়। বর্তমানে 'দূরুসে জিহাদ' নামে তার সংকলন গ্রন্থ বের হয়েছে। 'দূরুসে জিহাদ' লেখার পর পাকিস্তানের কয়েকজন আকাবিরের হুকুম এবং পরামর্শ মোতাবেক জিহাদ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কিতাব 'মাশারিউল আশওয়াক' গ্রন্থের অনুবাদ, সারসংক্ষেপ এবং ব্যাখ্যার কাজ আরম্ভ করি। আল্লাহ তাআলা খুব তাড়াতাড়ি তা সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন। তার দু'শ আশি পৃষ্ঠার বিশাল পাণ্ডুলিপিও পাঠিয়ে দেবার সুব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! কারাকর্তৃপক্ষ তার গন্ধও পায়নি।

১৯৯৯ ঈসায়ীর জুন মাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বন্দী মুজাহিদগণ জেল থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে সুড়ঙ্গ খনন করেছিল তা প্রকাশ হয়ে যায়। তখন মুহতারাম বন্ধু কমাণ্ডার হাফেয সাজ্জাদ খান সাহেব (রহঃ)কে মর্মান্তিক নির্যাতন চালিয়ে শহীদ করা হয়। তাঁর শাহাদাতের ঘটনা আমাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবশ্ করে ফেলে। মুজাহিদ সাথীদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমি পুনরায় কুরআনের দরস আরম্ভ করি। সূরা বাকারার তাফসীর করার সময় আমি তীব্রভাবে উপলব্ধি করি যে, ইহুদীদের ব্যাধিসমূহ তীব্রগতিতে মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। ইহুদীদের ব্যাধির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর কারণে আল্লাহ তাআলার গযব, তাঁর লানত এবং লাঞ্ছনা আপতিত হয়। সুতরাং আমি এ বিষয়ের উপর আল্লাহর তাওফীকে লিখতে আরম্ভ করি। প্রায় সোয়া দুইশ' পৃষ্ঠা লিখে বাইরে পাঠিয়ে দেই। তাতে ইহুদীদের দশটি ব্যাধির আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে শা'বান মাস আরম্ভ হয়ে যায়। কুরআন মাজীদের প্রতি অধিক মনোযোগ দানের চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। মুজাহিদ বন্ধুরাও শা'বান ও রমাযান মাসে তাদের দরসের পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন করছিলেন। ফলে এ দুই মাস লেখার কাজ বন্ধ রাখার নিয়ত করি এবং

সে অনুপাতে আমল করতেও আরম্ভ করি। পবিত্র রমাযানের পর অনতিবিলম্বে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখার কাজ আরম্ভ করার সংকল্প করি। কিন্তু পবিত্র রমযানের ২২ তারিখে আল্লাহ্ তাআলার খাস রহমত আমার দিকে ধাবিত হয়, ফলে আমি দারুল কুফর (হিন্দুস্তান) থেকে মুক্তিলাভ করে দারুল ইসলামে (আফগানিস্তান) চলে আসি।

আজ রমাযানুল মুবারকের ২৮ তারিখ রাতে 'যরবে মুমিন'এর অফিসের একেবারে নিকটে বসে এ প্রবন্ধ লিখছি। উপরোক্ত ঘটনাবলী আল্লাহর ভালবাসাকে বৃদ্ধি করে এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর উপর আস্থা পোষণ করা হলে এবং তাঁর উপর নির্ভর করে দ্বীনের খেদমত করার সংকল্প করা হলে পাহাড় সমান বাধাও সরিষার দানায় পরিণত হয়। আল্লাহ্ তাআলা সকল মুসলমানকে এ কথার বুঝ দান করুন।

জম্মু থেকে কান্দাহার

যেদিন আমি বন্দী হই সেদিন পবিত্র জুমাবার ছিল। তার পূর্বের রাতে আমার শ্রদ্ধেয় ভাই শহীদ সাজ্জাদ খান এবং আমি ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ, অধিকৃত কাশ্মির)এর সুদূরবর্তী একটি গ্রামের এক বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। আমাদের পুরাতন বন্ধু শহীদ আবু গাজী পনের জন মুজাহিদ সমভিব্যাহারে সে বাড়ীতে আগমন করেন। উষ্ণ ভালবাসা ভরে তার সাথে মুলাকাত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিহাদের আলোচনায় মজলিস সরগরম হয়ে উঠে। সুবহানাল্লাহ্! এক অপার্থিব ভাবময় ছিল সে দৃশ্য। আমার সম্মুখে এবং চতুর্পার্শ্বে জিহাদের জযবায় টগবগে এমন একদল মুজাহিদ উপবিষ্ট ছিলেন, যাঁদের নবীর সুন্নাতে সুসজ্জিত চেহারা, মুখমণ্ডল শাহাদতের বাসনায় নিমজ্জিত, চোখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার পুনর্জাগরণের সুন্দর স্বপ্ন, বক্ষ ম্যাগজিন এবং গ্রেনেড সুসজ্জিত, সেই বক্ষের অন্তরালের হৃদয় থেকে বীরত্ব ও উৎসর্গের সুঘ্রাণ ভেসে আসছিল। সকল তরুণ নেহায়েত মনোযোগ, ভালবাসা ও একাগ্রতার সাথে আমার কথা শ্রবণ করছিলেন। মমতাময়ী মায়ের কোলে যেমন প্রিয় সন্তান শুয়ে থাকে তেমনি তাদের কোলে ছিল ক্লাশিনকভ (A-K-47)। কারো কারো

নিকট রকেট লাঞ্চারও ছিল। কেউ কেউ ইণ্ডিয়ান আর্মী থেকে ছিনিয়ে আনা বন্দুকও সাথে রেখেছিলেন।

কয়েকজন মুজাহিদ নীচে পাহারা দিচ্ছিলেন। জ্বি হ্যাঁ, তারা 'রিবাত' (ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া)এর মহান আমলের স্বাদ লুটে নিচ্ছিলেন। সে রাতে জিহাদ সংক্রান্ত মজলিস ছেড়ে পাহারা দেওয়া ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টকর। কিন্তু তারা সহাস্যবদনে সে কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। তারপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের মুজাহিদগণ আমাদের সঙ্গে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেন। কিছুক্ষণের জন্য বায়ুতরঙ্গের উপর আরেকটি মজলিস সজ্জিত হয়। কেন্দ্রে অবস্থানরত মুজাহিদগণও আমাদের নিকট আসতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কেন্দ্রে অবস্থান করা জরুরী ছিল,বিধায় তাদের জন্য এখানে সম্ভব আসা হয়নি।

যা হোক ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সামান্য হলেও তাদের পিপাসা নিবারণ করা হয়। রাত ২টায় জিহাদের আসর সমাপ্ত হয়। মুজাহিদগণ প্রাচীরে হেলান দিয়ে ঝিমুতে থাকেন। আমি তাদের একজনের ক্লাশিনকভ নিয়ে 'রিবাতের' আমলে নিয়োজিত মুজাহিদদের সাথে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমি ক্লাশিনকভ হাতিয়ে দেখি, সে মুশরিকদের সঙ্গে কথা বলতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। অর্থাৎ তার লক খোলা রয়েছে এবং চেম্বারে গুলি ভরা রয়েছে।

ক্লাশিনকভের প্রস্তুতি দেখে হৃদয়মন পুলকে ভরে যায় এবং আনন্দে দোল খেতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! রজনীর শেষভাগে শীতল বায়ূ যখন মাতোয়ারা হয়ে দিক–বিদিক ছুটে চলেছে, আসমান থেকে রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে! এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে কাশ্মীর রণাঙ্গনে কিছু সময় পাহারা দেওয়ার তাওফীক দান করেন। মহান এ নেয়ামত লাভ করে আল্লাহ তাআলার যতবেশী শোকর আদায় করা হোক না কেন, তা কমই হবে। স্মরণীয় সে রাত কেটে গেল। এটি ছিল ১৪১৪ হিজরীর শাবান মাসের ২৮ তারিখের রাত। ঈসায়ী ১৯৯৪ সন।

জুমুআর দিনের ভোরবেলা তার আঁচলে ভরে আমার জন্য যে পয়গাম বয়ে আনছিল, সে সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ বেখবর। সকাল ৯টায় শহীদ সাজ্জাদ খানের সঙ্গে ইসলামাবাদ শহর অভিমুখে রওয়ানা করি। শহরের জামে মসজিদে আমার দ্বারা জুমুআর বয়ান করানো ছিল তার হৃদয়ের বাসনা। পথিমধ্যে গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় একটি অটো রিক্সা নিতে হয়। ১২টার কাছাকাছি সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় আমরা উভয়ে বন্দী হই। ইণ্ডিয়ান আর্মি পরম আনন্দ উল্লাস করে। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে শ্লোগান দেয়। তাদের সে দৃশ্য আজও আমার স্মরণ আছে। আমাদেরকে একটি সেনা ক্যাম্পে বসিয়ে রাখা হয়। চোখ পট্টি এবং হাত রশি দ্বারা পিঠের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের অদূরে অনুষ্ঠিত তাদের বিজয়ের গৌরবময় জলসার কর্মকাণ্ড আমাদের কর্ণ ঠিকই শুনছিল। গাভীর পূজারীরা আনন্দে ফেটে পড়ছিল। তারা চিৎকার করে করে শ্লোগান দিচ্ছিল—'জয় হিন্দ', 'ভারত মাতা কি জয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

উহ্! কি বেদনাদায়ক সে দৃশ্য। কি কষ্টকর সে মুহূর্ত। আল্লাহর দুশমন, ইসলামের দুশমন এবং মুসলমানদের হত্যাকারীরা আনন্দ উদযাপন করছে, আর আমরা অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ পরের নির্যাতনের জন্য প্রতীক্ষা করছি।

পাঠক! এবার আসুন ঘটনার দ্বিতীয় দৃশ্যপটের দিকে। আজও পবিত্র জুমুআর রাত। জম্মুর উপকণ্ঠে কোটভলওয়াল কারাগারের ৯নং ওয়ার্ডের একটি ব্যারাকে আমরা ১৭ জন সাথী তারাবীর নামায পড়ছিলাম। মাওলানা আবু জান্দাল তারাবীর ইমামতি করেন। ১৬ রাকাতে ১ পারা পাঠ করেন। তারপর অন্য একজন সাথী ইমামতি শুরু করেন। আমি মাওলানা আবু জান্দালের সাথে আমার সেলে চলে আসি। এখানে ২ রাকাত তারাবীর মধ্যে আমি তাকে এক পারা কুরআন শোনাই। তারাবীর পর রাত সাড়ে আটটায় কারাগারের অফিসার এসে আমাদের গণনা করে ব্যারাকে তালা লাগিয়ে যায়। তখন ব্যারাকের অধিকাংশ সাথী আমার সেলে চলে আসে। এখানে আমরা খবর শুনছিলাম এবং বিমান অপহরণের বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। এ ঘটনায় অধিকাংশ সাথী

আশ্যান্বিত এবং আনন্দিত ছিল, তাই তাদের আলোচনাও ছিল বিমুগ্ধকর। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এই আলোকরশ্মির উত্তাপ স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছিল। কয়েকদিন ধরে সকল সঙ্গী দুআ এবং সালাতুল হাজত নামাযে লিপ্ত ছিলেন। আজ রাতেও প্রায় ১০টা পর্যন্ত ঈমানের উত্তাপ ভরা এ মজলিস জমজমাট থাকে। তারপর আমি সেলে একা থেকে যাই। এক অজানা কারণে আমার ঘুম আসছিল না। হয়ত বা পরের দিনের ঘটিতব্য সেই ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া ছিল, যে সম্পর্কে আমার মোটেও জ্ঞান ছিল না। সে রাত যেনতেনভাবে পার হয়ে যায়। ভোর রাতে সাহরীর সময় সাথীদের সঙ্গে পুনরায় মোলাকাত হয়। ১৪২০ হিজরীর পবিত্র রমাযানের ২২ তারিখ জুমাবারের সূর্য উদিত হয়। আমি সারারাতের অনিদ্রার কারণে ক্লান্ত ছিলাম। তাই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

১০টার কাছাকাছি সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গে। উযূ করে এসে নামাযে দাঁড়াই। এমন সময় কারা কর্তৃপক্ষের বিরাট সংখ্যক লোকের আনাগোনা শুরু হয়। তারা এসে আমাকে বলে—আপনাকে এক জায়গায় যেতে হবে—সামানপত্র ঠিক করে নিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যেতে হবে? তাদের কেউ কেউ বলল—কান্দাহার। আর কেউ কেউ অস্পষ্ট উত্তর দিল। আমার সঙ্গীরা আমার জন্য সংক্ষিপ্ত পথসম্বল বেঁধে দিল। তারপর আমাকে বিদায় জানাল। বিদায়কালে তাদের সকলের নয়নযুগল অশ্রু বর্ষণ করছিল। তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তাদেরকে কিছু উপদেশ দিতে গিয়ে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তখন আমাদের সেই ভালবাসা ও আত্মীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করি, যা আমাদের বন্দীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। আল্লাহর পরে আমরা পরস্পরের প্রয়োজন ও আরামের অবলম্বন ছিলাম। আমরা এক সঙ্গে মার খেয়েছি, পরস্পরের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনেছি, একে অপরের ক্ষতস্থান মালিশ করেছি এবং সম্মিলিতভাবে কুফরের আগ্রাসনের মুকাবিলা করেছি। আমরা এত কাছে থেকেছি যে, আমরা পরস্পরের আপন হয়ে যাই। উপরন্তু এ তরুণেরা ছিল আমার ছাত্র। কারাগারে তারা আমার সঙ্গে যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আচরণ করেছে, তা এক মুহূর্তের জন্য আমি বিস্মৃত হতে পারব

না। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত এরা সকল সাথী মুক্তি লাভ করে আমার নিকট না পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মুক্তিলাভকে আমি পরিপূর্ণ মনে করব না।

যা হোক, সেদিনের বেলা সাড়ে ১১টায় আমি আমার ভাইদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আমার ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে আসি। কারাগারের দেউড়ির মধ্যে আমার চোখে পট্টি বেঁধে দেয়া হয় এবং উভয় হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কড়া পাহারার মধ্যে আমাকে দূরে এক জায়গায় নিয়ে একটি বিমানে বসিয়ে দেওয়া হয়। বিমানটি দিল্লীতে অবতরণ করে। সেখানে আমাকে বিমান থেকে নামিয়ে গাড়ীর বহরে করে অজানা একস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছে আমি তাদেরকে বলি, আমার চোখ খুলে দিয়ে আমাকে আমার কুরআন শরীফ দাও। আমি কুরআন তেলাওয়াত করব। তারা অস্বীকার করলে আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। আমি পরিণতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাদেরকে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেই। এ অবস্থা দেখে তারা ভীত হয়ে আমার চোখ খুলে দেয়। তখন আমি আমার সম্মুখে এয়ার ইণ্ডিয়ার একটি এয়ার বাস দাঁড়ানো দেখতে পাই। যার চতুর্দিকে অদ্ভুত কিছু লোক ছোটাছুটি করছিল। পরে জানতে পারি যে, তারা গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল। তাদের কয়েকজন আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ানো বিমানে উঠে বসে।

আমাকে বিমানের মাঝখানে একটি সিটে বসিয়ে দেওয়া হয়। আমার ডানে বামে এবং অগ্র-পশ্চাতে সতর্ক কমাণ্ডো মোতায়েন করা হয়। আমি ব্যাগ থেকে আমার কুরআন শরীফ বের করিয়ে নিয়ে সিটে বসে তেলাওয়াত করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর বিমান দ্রুত দৌড়াতে থাকে। তারপর জালেমদের ভূমি ত্যাগ করে আকাশে উড়াল দেয়। সে সময়ে আমার কানে শব্দ ভেসে আসে—

"ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! আমরা আপনাদেরকে কান্দাহারগামী বিমানে স্বাগত জানাচ্ছি।"

ঘোষণা শোনামাত্রই আমার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত হয়। আমার রসনায় দুআ জারি হয়ে যায়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ- رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ- عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ- رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ-

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে মুক্ত করেছেন। হে আমার রব! আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দিন। আপনি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরলপথ দেখাবেন। হে আমার রব! নিশ্চয়ই আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করেছেন আমি তার মুখাপেক্ষী।

আনন্দাতিশয্যে আমার চোখে অশ্রু এসে যায়। অতি কষ্টে আমি তা নিয়ন্ত্রণ করি। যেন দুশমন আমাকে কাঁদতে দেখে আনন্দিত না হয়। এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল। ঈমানদাররা আনন্দ উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আলমে ইসলাম বিজয় ও মর্যাদার অনুভূতিতে মাতোয়ারা ছিল। কাফেরদের উপর মাতম ছেয়েছিল। ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছিল।

মুক্তিলাভ

বিমানটি আকাশে ডানা মেলে পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। বেলুচিস্তান হয়ে বিমানটি আফগানিস্তান প্রবেশ করবে। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, কয়েক আসন দূরে কাশ্মীরের প্রখ্যাত গেরিলা কমাণ্ডার মুশতাক আহমদ জারগার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখছে। চার চোখের মিলন হলে তিনি ইঙ্গিতে গন্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখনো তিনি বিমানের গন্তব্যের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন—সম্ভবত তিনি চোখ কান বাঁধা থাকার কারণে আকাশ পথের প্রথম ঘোষণা শুনতে পাননি। পরে তার চোখ খুলে দেওয়া হয়। আমি তাকে চোখের ইঙ্গিতেই মুক্তির সুসংবাদ শুনাই। যার প্রতিক্রিয়া সাথে সাথে তাঁর চেহারায় ভেসে উঠে। আমার আসন থেকে কয়েক আসন সম্মুখে মুজাহিদ আহমদ ওমর শায়েখ উপবিষ্ট ছিলেন। আমাদের

প্রত্যেককে তিনজন করে প্রহরী বেষ্টন করে রেখেছিল। উপরন্তু বিমানে আরোহী কমাণ্ডোর সংখ্যা ছিল নব্বই এর কাছাকাছি।

বিমানের সম্মুখের আসনে ভারতের মুশরিক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশবন্ত সিং বসা ছিল। সে দু' চারবার বিমানের ককপিটেও প্রবেশ করে। তার আমলাদের মধ্যে একজন ডাক্তারও ছিল। সে তাকে কিছুক্ষণ পরপর ঔষধ সেবন করাচ্ছিল। বিমানের মেজবানেরা লোক দেখানো সৌজন্য রক্ষার্থে আমাদেরকেও পানাহার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আমরা রোযা রাখার অজুহাত দেখাই। আর রোযা না রাখলে অবশ্যই অন্য কোন অজুহাত দেখাতাম। কেননা মুক্তির দ্বারপ্রান্তে এসে ক্ষুৎপিপাসার উপলব্ধিও ছিল না এবং তাদের খাদ্য গ্রহণ করার মত মানসিকতাও ছিল না। পৌনে ২ ঘন্টা আকাশে উড়ার পর বিমানটি দিক পরিবর্তন করে ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকে।

তারপর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সম্মুখে এল, যখন এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানটি আপন মস্তিস্কে লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের কলঙ্ক লেপন করে দারুল ইসলাম আফগানিস্তানের শহর কান্দাহারের বিমান বন্দরে অবনত মস্তকে অবতরণ করে। বিমান রানওয়ে দৌড়াচ্ছিল আর আমার মনমগজে বিরল বিস্ময়কর বিদ্যুৎ তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। কারণ, বিমান যে শহরে অবতরণ করেছে, তার প্রত্যেকটি বস্তু আমার অত্যন্ত প্রিয়। সে শহরের বুকের উপর দিয়ে শহীদদের খুন প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই ব্যক্তিত্ব, যাঁর ভালবাসায় আমার হৃদয়মন টইটুম্বুর, যাঁর পবিত্র হাতে আমি কারাগারে থাকতেই বায়আত হয়েছি, তিনি এ শহরেরই অধিবাসী। সুধী পাঠক! কান্দাহার আমাদের সেই আমীরুল মুমিনীনের শহর, যিনি বর্তমান যুগে ইসলামের নামকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্য আল্লাহর বিরাট বড় রহমত। আমি যখন কারাগারে বন্দী ছিলাম, তখন এ শহরের দ্বার–প্রাচীর দর্শন করা এবং তাতে অবস্থানরত হযরত আমীরুল মুমিনীনের হস্ত চুম্বন করা ছিল আমার জীবনের বিরাট বড় কামনা। আমি আমার দুআর মধ্যে এবং লেখার মধ্যে এ বাসনার কথা বারবার তুলে ধরেছি।

আহ্, কি আনন্দ! আমার মালিক দয়া করে সেই শহরকে আমাদের

অবতরণের জন্য মনোনীত করেছেন, যেখান থেকে আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ডংকা বেজে চলছে। এটি সেই শহর, যেখানে ইসলামের কালিমা সুউচ্চে অধিষ্ঠিত, যেখানে মুসলমান ও ইসলাম স্বাধীন। সেখানকার শাসকগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। কান্দাহার বিমান বন্দরে বিমান দৌড়াচ্ছিল। রানওয়ের উভয় দিকে দণ্ডায়মান হাজার হাজার সশস্ত্র তালেবানের সুদর্শন চেহারা আমার ঈমান ও আনন্দ বৃদ্ধি করে চলছিল। বিমান বন্দরে এত অধিক সংখ্যক তালেবানের উপস্থিতি দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। পরে জানতে পারি যে, সেদিন সকল কান্দাহারবাসীরই এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকার বাসনা ছিল। কিন্তু তালেবান সরকার শৃংখলা রক্ষার্থে বিমান বন্দরে সাধারণের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে মাত্র কয়েক সহস্র লোক বিমান বন্দরে উপস্থিত হতে পারে। অথচ হাইজ্যাকিংয়ের এ ঘটনার সাথে তালেবানের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সমস্ত কান্দাহারবাসী এজন্য আনন্দিত ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কয়েকজন মুসলমান ভাইকে মুক্তিদান করেছেন এবং বিমান হাইজ্যাকের বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়েছে। আমীরুল মুমিনীনের বরকতে কান্দাহারবাসীর দৃষ্টিতে ইসলাম কেন্দ্রিক আত্মীয়তার মর্যাদা বিরাট। তাই তারা আমাদের মুক্তিতে আনন্দে দোল খাচ্ছিলেন। তাদের নয়ন যুগল আনন্দানুভূতিতে চিকচিক করছিল। বিমান বন্দরে তালেবানের শত শত সশস্ত্র প্রহরী, তাদের সুদৃশ্য গাড়ী, ট্যাংক, অস্ত্রশস্ত্র ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা ভারত সরকারকে ভাবনার দাওয়াত দিচ্ছিল। এয়ার ইণ্ডিয়ায় উপবিষ্ট প্রত্যেক মুশরিকের চেহারা থেকে সেই চিন্তা ঝরে পড়ছিল।

ভারত সরকার কয়েক বছর যাবত চোর–ডাকাতদের সমন্বয়ে গঠিত তালেবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। ভারত সরকার ঘাতকদের সমন্বয়ে গঠিত রক্তপিপাসু এ দলকে অর্থ দিয়ে, রসদ ও আসবাবপত্র দিয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছে। আছহাবুশ শিমাল–(বামপন্থী) উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতারা ভারত সরকারকে একথা বিশ্বাস করিয়েছে যে, 'তালেবান' বিশৃঙ্খল একটি দলের নাম। যা কয়েক দিনেই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তালেবানের

রাজনৈতিক গুরুত্ব ও দূরদৃষ্টির স্বীকারোক্তিদানের জন্য কান্দাহার বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। সে তার মস্তকস্থিত চোখ দ্বারা বিমান বন্দরে উপস্থিত তালেবানের সুশৃঙ্খল শক্তি ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই সুস্পষ্টরূপেই প্রত্যক্ষ করছিল। কয়েক মিনিট দৌড়ানোর পর বিমানটি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায়। স্বভাবতই আমাদের ধারণা ছিল যে, বন্দী বিনিময়ের কাজে এবং আমাদের মুক্তি পেতে কয়েক ঘন্টা সময় অবশ্যই ব্যয় হবে। এমনিভাবে কিছু আশংকাও অন্তরে মোচড় দিয়ে উঠছিল। কয়েক ঘন্টার প্রত্যাশিত বিলম্বের চিন্তা আমার উপর পাহাড়ের মত সওয়ার হয়েছিল। মনে চাচ্ছিল যে, নিজে উঠে গিয়ে বিমানের দরজা ভেঙ্গে ফেলি এবং পাগলপারা হয়ে দৌড়ে গিয়ে কান্দাহারের সেই পাকভূমিতে অবতরণ করি, যেখান থেকে শহীদদের খুনের সুঘ্রাণ আমাকে এবং আমার অন্তর্জগতকে আকৃষ্ট করছিল।

বিমান থামতেই তাতে সিঁড়ি লাগানো হয়। আমি এক ব্যক্তিকে (পরে জানতে পারি, সে ভারতের প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিল) আমার দিকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। সে এসে আমাকে বলল—মাওলানা সাহেব! তাড়াতাড়ি নামুন। আমি তাকে বললাম—সবর কর। আমাকে পাগড়ী বাঁধতে হবে। কারণ, এটি তালেবানের দেশ। আমি বিমানে দাঁড়িয়েই এতমিনানের সাথে পাগড়ি বাঁধি। তারপর মুশতাক আহমদ জারগার ও অপর সঙ্গীকে সাথে নিয়ে নিচে নেমে আসি।

কান্দাহারের ভূমিতে পা রাখতেই হৃদয় জগতের অবস্থা বদলে যায়। জাহাজের সিঁড়ির পাশে তালেবানের কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অফিসার আমাদেরকে স্বাগত জানান। পরে জানতে পারি যে, তাদের মধ্যে কান্দাহারের কোর কমাণ্ডার মৌলবী মুহাম্মাদ আখতার উসমানী সাহেবও ছিলেন। তিনি উষ্ণতা ভরে সালাম দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে একটি গাড়ীতে বসিয়ে দেন। সে গাড়ীর ডানদিকে কয়েক পা দূরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সেই বিমান দাঁড়িয়েছিল, যা এক সপ্তাহ পূর্বে অপহরণ করা হয়েছিল। আমার দৃষ্টি সেই বিমানের উপর নিবদ্ধ ছিল। তালেবানের কোর কমাণ্ডার সাহেব আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে সেই বিমানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি

নীচে দাঁড়িয়ে হাইজ্যাকারদের সাথে কিছু কথা বলেন। তারপর আমি এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পাই যে, মুখোশ পরিহিতি দু'জন ব্যক্তি একটি সিঁড়িতে করে বিমান থেকে অবতরণ করেন। তাদের একজনের দেহ সুদৃশ্য স্যুট দ্বারা সজ্জিত ছিল। অপরজন সাফারী জাতীয় পোশাক পরিহিত ছিল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল পিস্তল এবং গ্রেনেড। তারা দু'জন দৌড়ে আমার গাড়ীর দিকে আসে এবং কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আবেগের সমুদ্র আমার উভয় দিকে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। সেই হাইজ্যাকার, যাদেরকে সন্ত্রাসী এবং কট্টরপন্থী বলা হয়—তারাই মানবীয় আবেগে উদ্বেলিত হচ্ছিল, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। হায়! বিশ্ববাসী যদি তাদের এ অশ্রু অবলোকন করত, তাহলে তারা অনুধাবন করতে পারত যে, কোমল হৃদয়ের এই তরুণদেরকে কিসে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে—সারা পৃথিবী যার নিন্দাবাদ করছে। নিঃসন্দেহে ভারতের জুলুম নির্যাতন এবং তার পাশবিক আচরণই উঠতি বয়সের এই মুসলমান তরুণদেরকে এমন চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। তরুণদ্বয় অবচেতন অবস্থায় ক্রন্দন করতে করতে আমার বক্ষমাঝে একাকার হয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তালেবান কোর কমাণ্ডার আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা কি নিশ্চিন্ত? তার একথা শুনে হাইজ্যাকাররা এমনভাবে সতর্ক হয়ে যায়, যেমন কিনা তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে। তারা তাড়াতাড়ি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে এবং কোর কমাণ্ডার সাহেবের নিকট তাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার বিষয় স্বীকার করে। তাদের মধ্য থেকে মূল্যবান পোশাকধারী হাইজ্যাকার—সম্ভবত সে তাদের প্রধান হবে, গাড়ীর জানালা দিয়ে ইঙ্গিতে কিছু বলল—যা দেখে অবশিষ্ট হাইজ্যাকাররাও বিমান থেকে নেমে দৌড়ে এসে গাড়ীতে আরোহণ করে।

অন্তহীন উচ্ছাস সত্ত্বেও এ পাঁচ ব্যক্তি যথাযথভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক রাখে। তাদের অস্ত্রকে নিজেদের থেকে পৃথক করেনি। তারা আদর্শ আঙ্গিকে দলপ্রধানের আনুগত্য করতে থাকে। হাইজ্যাকার পাঁচজন

তালেবান সরকারের উচ্চপদস্থ একজন অফিসারকে জামানত স্বরূপ আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে বসায়। গাড়ী অতি দ্রুত বিমান বন্দরের বাইরে চলে যায়।

আমার আশংকা ছিল যে, নাজানি শেষ মুহূর্তে কত ধরনের সংকটের সম্মুখীন হতে হয় কিংবা কত ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু এমন কিছুই হয়নি। বরং মধ্যস্থতায় তালেবানের উঁচুমানের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং তাদের শক্ত হাত থাকার বদৌলতে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন সকল ধাপ পার হয়ে যায়, যার জন্য কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় হওয়া ছিল এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। তালেবান সরকার বিশ্ববাসীর সম্মুখে একথা প্রমাণ করেছে যে, তারা আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহকে খুব ভাল করেই বুঝে এবং তা সমাধানের উৎকৃষ্টতম যোগ্যতাও তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

সেদিনও জুমুআর দিন ছিল। যেদিন আমার দু' হাত বেঁধে আমাকে একটি ট্রাকে নিক্ষেপ করা হয়, আর ট্রাক আমাকে সেই কারাগারের দিকে নিয়ে যায়, যেখান থেকে আমার বন্দী জীবনের সূচনা হয়। আজকের দিনও পবিত্র জুমুআর দিন। আমার উভয় হাত ছিল মুক্ত। আর আমি তালেবানের একটি গাড়ীতে সেই মুক্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম—যে মুক্তি সম্পর্কে আমার দুআ এই যে—

"হে আল্লাহ্! আমার এ আযাদীকে কাশ্মীর, বাবরী মসজিদ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদীর ভূমিকা বানিয়ে দাও। আমীন। ইয়া রাব্বাশ শুহাদায়ি ওয়ালমুজাহিদীন।"

আরেকটি দুআ

সুধী পাঠক! আজকে আপনাদেরকে একটি উপাখ্যান শুনাব, আর একটি আবেদনও পেশ করব। এবার আসুন, প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত সত্য দাস্তান শুনুন। একজন অধম ও অযোগ্য ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সম্প্রতিকালে কুফরের পাঞ্জা থেকে আযাদী দান করেছেন। বাহ্যত কুফরী শক্তি ছিল খুবই শক্তিশালী। সে ব্যক্তিকে মুক্ত করানোর জন্য মুসলিম উম্মাহর পাঁচজন তরুণ জানপ্রাণ বাজি রাখে এবং জীবনের ঝুঁকি নেয়।

কেমন ছিল তাদের কর্মতৎপরতা? সে বিষয়টি থেকে আপাতত দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখুন।

তবে একথা নিশ্চিত যে, এ তৎপরতা ব্যর্থ হলে এ পাঁচজন যুবকই নির্ঘাত শহীদ হত। ইতিপূর্বে সে ব্যক্তিকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে আঠারজন কিংবা তারও অধিক যুবক শাহাদাত মদিরা পান করেন। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও গৌরবময় এই তরুণেরা যদিও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, তবে শাহাদাতের মত মহামূল্যবান নেয়ামত তারা অবশ্যই লাভ করেছে। তারা কুফরী বিশ্বের সম্মুখে প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম ও তার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আজও অটুট ও উজ্জ্বল রয়েছে।

একথাও জানা গেছে যে, সে ব্যক্তিকে কাফেরদের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলমান অপূর্ব অপূর্ব আঙ্গিকে দুআ করেছেন। দুআর এসব ঘটনাবলী যতবেশী করে জানতে পারছি, হৃদয় ততই উত্তপ্ত হচ্ছে, আত্মা ঈমানী জযবায় উজ্জীবিত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা কল্যাণকর মনে হয়। কিন্তু সে অবসর সময় আমার হাতে নেই। পুরুষরা তো বটেই, মা–বোনেরা পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে দুআ করেছেন। শত শত মুসলমান কাবাঘরকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দরবারে তার মুক্তির জন্য অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে। উপরন্তু একথাও অবগত হয়েছি যে, সে অযোগ্য লোকটির জন্য 'আকাবির', মাশায়েখ এবং উলামায়ে কেরাম পর্যন্ত দুআ করেছেন এবং তার মুক্তির জন্য বিভিন্ন পন্থায় চেষ্টা করেছেন। তারপর যখন সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে, তখন আনন্দ উচ্ছাসের এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আরব–আজম ও প্রাচ্য–প্রতীচ্যের মুসলমানদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। সে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কিছুমাত্র তরঙ্গ প্রকাশ পেতেই কুফরী জগত প্রকম্পিত হতে থাকে। এ আনন্দ আর এ উচ্ছাস কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির মুক্তির চেয়েও ইসলামের বিজয়, কুফরের পরাজয় ও তার সেই শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ায় অধিক হয়েছে, যে কুফরী শক্তি মুসলমানদের সমস্যার সাপ হয়ে তাদের মস্তকে সওয়ার হয়েছিল। সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে এখন নিজের প্রিয়জন ও বন্ধু–বান্ধবের মাঝে অবস্থান করছে। কিন্তু সে ৬ বছর পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের যেই হিংস্র নৃত্য প্রত্যক্ষ করেছে, তা সে কোনভাবেই

ভুলতে পারবে না। সে তার অতি নিকটতম প্রিয় বন্ধু সাজ্জাদ খানকে লাঠি ও ডাণ্ডার প্রহারে শহীদ হতে দেখেছে। তার দেহে আঘাতের নীল দাগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছে। সে ব্যক্তির মাত্র কয়েক ফুট ব্যবধানে কারাগারেই নবীদ আনজুমের মত নিষ্ঠাবান ও অনুগত মুজাহিদ গুলি খেয়ে শাহাদাত বরণ করেন। সে ব্যক্তি টর্চারিং সেন্টারের চিৎকার ও আর্তনাদ নিজ কানে শুনেছে। সে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে কাফেরদের হাতে নির্যাতন সইতে দেখেছে।

সে ব্যক্তি কারাগারে অবস্থান করেই দুশমনের স্বরূপ উদঘাটনের ও তাদের দুর্বল দিকগুলোকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে সে সফলও হয়েছে। সে অযোগ্য ব্যক্তিটি কারাগারের অবসর মুহূর্তগুলোকে জিহাদের হাকীকত বুঝার এবং তা ভাষা ও কলমের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বুঝানোর প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে। সে ব্যক্তি কাফেরদের বেষ্টনীতে নিরাশ হয়ে পড়েছিল এবং বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে তার কারাগার থেকে জীবিত মুক্তি লাভ করার আশার গুড়ে বালি পড়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাকে অলৌকিক উপায়ে মুক্তিদান করেছেন এবং বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্রের পরিবর্তে তাকে সর্বপ্রথম নির্ভেজাল দারুল ইসলাম আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছেন।

পরে একথাও জানা গেছে যে, ভারত সরকার ইসরাইলের সহযোগীতায় সে ব্যক্তিকে খতম করে দিতে চায়। তারা মুসলমানদের নিকট থেকে সে জিনিস ছিনিয়ে নিতে চায়, যা তারা অনেক দুআ এবং অনেক পরিশ্রমের ফলে লাভ করেছে। এ ব্যাপারে জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভারত সরকার তার প্রচার মাধ্যমসমূহের মধ্যস্থতায় তার বিষাদগ্রস্ত মুশরিক জনসাধারণকে অতিসত্বর বড় মাপের সুসংবাদ শুনানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এ হলো সেই পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র, যা তাকে চিৎকার করে করে আহবান করছে যে, সে যেন তার অবশিষ্ট জীবনের হাতেগোনা দিনগুলোকে ইসলাম এবং জিহাদের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে দেয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং অধিকৃত ইসলামী দেশসমূহকে আযাদ করার লক্ষ্যে প্রাণপণ লড়াই করে।

কারণ, এটি তার জন্য যেমনি কর্তব্য তেমনি ঋণও বটে।

কিন্তু সে ব্যক্তি কোন্ স্থান থেকে তার কাজের সূচনা করবে? কেননা সে এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে খুবই মর্মাহত যে, মুজাহিদদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা ততই বিভক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে আহলে হক মুজাহিদদের বেশ কয়েকটি সংগঠন রয়েছে এবং প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যে কার্যত কয়েকজন করে আমীর রয়েছে। সে এটি দেখে ব্যথিত যে, এমন যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মুজাহিদ এ অবস্থার কারণে মনক্ষুন্ন হয়ে জি[illegible]কে পরিত্যাগ করেছে, যারা কাফেরের সঙ্গে টক্কর দিতে বিশেষভাবে পারঙ্গম ; তারা আজ দুনিয়ার ধান্ধায় ফেঁসে গেছে। সে এ অবস্থা দেখে খুবই পীড়িত যে, মুজাহিদদের সংশোধন ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রকার মেহনত করা হচ্ছে না। যে কারণে মুজাহিদদের মধ্যে দুনিয়ার মুহাব্বত, মিথ্যা, দ্বিমুখী আচরণ এমনকি খেয়ানতের মত মহামারী বিস্তার লাভ করার আশংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সে ব্যক্তি বড়ই বিস্মিত যে, উপরোক্ত অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও সংগঠন পরিচালকগণ অবস্থার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার সময় বের করতে পারছেন না। কারণ, আভ্যন্তরীন বিবাদ–কলহ ও পরস্পরের দোষারোপের কাজে তারা এ পরিমাণ ব্যস্ত যে, তাদের বেশীর ভাগ সময় এসব করতেই ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া যে সংগঠনের নামে কাজ চলছে, তার নাম হয়ে চলছে শক্তিশালী, কিন্তু কাজ হয়ে পড়ছে দুর্বল। অথচ এ নাম, না আল্লাহ রেখেছেন, না তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু এসব নামের কারণে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এক নামের সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে কাজ করছে, সে কোনভাবেই অন্য নামের সংগঠনকে সহ্য করে না। অন্য নামে কাজ করার সাহস রাখে না। এমনকি অন্য সংগঠনের মুজাহিদদের জিহাদকে জিহাদ পর্যন্ত মনে করে না। ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে, শহীদদেরকে পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠনের নামে বিভক্ত করা হয়েছে। এ কথাও জানা গেছে যে, এখন শহীদদের কবরে লাগানো ফলককেও পরিবর্তন করা হচ্ছে। যেন শহীদদের পবিত্র দেহে নিজেদের সংগঠনের নামের প্লেট বসানো সম্ভব হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তি যদি সে সব নামের মধ্য থেকে কোন একটার সাথে জড়িত হয়, তাহলে এতে করে তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়বে, যারা এসব নামকে সহ্য করতে পারে না। অথচ সকল আহলে হক তার নিকট থেকে সমানভাবে ভালকিছু আশা করে থাকেন। আর সে ব্যক্তি যদি পূর্বের নামের উপর কর্মতৎপরতাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে ঐক্য স্থাপনের আহবান জানায়, তাহলে এরা সবাই নিজের অধীনস্থদের সঙ্গে নিয়ে নতুন জোটের অধীনে আসবে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকে নিজের অধীনস্থদের থেকে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার নিয়ে রাখবে। তারপর পুনরায় সে তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করবে, যা করা হয়েছিল হরকাতুল আনসারের রূপ দেবার পর। যার কারণে আহলে হকের হৃদয়ের ক্ষতস্থান থেকে আজও রক্ত ঝরে থাকে।

বিধায় সে ব্যক্তির জন্য ইসলাম ও জিহাদের উঁচুমানের ও ব্যাপক পর্যায়ের খিদমত করার এ পন্থাই অবশিষ্ট থাকে যে, সে আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সকল নিষ্ঠাবান মুজাহিদের কাছে নিজেদের নাম ও পদ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে এক আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানাবে। তারপর তার আমীর তাকে যে কাজের জন্য মনোনীত করবে, সে সেই কাজের মাধ্যমে খালিস জেহাদের খেদমত করে যাবে। তবে আমীর নির্বাচন করতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণকে খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে, যা এ যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, মুসলমানদের শরীয়তসম্মত একমাত্র আমীর হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ (দাঃ বাঃ) বর্তমান রয়েছেন। বিধায় সে ব্যক্তি এস্তেখারা এবং পরামর্শ করার পর সকল আহলে হক মুজাহিদকে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছে—

ক. কোন মুজাহিদ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (কিতাল তথা সশস্ত্র জিহাদ)কে পরিত্যাগ করার কল্পনাও করবে না। ইতিপূর্বে যারা পরিত্যাগ করেছে, তারা তাওবা করে জিহাদের পথে ফিরে আসবে।

খ. সকল মুজাহিদ আত্মসংশোধনে যত্ন নিবে, সর্বপ্রকারের নৈতিক ব্যাধি ও কলহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে। জিহাদ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবার ও সমাজেরও সংশোধন করবে। প্রত্যেক মুসলমানকে

পরিপূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার দাওয়াত দিবে।

গ. সকল মুজাহিদ ঐক্যবদ্ধ হবে, মুনাফেকী ও বিভেদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা নিশ্চিহ্ন করবে। ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং আহলে হকের একক সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় শক্তি গঠনের লক্ষ্যে সংগঠনের নামসহ সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

এ দাওয়াত নতুন–পুরাতন এবং ছোট–বড় সকল মুজাহিদের উদ্দেশ্যে। যেই লাব্বাইক বলে এ ডাকে সাড়া দিবে, সেই তালেবানের মত ইহ–পরকালের সফলতা লাভে ধন্য হবে।

আল্লাহ তাআলা সাক্ষী যে, সে ব্যক্তির এই দাওয়াত দেওয়ার পিছনে কোন পদ লাভ করা, স্বার্থ হাছিল করা, কাউকে ছোট করা বা কাউকে বড় করা উদ্দেশ্য নয়। সে একান্তই আল্লাহর দ্বীনের আযমত, জিহাদী তৎপরতা এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার এরূপ চিন্তা–ভাবনার পিছনে কোন ব্যক্তি সমষ্টির পরামর্শ, উৎসাহ কিংবা অন্য কোন হাত কার্যকর নয়। সৌভাগ্য ও শুভলক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি যাকেই এ চেতনার প্রতি আহবান জানিয়েছে, তাকেই এ ব্যাপারে একমত পেয়েছে।

সুধী পাঠক! উপরে যাকিছু লেখা হল, তা লেখা সহজ কিন্তু বাস্তবায়ন করা কঠিন। এ যুগে নেক কাজের আহবানকারীর বিপক্ষে জিন শয়তান ও মানব শয়তান ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং সর্বক্ষেত্রেই তাকে অকেজো করে ছাড়ে, কিন্তু আল্লাহর সাহায্য সহযোগী হলে সব শয়তানের যাবতীয় শক্তি ব্যর্থ হয়ে যায়। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে তালেবান সম্পর্কে বলা হত যে, তারা ইসলামের কোন্ খেদমতটি করেছে? তারা শুধুমাত্র একটি সংগঠন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সংগঠনের কি অভাব ছিল যে, তারা নতুন সংগঠন করল? অনেকে তালেবানকে আমেরিকাপন্থী বলেছে, কেউবা তাদেরকে পাকিস্তানী এজেন্সীর কলকাঠি বলেছে। কিন্তু অল্পদিন পরে সন্দেহের মেঘ ছিন্ন করে সত্যের সূর্য বের হয়ে আসে। যার তীব্র প্রভায় চামচিকা চোখ বন্ধ করে ফেলে।

সুধী পাঠক! এ ব্যক্তিও এমনই এক চিন্তাধারা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আপনারা তার মুক্তির জন্য দুআ করেছেন এবং সে দুআ কবুলও হয়েছে।

এখন আপনাদের সমীপে তার আবেদন এই যে, আপনারা দুআ করুন যে, এ ব্যক্তি যে দাওয়াত এবং চেতনা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাতে যেন আল্লাহ তাআলা তাকে সফলতা দান করেন। আপনাদের নিকট তার এছাড়া আর কিছু চাওয়ার নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা কাজ নিতে চাইলে তিনি নিজেই তাকে যোগ্য লোক, উপযুক্ত সরঞ্জাম এবং উত্তম কেন্দ্র দান করবেন। ফলে অল্পদিনেই আহলে হকের সুসংগঠিত ও শক্তিশালী এক শক্তি অস্তিত্ব লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ। সে শক্তি কাশ্মীরকে ভারতের নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবেই ইনশাআল্লাহ।

সুধী পাঠক ! আর দেরী নয়, এবার উঠে উযূ করে দু' রাকাত নামায আদায় করুন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করুন। হতে পারে আপনার দুআ মুসলমানদের এ সাধের স্বপ্ন পূর্ণতা লাভের উসীলা হবে। যা দেখার বাসনা নিয়ে কত চক্ষু যে অশ্রু বিসর্জন করে শুস্ক হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

একটি চিত্র, একটি জবাব

দিল্লীর তিহার কারাগারে কিরণ বেদী নাম্নী একজন শিখ মহিলাকে আই.জি (ইন্সপেক্টর জেনারেল) করে পাঠানো হয়। সে কারাগারের ব্যবস্থাপনায় বেশ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করে। যার কিছু ছিল ভাল আর কিছু ছিল মন্দ। সে সব পরিবর্তনের মধ্যে একটি ছিল এই যে, সে কারাগারে বিড়ি, সিগারেট ও তামাক ব্যবহারের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞা নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হৈচৈ সৃষ্টি করে। তবে যারা কারাগার থেকে পয়সা কামাতে দক্ষ, তাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তারা উপার্জনের একটি নতুন পন্থা হাতে পেয়ে যায়। সিগারেটের যে প্যাকেট বাজারে ১০ টাকায় পাওয়া যায়, তা তিহার কারাগারের কর্মচারী ও দক্ষ লোকদের মেহেরবানীতে কারাভ্যন্তরে ২০০ থেকে ৫০০ টাকাতে বিক্রি হতে থাকে। যে বিড়ির প্যাকেটের স্বাভাবিক অবস্থায় দাম ২ টাকা, তা তিহার কারাগারে প্রাচুর্যের সময় ৫ টাকায় এবং অভাবের সময় ১০০ টাকায় আজও পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে কয়েকটি অদ্ভূত ঘটনা পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

আসল কথা এই যে, কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিড়ি সিগারেট ও তামাক সর্বদাই কারাবন্দীরা পেয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো, পকেট গরম থাকতে হবে। আর গরীব কয়েদীরা ধনী কয়েদীদের সেবাযত্ন করে এ সুবিধা ভোগ করে থাকে। সেখানে ব্যারাক ও সেল পরিস্কার করা এবং পাত্র ধুয়ে দেওয়ার বিনিময়ে অর্ধেক বিড়ি লাভ করা একটি সাধারণ নিয়ম। এমনিভাবে তিহার কারাগারে গোশত আনানো নিষিদ্ধ, তবে আপনি প্রতি কিলো ৫০০ টাকা দিয়ে আপনার ইচ্ছামাফিক গোশত আনাতে পারেন। বন্দীদের জন্য বিদ্যুতের হিটার ব্যবহার করা মারাত্মক অপরাধ, তবে ১০০ টাকার বিনিময়ে কারা কর্মচারীরা হিটারের লাইন দিয়ে থাকে। আর প্রতি সপ্তাহে তাদের খেদমত করা হলে কারাকর্তৃপক্ষ তল্লাশী করার পূর্বে তারা সাবধান করে থাকে। আপনারা পত্রিকায় হয়ত পড়েছেন, তিহার কারাগারে কোন কোন কয়েদীর কাছ থেকে মোবাইল টেলিফোনও উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডের একজন কয়েদী থেকে আমাদের সম্মুখে তার সামান্য বেওকুফীর কারণে মোবাইল ফোন ধরা পড়ে যায়। লোভে পড়ে সেই বেওকুফীটুকু না করলে ফোনের সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত হত না।

আমার পাশের সেলে বড় ধরনের একজন অপরাধী থাকত। ভারত সরকার তাকে অপরাধী বিনিময় চুক্তির অধীনে সিঙ্গাপুর সরকারের নিকট হতে এনেছে। তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে, কাঁধে তারকাখচিত বেল্ট পরা পুলিশ অফিসার অধিক মূল্যে তাকে সিগারেট ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করত। কোন খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তাকে অবহিত করে দিত। সে ব্যক্তি সকাল–সন্ধ্যা মোবাইল–টেলিফোনও ব্যবহার করত। সেই টেলিফোন ধরার জন্য আমাদের সম্মুখে তিনবার অতর্কিত অভিযান চালানো হয়। কিন্তু সে ঠিকই বেঁচে যায়। তার ফোনও নিরাপদ থাকে। অথচ কারাগারে অধিকাংশ উচ্চপদস্থ অফিসার তার ব্যাপারে কড়াকড়ি করত। কারাগারে চাকু রাখা নিষিদ্ধ, কিন্তু কারা কর্মচারীরা খুব চতুরতার সাথে এবং পরিশ্রম করে তাও জোগাড় করে দিত। বিনিময় ছাড়া তাদের একটি শর্ত এও থাকত যে, এগুলো ধরা পড়লে আমার নাম বলবে না, বরং তোমার

অপছন্দনীয় কোন কর্মচারীর নাম বলে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করবে।

ভারতের যোধপুর কারাগার কড়াকড়ি ও শাস্তির দিক থেকে অত্যন্ত কলংকিত একটি কারাগার। কিন্তু আপনি কারাগারে বন্দী মারাত্মক কোন ডাকাত বা চোরের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে সেখানেও সবকিছু পেতে পারেন। উপরোক্ত শর্ত আরোপের পরেও ধরা পড়ে গেলে, যে এগুলো সরবরাহ করেছে তার নাম না বলার জন্য তাগিদ করা হয়।

এগুলো তো ছিল সেসব বিষয়, যা ব্যক্ত করা যায়। উপরন্তু কারাগারে অনেক কয়েদী শুধুমাত্র টাকার কারসাজিতে এমন অনেক সুবিধাও লাভ করতো, যা বলার মত নয়। অথচ আইন ও সিকিউরিটির দিক থেকে সেগুলোর কথা কল্পনা করাও অবৈধ। কিন্তু দুশ্চরিত্র কয়েদী শরাব থেকে শুরু করে জুয়া এবং তাস সহ সকল অবৈধ বস্তু এমন সব কারাগারে পেয়ে থাকে, যেগুলোর কড়াকড়ির কথা সুদূর বিস্তৃত। তবে কারাকর্তৃপক্ষ যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কড়াকড়ি করার আশংকা করে, কিংবা অর্থের বিনিময়ে দেওয়া সুযোগ–সুবিধার কথা ফাঁস হয়ে যায়, তবে কয়েকদিনের জন্য এ সব সুযোগ সুবিধা আমানত স্বরূপ ফেরত নেওয়া হয়। আপনাদের হয়ত জানা আছে যে, অনেক ব্যক্তি কারাগারের ভিতরেই চরস, হিরোইন এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের কারবার করে কোটিপতি হয়েছে এবং তাদের সেই কারবারে নিত্যদিন প্রবৃদ্ধি ঘটছে।

একবার তিহার কারাগারে সিগারেট ও তামাকের কমতি দেখা দিলে তাতে অভ্যস্ত লোকেরা খুব বেশী অস্থির হয়ে পড়ে। তখন একজন পাকিস্তানী বন্দী স্মাগলার অগ্রসর হয়ে নেশাখোরদের ভরসা দেয়। সে বিশেষ উপায়ে কিছু মাল আনিয়ে হকদারদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়। ফলে একদিনেই সে ষোল হাজার টাকা মুনাফা করে। তিহার কারাগারে প্রবীণ নেশাখোরদের মধ্যে ঘটনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাখে। এ ঘটনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য ঘটনা কারাগারের এক সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। কারাগার তো বটেই টর্চারিং সেন্টারেও এ ব্যাপারে কোন কমতি নেই।

আমাদেরকে যখনই কোন টর্চারিং সেন্টারে নিক্ষেপ করা হতো, তখন প্রথমদিকে এরূপ মনে হত যে, আমরা চরম দেশপ্রেমিক লোকদের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। কারণ, আমাদেরকে প্রহার করা এবং কষ্ট দেওয়ার কাজে টর্চারিং সেন্টারের প্রত্যেকটি কর্মচারী প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নিত। তাদের প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাষায় আমাদেরকে চিৎকার করে বলত—তোমরা পাকিস্তানীরা আমাদের দেশের দুশমন। আমরা তোমাদেরকে কাঁচা চিবিয়ে খাব। তোমরা আমাদের দেশকে টুকরো টুকরো করতে এসেছ। এবার আমরা তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ছাড়ব, আমরা তোমাদের খুন পান করব, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এক-আধ মাসের নির্যাতনের পর তাদেরই অনেক কর্মচারী আমাদের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত, কেউ তাবিজ চাইত, কেউবা খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে বলত—কোন সেবা করার থাকলে আমাকে বলুন।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে বন্দীর নিকট কিছু টাকা পয়সা থাকলে বাইর থেকে চিঠিও পোষ্ট করাতে পারে এবং বাইরের নিষিদ্ধ পানাহার সামগ্রীও আনাতে পারে। এমনিভাবে বিপদজনক বিভিন্ন বস্তু যেমন টেপ রেকর্ডার, প্লাস এবং রেডিও সংগ্রহ করতে পারে। লোভ লালসা মুশরিকদের স্বভাব ও প্রকৃতির আবশ্যকীয় অঙ্গ হয়ে থাকে, বিধায় এ সব অবস্থার পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা নেই।

এটি কারা পরিস্থিতির সামান্য চিত্র মাত্র। এ 'চিত্র দর্পণে' সেসব লোক নিজেদের প্রশ্নের উত্তর দেখতে পাবে, যারা প্রশ্ন করে থাকে যে, দুশমনের কারাগারে অবস্থান করে প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখা কিভাবে সম্ভব? এবং সেগুলোকে কি করেই বা দেশে পাঠানো সম্ভব হয়?

সূচনার সন্ধানে

যেসব জিনিসের সূচনার কথা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, সেগুলোর সূচনার বিষয় অবগত হতে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু যেসব জিনিসের সূচনার কথা শরীয়ত বর্ণনা করেনি, সেগুলোর সূচনা অবগত হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। আফগান জিহাদের সূচনা কে করেছিল, সে বিষয়ে বিগত বছরগুলোতে আলোচনা চলতে থাকে।

ডজন ডজন নাম লেখা হয়, কিন্তু চূড়ান্ত এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হতে পারেনি। কেউবা এ আলোচনা শুরু করে যে, পাকিস্তানী মুজাহিদদের মধ্য থেকে কে সর্বপ্রথম আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে? এ ব্যাপারে অনেক কাহিনী, আলেখ্য ও অনেকের নাম সর্বসমক্ষে আসে। সেগুলোতে একজন আরেকজনের মতকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এ সমস্যারও সমাধান হয়নি।

বস্তুত সূচনার বিষয়টি অবগত হওয়াই অতি দুরূহ ব্যাপার। যেমন, কোন ঐতিহাসিক যদি ইবলিস শয়তানের বংশ পরম্পরা এবং তার আদি পুরুষদের নাম-ঠিকানা জানতে চায়, তবে এটি তার জন্য অসম্ভব ব্যাপার হবে। কেননা, এমন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বা কিতাব মওজুদ নেই, যা শয়তানের পিতা ও পিতামহের খবর দিতে পারে। আর শয়তানও তার শয়তানীতে এত ব্যস্ত যে, পরিচয় ও বংশ পরম্পরা লেখার মত অবসর তার নেই। এমনিভাবে কোন মানুষ তার নিদ্রার সূচনা বলতে পারে না। কেননা নিদ্রা অকস্মাৎ এসে পড়ে। মানুষ যদি তার নিদ্রার সূচনার সময় জানার জন্য ঘড়ি দেখতে থাকে তাহলে তার নিদ্রাই আসবে না। বিধায় নিদ্রার সূচনার সঠিক সময় বলা জটিল ব্যাপার। এখন যদি সমস্যার সমাধান এভাবে করা হয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধানে থাকবে, সে নিদ্রা গমনকারীর সূচনা নোট করে রাখবে, এটিও এক জটিল কাজ। কারণ, এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের ধারণামতে সারা রাতই নিদ্রা যায় না।

সুতরাং এ ধরনের কোন ব্যক্তির সঙ্গে আপনি যদি এক কক্ষে রাত কাটান এবং সে নিদ্রামগ্ন হওয়ার পর আপনি কোনরূপ আওয়াজ করেন, ফলে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলে সে আপনাকে একথাই বলবে যে, আমিও সজাগ আছি, আমার নিদ্রা আসছে না। এ ধরনের ব্যক্তিরা সারা রাতে দু' চারবার দু' এক মিনিটের জন্য জাগ্রত হলে তারা সকালে একথাই বলে যে, আমার সারারাত ঘুম আসেনি। এমনি এক ব্যক্তিকে ফজর নামাযের জন্য উঠানো হলে সে চোখ খুলতেই বলে যে, আমার সারারাত ঘুম আসেনি। একথা শুনে তাকে জাগ্রতকারী ব্যক্তি বলে—জ্বি হ্যাঁ, আপনার নাক ডাকার আওয়াজে আমারও সারারাত ঘুম আসেনি।

সত্যি এধরনের লোকদের নিদ্রার সূচনা অবহিত হওয়া কারো সামর্থাধীন নয়।

এমনিভাবে কোন জাতির অবক্ষয় ও অধঃপতনের সূচনা অবহিত হওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার। কোন ঐতিহাসিক যখন এ ব্যাপারে লিখতে শুরু করে, তখন তার কথা তৈরী করার জন্য অনেক তৈল পোড়াতে হয়। এ বিষয়ের সর্বাধিক দুঃখজনক দিক এই যে, কোন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর সূচনা তালাশ করতে করতে নিজের আখেরাতকে ভুলে বসে। সুতরাং এক ব্যক্তি খেলাফত থেকে মুলুকিয়াতের দিকে অধঃপতনের সূচনা কখন হয়, তার সন্ধান আরম্ভ করে। আর এর সন্ধানে সে নিজেকেও ভুলে বসে এবং নিজের আখেরাতকেও ভুলে বসে। ফলে সে এমন জুলুম নিজের উপর করে, যার অগ্নি এখনো জ্বলছে। এমনিভাবে নিজেকে জিহাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাতেও অনেক ব্যক্তি আখেরাতকে বিস্মৃত হয়ে যায়। অথচ এ সব বিষয়ের সূচনা সন্ধান করা ও তা স্মরণ করা এত জরুরী নয়, নিজের আখেরাতকে স্মরণ রাখা যত জরুরী।

সারকথা এই যে, কোন জিনিসের সূচনা তালাশ করা একটি কঠিন কাজ, কিন্তু অতীতের মত বর্তমান ও ভবিষ্যতেও অনেক ব্যক্তি এ দুরূহ কাজ করতে থাকবে। তবে আমার আবেদন এতটুকু যে, কোন জিনিসের সূচনা সন্ধান করার সময়ে নিজের শেষ পরিণতি ও আখেরাতকে বিস্মৃত না হওয়া চাই এবং সীমাবদ্ধতা থেকে বিরত থেকে অন্যান্য মতামতকেও যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন করা দরকার।

পরিস্থিতির এপিঠ ওপিঠ

বর্তমানে এমন দ্বিমুখী অবস্থা বিরাজ করছে, যে ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় ও সুহৃদ পাঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা নিতান্ত জরুরী মনে করছি। একদিক হল সেই সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রসমূহ, বর্তমানে যার জাল বিছানো হয়েছে এবং সে জালকে অধিক বিস্তৃত করা হচ্ছে। ১৯৯৯ ঈসায়ীর ৩১শে ডিসেম্বর ছিল ভারতের জন্য সামরিক ও কূটনৈতিক শোচনীয় পরাজয়ের দিন। যে সরকার নিজের সামরিক শক্তি,

আণবিক শক্তি এবং কূটনৈতিক প্রাধান্যের ব্যাপারে গর্বিত ছিল, সেদিন সে চরম পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। সেদিনের পরাজয়ের কালিমা গভীর ক্ষত হয়ে ভারতের চেহারায় কলংক হয়ে আছে। যা থেকে ভারতের মুক্তির কোন উপায় নেই এবং তা আড়াল করার কোন পথ নেই। ভারত তার সে লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে কিছু পরিমাণ মুক্তিলাভের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কয়েকটি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ভারত খুব ভাল করেই বুঝে যে, ১৯৯৯ ঈসায়ীর ৩১শে ডিসেম্বর ভারতের ভয়ংকর কারাগার থেকে যে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেছে, সে যতদিন বেঁচে থাকবে এবং জিহাদের ডাক দিতে থাকবে, ততদিন ভারতের বুকে পরাজয়ের কলংক এবং ক্ষত গভীর হতে থাকবে। বিধায় তাকে হয় হত্যা করতে হবে, না হয় তার রসনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভারত সরকার সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে সাধারণভাবে এবং দেশের জনগণের সম্মুখে বিশেষভাবে খুবই লজ্জিত। তাই সে তার সংকল্পসমূহকে গোপন করার চেষ্টা করেনি, বরং প্রথমে ইঙ্গিতে তারপর স্পষ্টভাবে একথার জানান দিয়েছে যে, সেই ব্যক্তিকে অতিসত্বর হত্যা করা হবে, না হয় গুম করা হবে—যার কারণে ভারতকে চরম লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ভারত এ পরিস্থিতি দেখে অনেকটা নিরাশ হয়ে যায় যে, ঈমানী আবেগে মাতোয়ারা ডজন ডজন তরুণ পূর্ণ সজাগ ও সংকল্প সহ সর্বদা ঐ ব্যক্তির পাশে অবস্থান করে। তাদের হাতে উন্নতমানের অস্ত্র এবং চোখে অসাধারণ ঈমানী দীপ্তি থাকে এবং চব্বিশ ঘন্টা তারা পূর্ণ সজাগ থেকে তাকে অব্যাহতভাবে পাহারা দেয়। হিন্দুরা স্বভাবতই ভীরু কাপুরুষ হয়ে থাকে, বিধায় এ অবস্থা দেখে নিঃসন্দেহে তাদের সাহস দমে যায়। তবে তাদের পরিবেশিত সংবাদ অনুপাতে তারা ইসরাইলের সহযোগিতায় এখনো এ ব্যাপারে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারা সফল হবে, না ব্যর্থ হবে তা জানা নেই, তবে তারা যদি সফল হয়ও তাহলে তা তাদের নয় বরং আমাদেরই সফলতা হবে, ইনশাআল্লাহ। কেননা ইসলামের বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের জন্য শহীদদের রক্তের চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই।

কিন্তু হত্যার চেষ্টা ও সংকল্পের সাথে সাথে অপর একটি অঙ্গনেও ভারত পরিশ্রম শুরু করে। আর এ উদ্দেশ্যে সে অন্যান্য দেশ এবং সম্ভবত কয়েকজন সাংবাদিকের খেদমতকে ধার নেয়। এ অঙ্গনে তাদের পদক্ষেপসমূহ খুবই প্রভাবশালী। পদক্ষেপসমূহ এই যে, একদিকে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা যে, পাকিস্তানের যে নাগরিক ১৯৯৯ ঈসায়ীর ৩১শে ডিসেম্বর ভারত থেকে মুক্তি লাভ করে এসেছে—তাকে পাকিস্তানে স্বাধীনভাবে ছেড়ে রাখা হয়েছে কেন? এবং ভাষণ-বিবৃতির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কেন? অথচ এ চাপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অমানবিক। কিন্তু অত্যন্ত জোরাল পন্থায় এ চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে, বিধায় তার কম বেশী প্রভাব পড়েই থাকে। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের কয়েকজন সাদা এবং কয়েকজন কাল কাফের পাকিস্তান এলেই পাকিস্তান সরকারের উপর এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এমনিভাবে পাকিস্তান সরকারের কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যখনই কোন প্রেস কনফারেন্সে কথা বলে, তখনই বিশেষ কিছু সাংবাদিক তাদের নিকট বারংবার এ প্রশ্নই করে থাকে যে, আপনারা অমুক মাওলানাকে কেন স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের সরকার এ অর্থহীন প্রশ্নের যথাযথ জবাবও দিয়েছেন। যেমন, জবাব দিয়েছেন যে, সে মাওলানা পাকিস্তানের নাগরিক, সে এখানে সে সব অধিকারই লাভ করে থাকে, যা পাকিস্তানের অন্যান্য নাগরিক লাভ করে থাকে। দ্বিতীয়ত, ভারত নিজেই তার কোন দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। তাহলে কোন্ অপরাধের শাস্তি হিসাবে দেশে তাকে কিংবা তার মুখকে বন্ধ করা হবে। তাছাড়া সে পাকিস্তানে কোন অপরাধও করেনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কোন কোন সাংবাদিক কোন কোন কর্মকর্তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পরাভূত করে তাদের উপর একধরনের চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

এমনিভাবে কোন কোন সাংবাদিক কোন কোন বক্তব্যকে দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত করে তুলে ধরে, যেন সরকার এবং মুজাহিদদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। যেমন আমি ভাওয়ালপুরে ঈদের নামাযের সমাবেশে ঘোষণা করেছিলাম যে, ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করলে আমরা ইনশাআল্লাহ পাঁচ লক্ষ মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে তার উপযুক্ত

জওয়াব দেব। আর এ মুজাহিদ হবে সেনাবাহিনী ছাড়া। কিন্তু কোন কোন সাংবাদিক সরকারী প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, অমুক মাওলানা পাঁচ লক্ষ মুজাহিদ নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করার ঘোষণা দিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনারা কি বলেন? এমতাবস্থায় সরকারকে একথা বলতে হয় যে, এধরনের বক্তব্য বাস্তবিকই দায়িত্বহীনতামূলক। এ ব্যাপারে আমরা তার কাছ থেকে নোটিস গ্রহণ করব। এমনিভাবে বড় বড় কয়েকটি দেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তান সরকারকে এভাবে ধমকানো হয়েছে যে, আপনারা যদি এ মাওলানাকে এবং তার মুখকে বন্ধ না করেন, তাহলে আমরা আপনাদেরকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করব। যেন সে সব রাষ্ট্রের নিকট এটমবোমের অবৈধ ব্যবহার শান্তিপ্রিয়তার অন্তর্ভুক্ত। তবে একজন মাওলানার জিহাদের দাওয়াত দেওয়া এটম বোম থেকেও অধিক বিপদজনক। যে কারণে পুরোদেশকে সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

এমনিভাবে কিছু সাংবাদিক এবং কুফরী শক্তির কিছু অনুচরের মাধ্যমে সে ব্যক্তির ব্যাপারে—যে ভারত থেকে মুক্তি লাভ করেছে—অদ্ভূত অদ্ভূত প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, যেন সে ব্যক্তিকে সন্দেহজনক প্রমাণ করে জিহাদের দাওয়াতকে সন্দেহযুক্ত সাব্যস্ত করা যায়। সুতরাং বারবার এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে যে, সেই মাওলানা ভারতের কারাগারে বসে কি করে জিহাদ সংক্রান্ত কিতাব লিখল এবং কিভাবে সে সমস্ত কিতাব পাকিস্তানে পাঠাল? বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ প্রশ্ন এমন সময় উত্থাপন করা হচ্ছে, যখন ভারতের পার্লামেন্টে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে যে, এই মাওলানার জিহাদের বক্তব্য সম্বলিত ক্যাসেট ভারতে কি করে আসছে এবং কিভাবে বিরাট সংখ্যক ক্যাসেট এদেশে ছড়িয়ে পড়ছে?

যাই হোক, এ হল পরিস্থিতির একদিক। যারফলে পাকিস্তানের একজন নাগরিককে বাধ্য করা হচ্ছে যে, সে যেন মুসলমানদেরকে কুরআনে বর্ণিত জিহাদের পয়গাম শুনাতে না পারে এবং মজলুম মুসলমানদের বেদনার কথা অন্যান্য মুসলমানদের নিকট পৌঁছাতে না পারে। অথচ সে ব্যক্তির অপরাধ এতটুকুই যে, সে ভারতের কারাগার

৪—

থেকে মুক্তিলাভ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুশরিকদেরকে পরাজিত করেছেন। হ্যাঁ, তার এসবের চেয়েও গুরুতর অপরাধ এই যে, সে এমন এক মুসলমান, যে জিহাদকে বিশ্বাস করে এবং জিহাদের দাওয়াত দেয়।

সুধী পাঠক, এবার আসুন অবস্থার অপর দিকের প্রতি, তা এই যে, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা জাইশে মুহাম্মাদকে বিশেষ কবুলিয়াতের মাধ্যমে ভূষিত করেছেন। এ পর্যন্ত শুধু করাচী শহরেই তার পঞ্চান্নটি শাখা কায়েম হয়েছে। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর অভ্যন্তরে সিংহভাগ মুজাহিদ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে সৌভাগ্য ভেবেছেন। সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং আযাদ কাশ্মীরেও তার আওয়াজ পৌঁছেছে। আকাবিরদের দুআ ও পৃষ্ঠপোষকতা বিরাট বড় পুঁজি, সে পুঁজিও খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সব অঞ্চলে জাইশে মুহাম্মাদের প্রতিনিধি যেতে পারেনি, সেখানকার মুসলমানরা নিজেরা পয়গাম পাঠাচ্ছে যে, আপনারা সত্বর আসুন এবং এখানেও জাইশে মুহাম্মাদের শাখা কায়েম করুন। আলহামদুলিল্লাহ! মুজাহিদদের মধ্যে তালীম-তারবিয়তের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং সর্বত্র আল্লাহ তাআলার নুসরতের বিরল বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে.....।

আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন কাফের ও মুশরিকদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন এবং জাইশে মুহাম্মাদকে কবুল করেন। আমীন ইয়া রাব্বাশ শুহাদায়ী ওয়ালমুজাহিদীন।

একটি ঘটনা, একটি শিক্ষা

আজকের আসরে আমার সুধী পাঠকদেরকে একটি ঘটনা শুনাতে চাই। ঘটনাটি চিন্তা-চেতনার একটি নিরাপদ ও সাবধানী পথ নির্ধারণ করে দেয়। ১৯৯৪ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীকে ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর প্রসিদ্ধ টর্চারিং সেন্টার—বাদামীবাগ আর.আর. সেন্টার, শ্রীনগর থেকে জম্মুর কোট ভলওয়াল কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। সে সময় সেখানে প্রায় এক হাজার মুজাহিদ বন্দী ছিল। সেনাবাহিনীর টর্চারিং সেন্টারের তুলনায় এখানে মুজাহিদদের জন্য

অধিক সুবিধা ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমরা আসার পূর্বেই কারাগারের মুজাহিদরা আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে অধীর আগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

রাত ১টার সময় দীর্ঘ নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার ছোট এই কাফেলা যখন কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তখন প্রধান ফটকের নিকট শত শত মুজাহিদ কাফেলাকে উষ্ণ ভালবাসা এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে স্বাগত জানায়। আমার স্মরণ আছে, মুজাহিদ সাথীরা আমাদেরকে হাতে উঠিয়ে নেয় এবং এমন অসাধারণ ভালবাসা দিয়ে আমাদেরকে কারাগারের ব্যারাকে নিয়ে যায়, যা আমরা কখনো বিস্মৃত হতে পারব না। টর্চারিং সেন্টার থেকে আগমনকারী এ কাফেলা বিদেশী মেহমান মুজাহিদদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তাই কাশ্মিরী ভ্রাতৃগণ ভালবাসায় একাকার হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষত শহীদ কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান, কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মনসূর লেংরিয়াল এবং আরও কিছু সঙ্গীকে এক ঝলক দেখার জন্য তারা অস্থির ছিল। সে রাত আমরা ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অকৃত্রিম পুষ্পের সুগন্ধির মধ্যে অতিবাহিত করি। কিন্তু ভোর হতেই আমরা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি যে, কারাগারের বাহ্যিক এই আযাদীর পশ্চাতে দুশমনের হীনমনোবৃত্তি কার্যকর রয়েছে। দুশমন এখানে কাশ্মীরের জিহাদী আন্দোলনকে জবাই করার পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছে।

আমরা দেখি যে, অধিকাংশ কয়েদীর নিকট নিজের বানানো খঞ্জর, তরবারী এবং ছুরি রয়েছে। সংগঠন ভিত্তিক কলহের সময় সেগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে মুজাহিদদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করারও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাপনা ছিল। তারা রাতের বেলায় পরস্পর থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাহারার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। দু' এক দিন যেতেই আমরা কয়েকজন আহত মুজাহিদকে দেখলাম, যারা এ ধরনের লড়াইয়ের তাজা শিকার হয়েছিল।

আমরা সেখানে যাওয়ার দু' তিন দিন পর দুশমনেরা কয়েকটি বড় সংগঠনের মাঝে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, বন্দীরা একে অপরের ব্যারাককে অবরোধ করছে। পরস্পর পরস্পরকে গ্রেফতার করছে। সেদিনের এ ভয়ানক দৃশ্য আমার ভিতরকে ভীষণভাবে নাড়া

দেয়। আমি পরিণতির দিকে লক্ষ্য না করে এমন এক সিদ্ধান্ত নেই, যা আমার বেশীর ভাগ সাথীর মনঃপুত ছিল না। কিন্তু আমি এ লড়াইকে বন্ধ করানোর জন্য নিজে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করি। আমার সঙ্গীরা আমাকে বলেন, আল্লাহ না করুন, আপনার কিছু হয়ে গেলে তখন লড়াই বিপদজনক রূপ ধারণ করবে। কিন্তু আমি কারো কথার প্রতি কর্ণপাত না করে উন্মত্তের ন্যায় সেই ব্যারাকের দিকে দৌড়ে যাই, যেখানে কয়েকজন মুজাহিদকে অন্য কয়েকজন মুজাহিদ বন্দী করে রেখেছিল। আমি যখন সেখানে পৌঁছি, তখন সেখানে দশ–এগারজন মুজাহিদ পাহারা দিচ্ছিল। আমাকে এ অবস্থায় আসতে দেখে তারা ডানে–বামে হটে যায়। আমি ব্যারাকের দরজা খুলে দেই। বন্দী মুজাহিদরা মুক্ত হয়ে যায়। তারপর আমি সকল মুজাহিদকে চিৎকার করে ডেকে ডেকে বড় একটি ময়দানে একত্রিত করি।

আল্লাহ পাকের মদদ ছিল। সকলে লড়াই পরিত্যাগ করে জমা হয়ে যায়। আমি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি। মুজাহিদদের ঐক্যের দাওয়াত দেই। তাদেরকে আমি বলি যে, আমাদের মায়েরা কোলের সন্তানকে এজন্য জিহাদে পাঠাননি যে, তারা কারাগারের মধ্যে নিজেদের সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করবে। আপনারা সকলেই মুজাহিদ। কিন্তু দুশমন আপনাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খাড়া করে দিয়েছে। বাস্তবিকই যদি দুশমনের যাদু আপনাদের উপর কার্যকর হয়ে থাকে এবং আপনারা পরস্পরের রক্তের পিপাসু হয়ে থাকেন, আপনাদের মাথায় যদি খুন চড়ে থাকে, তাহলে আমি হাজির আছি, আপনারা আমাকে হত্যা করে অন্তরকে ঠাণ্ডা করুন, কিন্তু আল্লাহর জন্য পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যান। একে অপরকে কষ্ট দিয়ে দুশমনকে হাসার সুযোগ দিবেন না।

বক্তব্যদানকালে সকল মুজাহিদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আক্রমণকারী দলের নেতা দাঁড়িয়ে যায় এবং উচ্চস্বরে শ্লোগান দেয়—'আওয়াজ দো হাম এক হ্যায়।' আর কি, সারা জেলখানা আল্লাহু আকবার আর ঐক্যের শ্লোগানে গুঞ্জরিত হতে থাকে। কারা অফিসের ছাদ থেকে কারাকর্তৃপক্ষ এ দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে যায়। কেননা বহু বছরের পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা বিরোধের যে ঘৃণিত প্রাসাদ খাড়া

করেছিল, তা ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক পূর্ণ দীপ্তিমান হয়ে ঝলমল করে উঠেছে।

পরদিন আমরা কারাগারের ভিতরে একটি উত্তম শৃংখলা ও আত্মশুদ্ধিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করি। আলহামদুলিল্লাহ, দরসে কুরআনের ধারাবাহিকতা খুব জোরে শোরে আরম্ভ হয়ে যায়। দ্বীনী তা'লীমের ক্লাশ শুরু হয়। মুজাহিদগণ একে অপরের সেবায় নিয়োজিত হন। দরসে কুরআনের মাহফিলে শত শত তরুণ এবং বর্ষিয়ান ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জমে বসতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থকার, কলামিষ্ট এবং কুরআনের পাঠদানকারী উস্তাদও ছিলেন। আমি তাদেরকে আমার সঙ্গে এবং নিকটে বসার দাওয়াত দিলে তারা বলেন যে, জীবনে আমরা এই প্রথম কুরআনের এমন তাফসীর শুনছি (এটি তাদের সুধারণা প্রসূত ছিল) তাই আমাদেরকে মাটিতে বসে শুনতে দিন। এতে আমরা অধিক স্বাদ পাই।

মোটকথা, কয়েকদিনের মধ্যে বিরোধের শয়তানী জাল ছিন্ন হয়ে যায়। কারাগারে ভালবাসা, অপরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আত্মশুদ্ধির অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, দুশমনের জন্য যা সহ্য করা ছিল অসম্ভব। তারা আমাদের সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে বের করে জম্মুর তালাবতলু টর্চারিং সেন্টারে পাঠাতে আরম্ভ করে। আমাদের মাত্র চারজন সাথী সেখানে পৌঁছতেই সেখান থেকে মর্মন্তুদ নিপীড়নের সংবাদ আসতে থাকে। এ চারজনের পর অন্যান্য সাথী এবং আমার পালা ছিল।

কারাগারের বন্দী সাথীদের মধ্যে চরম অস্থিরতা ও অসহ্য উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আমাদের উপরও এমন পাশবিক নির্যাতন চালানো হবে তা তাদের নিকট অসহ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং কারাগারে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায় এবং বন্দীদের মধ্যে পরস্পরে লড়াই করানোর জন্য দেওয়া স্বাধীনতার জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে চড়া মূল্য দিতে হয়। তারা আমাদেরকে কারাগার থেকে বাইরে আনার জন্য ভিতরে নোটিশ পাঠালে মুজাহিদরা তা ছিড়ে ফেলে দিত। তারা লোক পাঠালে মুজাহিদরা তাদেরকে অপমান করত এবং আমাদের পর্যন্ত আসতে দিতো না।

এ সময় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে যে, একটি সুড়ঙ্গ খনন করে সকল বন্দী মুসলমানকে মুক্ত করা হউক। যাতে সকল বন্দী আযাদী লাভ করতে পারে। সুতরাং অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কারা কর্তৃপক্ষ আমাদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে ডেকে নিয়ে বলে যে, আপনারা মাওলানা এবং তার সাথীদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা তাদের নিকট মৌখিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব। আমরা ওয়াদা করছি, তাদের উপর কোনপ্রকার জুলুম নির্যাতন করব না। এই নেতৃস্থানীয় লোকগুলো সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। তারা এসে আমাকে বললেন, কারা কর্তৃপক্ষ নির্যাতন না করার ওয়াদা করেছে। তাছাড়া কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা সে তো আইনগতভাবেও আবশ্যকীয়। আপনারা যদি বের না হন, তাহলে কারা কর্তৃপক্ষ সকল বন্দীকে কষ্ট দিবে এবং তাদেরকে মৌলিক সুবিধাদি থেকেও বঞ্চিত করবে। বিধায় কল্যাণ ও কৌশলের দাবী এই যে, আপনারা কারা কর্তৃপক্ষের কথা শুনুন। কেননা তারা নির্যাতন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এখন আমরা এক জটিল অবস্থায় পড়ে যাই, আমরা তাদেরকে সুড়ঙ্গের কথা বলতেও পারছিলাম না, আর এছাড়া যুক্তিযুক্ত কোন ওজরও পেশ করতে পারছিলাম না। আমাদের আর অল্প কয়েকটি দিন প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আমরা তাদেরকে ফিরাতে চেষ্টা করি, কিন্তু যুক্তিযুক্ত কোন কারণ দর্শাতে না পারায় আমাদের চেষ্টা ছিল দুর্বল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হয় যে, যে কারাগারে প্রত্যেক মজলিসে আমাদের পাকিস্তানী মুজাহিদ সাথীদের ভূয়সী প্রশংসা করে কাব্য গাঁথা পাঠ করা হত, তা আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। গতকাল পর্যন্ত যে সকল মুজাহিদ আমাদের চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করত, তারা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। যে সকল লোক আমাদের ভালবাসায় জান কুরবান করার দৃঢ় সংকল্প রাখত, তারা বিরল বিস্ময়কর সন্দেহে পড়ে যায়। কেউ বলছিল, এই পাকিস্তানী মুজাহিদরা নির্যাতন দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কেউ বলছিল, এরা অহংকারে লিপ্ত, ফলে কারো কথাই শুনছে না। আবার কেউ বলছিল, এরা কাল পর্যন্ত আমাদেরকে আত্মত্যাগের

গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করত, এখন চারটি লাঠি খাওয়ার ভয়ে সকল বন্দীর জন্য বিপদ হয়ে আছে।

জেলের প্রত্যেক ব্যারাকে এসব কথাই চলতে থাকে। একজন বর্ষিয়ান ব্যক্তি—যিনি আমার নিকট তাফসীর পড়তেন এবং আমার বিপক্ষে সামান্য কথাও সহ্য করতে পারতেন না—আমার মুখের উপর বললেন—মাওলানা! আমার মেয়ে আপনার সমবয়স্কা। আমি বৃদ্ধ বয়সে এত নির্যাতন সহ্য করছি, আর আপনি যুবক হয়ে ভয় পাচ্ছেন। দরসে কুরআনের বলয়ও সংকুচিত হয়ে আসে। তবে কিছু অকৃত্রিম বন্ধু শেষ পর্যন্ত একথাই বলেন যে, তাদের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। অবশ্যই এমন কোন হিকমত রয়েছে, যে কারণে এরা কারা কর্তৃপক্ষের কথা মানছে না। কিন্তু এমন চিন্তার লোক ছিল খুবই কম।

এ সময় ইতিহাসের মিথ্যা বর্ণনার উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে যায়। আমি ভাবি যে, আমাদের আকাবিরগণ বাস্তবিকই সঠিক কথা বলেছেন যে, ইতিহাস সে তো বাহ্যিক চোখে দেখা ঘটনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারে না। এজন্য মহান ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে কখনই মন্দ সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত নয়।

যাই হোক, কারাগারের পরিবেশ একাকীই আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা তাদেরকে আসল কথা বললে নিশ্চয়ই সকলে নিশ্চিন্ত হত এবং আমাদেরকে পূর্বের চেয়ে অধিক ভালবাসতে শুরু করত। কিন্তু তখন এ কাজ গোপন রাখা সম্ভব হত না। অবশ্যই একথা দুশমনের কাছে পৌঁছে যেত। কেননা দুশমন তাদের কিছু লোককে মুজাহিদদের বেশে কারাগারের ভিতরে ঢুকিয়েছিল। এমন সংকটময় অবস্থাতে আমাদের আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন ভরসা ছিল না। আমরা নিকৃষ্টতম দুশমনের হাতে বন্দী ছিলাম। যারা চব্বিশ ঘন্টা আমাদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। অপরদিকে সুড়ঙ্গের জটিল ও বিপদজনক কাজের চাপ ছিল, যার কারণে রাতে জাগতে হত। আর দিনের বেলায় সাথীদের মধ্যে এজন্য জেগে থেকে পড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকতে হত, যাতে করে রাতে জেগে থাকার

বিষয়টি গোপন রাখা যায়। কারাভ্যন্তরে উপস্থিত সংগঠনসমূহ এবং মুজাহিদগণও আমাদের বিরোধী ছিল। তারা তাদের উপর আপতিত সমস্যাবলীর জন্য আমাদেরকে একমাত্র দায়ী মনে করছিল। এমতাবস্থায় কাকে সন্তুষ্ট করব আর কাকে অসন্তুষ্ট করব। পাঠক নিজেই ভেবে দেখুন।

আজ এ ঘটনার সাড়ে ছয় বছর পর যখন কেউ কেউ বলে—আমরা আপনাকে খুব মুহাব্বত করতাম, আপনাদের থেকে উম্মত অনেক কিছু আশা করত। আপনার উচিত ছিল সম্পূর্ণ নিস্কলংক থাকা। কিন্তু আপনি তো একটি সংগঠন খাড়া করেছেন। আপনি কিছু লোকের কথা শুনে তাদের কথা মত চলছেন। অথচ সমস্ত উম্মত আপনার দিকে তাকিয়েছিল, আপনার জন্য দুআ করছিল। তখন আমার জম্মু কারাগারের সেই ঘটনা স্মরণ হয় যে, এখন আমি কি করব। আমি কি কিছু লোকের ঘৃণাকে ভালবাসায় রূপান্তর করার জন্য জিহাদের কাজ এবং ঐক্যের মুবারক আমল পরিত্যাগ করব, নাকি আমি কাশ্মীর স্বাধীন করার জন্য এই চেষ্টাকে অব্যাহত রাখব, যা আমি আরম্ভ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে আমি খুব জোরালোভাবে আমার নির্দোষিতা তুলে ধরতে পারি এবং আমার কোন কোন বন্ধুর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর দিতে পারি, কিন্তু আমি এ সকল কাজের পিছনে পড়লে উম্মতের মধ্যে জিহাদের রূহ উজ্জীবিত করার কাজ পিছনে পড়ে যাবে এবং এমন পরিস্থিতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাবে, যা সাধারণ মানুষের কাছে কখনোই প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। জম্মু কারাগারে কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু আস্থা পোষণ করেছিল এবং না দেখে সমর্থন করেছিল। আজও এমন নিষ্ঠাবান লোকের প্রয়োজন। কেননা বর্তমান যুগে জিহাদ এবং ঐক্য শ্বাস গ্রহণের চেয়েও অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। জম্মু কারাগারে আমরা সবর করি এবং নিজেদের সাফাই তুলে ধরার পরিবর্তে ডজন ডজন সাথীকে আযাদ করার লক্ষ্যে সুড়ঙ্গ খনন করতে থাকি। পরবর্তীতে যখন উদঘাটিত হয় যে, আমরা আযাদীর জন্য সুড়ঙ্গ খনন করছিলাম, তখন যেসব লোক উচ্চবাচ্য করেছিল এবং আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, তারা অশ্রু ঝরাতে বাধ্য হয়।

আজও আমি আমার ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ

করছি এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্মান ও লাঞ্ছনাকে পরোয়া না করে জিহাদ এবং মুজাহিদদের মাঝে ঐক্যের কাজ চালু রাখার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি। এই কলাম লিখে এ বিষয়ের উপর লেখালেখিও শেষ করছি এবং দুআ করছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং সকল মুজাহিদকে নফসের অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করুন। আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করুন এবং আমাদের থেকে এমন কাজ নেন, যা তাঁর সন্তুষ্টির এবং আমাদের মাগফিরাতের উপকরণ হবে।

আল্লাহপ্রেমিকদের সঙ্গে ঈদের কয়েকটি মুহূর্ত

আজ ঈদুল আযহার দ্বিতীয় দিন। সমগ্র বিশ্বের মুসলমান আনন্দ উদযাপন করছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পশু কুরবানী করছে। তাদের মধ্যে কিছু মুসলমান এমন খোশ কিসমতও রয়েছেন, যাঁরা কাশ্মীর ও অন্যান্য রণাঙ্গনে নিজেদের মূল্যবান জান কুরবানী করছেন। তবে আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও রয়েছেন, যাঁরা অপূর্ব প্রেমিকসুলভ আঙ্গিকে ঈদ উদযাপন করে থাকেন। সমগ্র বিশ্বের মুসলমান যদি সে প্রেমিকদেরকে স্মরণ করত এবং তাদের জন্য কিছু করার সংকল্প করত, তাহলে কতই না ভাল হত। কারণ, তাদের সংকল্প বাস্তবে পরিণত হওয়ার এবং তা ক্ষমা, মুক্তি ও সফলতার কারণ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে। সুধী পাঠক! আসুন নিকটবর্তী অতীতের একটি পাতা মেলে ধরি এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য আশেকদের মাহফিলে অংশ নেই।

শ্রীনগর শহরে বাদামীবাগের সেনা ছাউনী এবং তার কেন্দ্রসমূহের আলোচনা আপনারা বহুবার শুনেছেন। সেখানে ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনী আর.আর. সেন্টার নামে একটি টর্চারিং সেন্টার তৈরী করেছে। কথিত আছে যে, এক সময় সেখানে কসাইদের দোকান ছিল। সেখানে তারা পশু জবাই করে গোশত বিক্রি করত। আর বর্তমানে সেখানে পশুর স্থলে আমাদের মুজাহিদদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ কানে পড়ে।

আমি বন্দী হওয়ার পর এটি ছিল প্রথম ঈদুল আযহা। সাথীরা বলল যে, জালিম হিন্দু সম্প্রদায় ঈদ ও অন্যান্য বিশেষ দিনে মুখমণ্ডলে ধর্ম

নিরপেক্ষতার সাময়িক প্রলেপ মাখায়। এভাবে তারা মুজাহিদদেরকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং এক, দুইদিনের জন্য নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদের ধারা বন্ধ রাখা হয়। ইণ্ডিয়ান আর্মির শিক্ষা বিভাগের প্রফেসরগণ মুজাহিদদেরকে জিহাদ পরিত্যাগ করার দাওয়াত দেয়। শান্তি, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের উপরও লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বন্দীদিগকে 'বড় খাবার' (উন্নত খাবার) দেওয়া হয়। বড় খাবারের অর্থ এই যে, খাবারের মান কিছুটা উন্নত হয়, যা অনায়াসে গলধঃকরণ করা যায়। এমনিভাবে মুজাহিদদের জন্য ঢোল, বাজনা, রেকর্ডার এবং মিউজিকের ব্যবস্থা করা হয়। (আলহামদুলিল্লাহ! বেশীর ভাগ মুজাহিদ তা নেহায়েত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং ঈদের দিন অতিক্রম করার পর তার ফলাফলও ভোগ করতে হয়।)

কারাসঙ্গীরা এসব তথ্য পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে অবহিত করে। এ সবের মধ্যে আমার শুধুমাত্র একটি বিষয় আনন্দ ও এতমিনানের ছিল। তা এই যে, সে সময় নিপীড়ন ও জিজ্ঞাসাবাদের ধারা বন্ধ থাকে। আমি একদিনের এই নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করি। আমি এব্যাপারে অগ্রিম আনন্দ বোধ করি যে, ঈদের দিন ভোরবেলায় এ আশংকায় কারো অন্তর বিচলিত হবে না যে, আজ অমুকের পালা। সেদিন আমাদেরকে আমাদের প্রিয় সাথীদের চিৎকার এবং সাথীদেরকে আমাদের আর্তনাদ শোনার কষ্ট করতে হবে না। এসব আলোচনা এবং অগ্রিম আনন্দের মাঝে ঈদের দিন আগমন করে।

অতি প্রত্যুষে ঢোল এবং অন্যান্য কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এনে দেওয়া হয়। প্রধান অফিসারের প্রত্যাশিত আগমন উপলক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। সকালের নাস্তা অন্যান্য দিনের মতই সাধারণ ছিল। অর্থাৎ চা নামের কালো রংয়ের গরম পানি এবং দুই টুকরা পুরাতন পাউরুটি। দশটা এগারটার দিকে অবগত হই যে, প্রধান অফিসার নিশ্চিত আসবে এবং এ উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে ক্ষির পাকানো হয়েছে, যাতে করে প্রধান অফিসার ভারত সরকারের উদারতার গীত গাইতে পারে এবং মিষ্টি ক্ষিরের দুই চামচের বদলায় অন্তরে বহমান বেদনা ও প্রতিশোধাগ্নি

নির্বাপিত করতে পারে।

ইতিমধ্যে একজন কাশ্মিরী মুজাহিদের পেট ব্যথা শুরু হয়। অধিক বেদনার কারণে সে চিৎকার করতে থাকে। টর্চারিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তাকে টর্চারিং সেন্টারে চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত কক্ষে নিয়ে যায়। সে সময় মেডিক্যাল কক্ষে আসামের এক কট্টর হিন্দু ডিউটিরত ছিল। সে কমপাউণ্ডারের কাজ করত। সে মুজাহিদটিকে ইনজেকশন দিল। কিন্তু তাতে কোন উপকার হলো না। ফলে মুজাহিদটি ব্যথায় পূর্ববৎ ছটফট করতে থাকে।

এ অবস্থা দেখে সেনা কম্পাউণ্ডারের পাশবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সে ক্রোধভরে বলে যে, সে তার সাথে ইয়ার্কি করছে। উপরন্তু কম্পাউণ্ডার নিজে ও তার সাথের কয়েকজন সৈন্য মিলে সেই অসুস্থ মুজাহিদের উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারাকক্ষে বন্দী মুজাহিদরা আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারে যে, এটি সেই অসুস্থ মুজাহিদের আর্তনাদ। তারা সেজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকে। কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, কারোবা চোখ থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু ঝরছিল। টর্চারিং সেন্টারের পরিবেশ কারাগারের মত ছিল না। তাই এখানে এর জন্য প্রতিবাদ করা বা প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তারপরও মুজাহিদরা সাহস করে পরিণতির পরোয়া না করে টর্চারিং সেন্টার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয় যে, আজ আমরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করব না। টর্চারিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ এ ধরনের উক্তি শুনতে অভ্যস্ত ছিল না। কারণ, বন্দীদের উপর তাদের সবধরনের অত্যাচার করার অবাধ অধিকার ছিল। তাছাড়া এসব বন্দীকে তখনো রেজিষ্টারভুক্ত করা হয়নি।

সুতরাং টর্চারিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ সকল বন্দীকে মারাত্মক পরিণতির ভয় দেখাতে থাকে এবং লাঠি ঘুরাতে থাকে। কিন্তু বন্দীরা দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়ে তাদের কথার উপর অবিচল থাকে। কিছুক্ষণ পর সেই অসুস্থ মুজাহিদকে কক্ষে নিয়ে আসা হয়। অধিক প্রহারের কারণে সে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না। ঠিক যে মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ নিজ নিজ সন্তানদেরকে নতুন কাপড় পরিয়ে ও ভুনা গোশত খাওয়ায়ে আনন্দ করছিল, সেই মুহূর্তে টর্চারিং সেন্টারের

মুজাহিদগণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে কম্বলের মধ্যে মাথা গুজে কাঁদছিল এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছিল। টর্চারিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে সেদিন অধিক নির্যাতন করতে পারছিল না। ফলে তারা বড় খাবার নিয়ে আসলেও খাবার খাওয়ার মত কারো পরিস্থিতি ছিল না। সকলেই খাবার ফিরিয়ে দেয়। ঈদের দিন মুজাহিদরা ক্ষুৎ পিপাসা ও দুঃখ–বেদনা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ করে করে এবং কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দেয়।

আমার মুসলমান ভাইয়েরা! এসব টর্চারিং সেন্টার ও তার অভ্যন্তরের ভয়ংকর ঈদের আনন্দ (?) আজও আমাদেরকে কিছু ভাবার এবং কিছু করার দাওয়াত দিচ্ছে, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের মুসলমান ভাইদের বেদনা অনুভব করুন। অন্যথায় এ বেদনা সমগ্র উম্মাহকে গ্রাস করে ছাড়বে। তাদের এ বেদনাকে উপলব্ধি করেই জাইশে মুহাম্মাদ বন্দী মুজাহিদদের মুক্তির জন্য পৃথক একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। আপনারা দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তাওফীক দান করেন এবং আমাদের জন্য বিশেষ উপকরণের ব্যবস্থা করেন। যেন আগামী ঈদ আসার পূর্বেই টর্চারিং সেন্টারের এ বেদনা, টর্চারিং সেন্টার নির্মাণকারীদের দিকেই ফিরে যায়।

কিছু কাজের কথা

বর্তমান যুগে জিহাদের প্রয়োজন ও উপকারিতা যদিও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী, কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব অদ্যাবধি চরম উদাসীন, গুরুত্বহীন ও রহস্যময়। অথচ ইসলামের শত্রু পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিশ্বের বাজারে নিলামে বিক্রি করার চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছে। কোটি কোটি মুসলমানের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জিহাদ প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছে। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় মুজাহিদকে খতম করার জন্য বড় বড় রাষ্ট্র বিরাট অংকের বাজেট করে রেখেছে।

যে কয়েকজন ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীতে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দান করছেন, তাদের প্রাণ চরম বিপদের মুখে। জমকালো প্রাসাদের

অভ্যন্তরীণ কক্ষে রাতের অন্ধকারে তাদেরকে নিলামে উঠানোর গোপন ব্যবসা চলছে। এই কয়েকজন মুজাহিদ নেতা—যাদের বদৌলতে পৃথিবীতে মুসলমানদের স্বকীয়তা টিকে রয়েছে—তারা বাতাসের মুখে রাখা প্রদীপের ন্যায় অনিশ্চয়তার জীবন যাপন করছেন। তাদের কারণে মুসলমানরা নিরাপদ, কিন্তু তাদের জীবন নিরাপদ নয়। তাদের সম্মুখে যদি শুধুমাত্র শাহাদতের মৃত্যুর ব্যাপার হত, তাহলে তারা নিজেরা পাগলপারা হয়ে তাকে আলিঙ্গন করত। কিন্তু তাদেরকে তো কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়ার এবং মুশরিকদের হাতে লাঞ্ছিত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যেন মুসলমানদের এই মহান সুপুত্রগণ কাফেরদের জুতার তলায় পিষ্ট হতে বাধ্য হয় এবং তাদের আর্তনাদ ও কান্না শুনিয়ে অন্য মুসলমানদের সাহস অবদমিত করা যায়। হায়! মুসলমান শাসক এবং মুসলমান জনসাধারণ যদি এ সকল মহান ব্যক্তিদের মূল্য এবং মুসলমানদের জন্য তাদের জীবিত থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারত! হায়! মুসলমান যদি একথার বিশ্বাস অর্জন করতে পারত যে, বাস্তবিকই জিহাদ একটি ফরয কাজ! যা আল্লাহ পাক তাদের দায়িত্বে আবশ্যকীয় করেছেন এবং তার মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে।

অনেকে বলে যে, আমরা তো জিহাদ করতে চাই, কিন্তু কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করেনি। আমরা তাদেরকে বলব ঃ আল্লাহ তাআলা কি কুরআন-মজীদের সোয়া চারশ'র অধিক জিহাদের আয়াতের মাধ্যমে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতাশটি গাযওয়া এবং তাঁর পবিত্র দেহ থেকে প্রবাহিত লহু আপনাদেরকে জিহাদের পথে খাড়া করানোর জন্য কি যথেষ্ট নয়? হযরত হামযা (রাযিঃ)র দেহ খণ্ড খণ্ড হওয়ার পর জিহাদের জন্য অধিক কোন ওয়ায বা যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে কি?

একটু ভেবে দেখুন, বুখারা ও সমরকন্দের লোকেরা জিহাদের ব্যাপারে উদাসীন হলে তার পরিণতি কি হয়েছিল। বর্তমানে কি সেখানকার মুসলমানদের বোন ও কন্যাদের দেহ নিলামে বিক্রি হচ্ছে না? অথচ কিছু

দিন পূর্বেও সেসব পরিবারেই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মত মহান সন্তানগণ জন্ম নিয়েছেন। অপরদিকে আফগানিস্তানের অধিবাসীরা জিহাদ করার ফলে তাদের বংশধরেরা তাদের জন্য দুআ করছে। আলহামদুলিল্লাহ! আজ সেখানকার জননী-জায়াদের সতীত্ব নিরাপদ। সেখানকার একেকটি গ্রামে সত্তরজনও হাফেজ রয়েছে। জানিনা আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কি রেখে যেতে চাই। মসীবত নাকি রহমত? ইজ্জত নাকি জিল্লত? বুখারা ও সমরকন্দের হৃদয়বিদারক দৃশ্য নাকি আফগানিস্তানের ঈমান উদ্দীপক পরিবেশ?

আমাদের মাঝে কিছুলোক এমনও রয়েছে—যারা এখনো পর্যন্ত জিহাদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ফরয এবং ইসলামী ইবাদত মনে করে না। ফলে তাদের জীবনের মুহূর্তগুলো জিহাদ থেকে মাহরূম রয়ে যাচ্ছে। জানিনা এ ব্যাপারে তাদের কি সংশয় রয়েছে। এমনিভাবে এমনো কিছু লোক রয়েছে—যাদের জিহাদের সঙ্গে শিথিল একটি সম্পর্ক রয়েছে। তারা কোন সংগঠনের সাথে এই উদ্দেশ্যে নামেমাত্র জড়িত, যেন অন্যান্য সংগঠনের লোকদেরকে জিহাদের সাথে জড়িত আছে বলে ফিরিয়ে দিতে পারে। অথচ তারা কখনো একটি টাকাও জিহাদে ব্যয় করেনি কিংবা এক মিনিটের জন্য কখনো জিহাদে বের হওয়ার এবং আল্লাহর জন্য জান দেওয়ার ইচ্ছাও করেনি।

জিহাদের সঙ্গে মুসলমানদের দায়িত্বহীন এই আচরণের কারণে একদিকে কাফিরদের সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের নাপাক হাত বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে নববীর মিম্বর ও মেহরাব পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। তারা মুসলমান মাতাদের পেট ফেড়ে ফেলছে এবং আমাদের বোনদের মস্তক—তাদের কোটি কোটি ভাই পৃথিবীতে জিন্দা থাকতে—কর্তন করা হচ্ছে। অপরদিকে জিহাদের সঙ্গে মুসলমানদের অবিচারমূলক আচরণের কারণে মুজাহিদদের উপর সীমাহীন চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদেরকে কাফেরদের সঙ্গেও লড়তে হয়। মজলুম কয়েদীদের মুক্তিরও চেষ্টা করতে হয় এবং জিহাদের ব্যয় বহন করার জন্য মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষেও করতে হয়। উপরন্তু তাদেরকে অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে সাইকেলে করে চামড়াও সংগ্রহ করতে হয়।

ইসলামের দুশমন শক্তি তাদেরকে খতম করে দেওয়ার জন্য পাগলা কুকুরের ন্যায় ঘুরে ফিরছে, যখন কিনা খোদ মুসলমানও দু'দিন পরপরই তাদের উপর অভিমান করে ক্রোধান্বিত হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষারও চিন্তা করতে হয় এবং একেকজন মুসলমানের মান ভাঙ্গানোর জন্য তাদের খেদমতেও হাজির হতে হয়। হায়! মুসলমান যদি পরিস্থিতির জটিলতা উপলব্ধি করতো, জিহাদের প্রয়োজনকে অনুধাবন করতো এবং নিজেদের মধ্যে কাজ বন্টন করে নিত, তাহলে আমরা অল্প দিনের মধ্যে আমাদের হারানো এলাকাসমূহকে দুশমনের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতাম। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের বন্দী ভাইদেরকে কাফেরদের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করতে পারতাম।

হায়! কিছু মুসলমান যদি নিজের দায়িত্বে অর্থ সংগ্রহের কাজ নিতো, কিছু মুসলমান শহীদ এবং বন্দীদের পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতো, কিছু মুসলমান রণাঙ্গনকে সামলাতো। কিছু মুসলমান প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিতো, কিছু মুসলমান মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য রসদের ব্যবস্থা করত, কিছু লোক জেহাদের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেদেরকে পেশ করতো, আমাদের মহিলারাও যদি সাহাবায়ে কেরামের যুগের মহিলাদের মত মুজাহিদদের খানা-পানির ব্যবস্থা করত এবং নিজেদের ঘরের মধ্যে জিহাদের দাওয়াতের প্রসার ঘটাত!

আমাদের শাসক ও ক্ষমতাসীন শ্রেণী যদি মুজাহিদদের জন্য এতটুকু সুবিধা দিত যে, তারা মুজাহিদদেরকে পথের প্রতিবন্ধক মনে করবে না এবং তাদেরকে আশংকাজনক মনে করবে না! এমনিভাবে উলামায়ে কেরাম যদি মুজাহিদদের সংশোধনের জন্য নিজেদেরকে পেশ করতো। তারা জিহাদকে শরীয়তের রূপরেখায় চালু রাখার জন্য তাদের ইলমী এবং রূহানী খেদমত পেশ করতো! মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমান জিহাদকে নিজের কাজ মনে করে যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মেহনত করত, তাহলে আমাদের জন্য অতি অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমানকে সংরক্ষণ করতে পারা

সুদূর পরাহত হত না। হায়! মুসলমান যদি সময়ের ডাক শুনতে পেত এবং তাদের প্রতি اِنْفِرُوْاخِفَافًاوَّ ثِقَالاً (ভারী অথবা হালকা সর্বাবস্থায় জিহাদে বের হও) কুরআনের এ আহবান বুঝে আসত।

জাইশে মুহাম্মাদের মকবুলিয়াত এবং ইসলামের দুশমনদের আস্থিরতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় যেসব বিষয় ভাবার এবং করার তার কিছু আমি পাঠকদের সমীপে তুলে ধরলাম। পাঠক! আল্লাহর ওয়াস্তে এসব বিষয়ে ভাবুন এবং আল্লাহকে খুশী করার জন্য অগ্রসর হোন।

বিরান না আবাদ

কয়েকদিন পূর্বে—যখন আমার নিকট বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি দলের আগমনের ধারা আরম্ভ হয়, তখন নূরপুর নামীয় অঞ্চল থেকেও একটি প্রতিনিধিদল আগমন করে। আগত সেই প্রতিনিধিদলে দীপ্তিময় চেহারার শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত একজন বর্ষিয়ান ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে কাঠের তৈরী দুটি তরবারী ধারণ করেছিলেন। আলোচনা এবং দুআর পর তিনি সেই তরবারী আমাকে হাদিয়া দেন। তরবারীটিতে একটি হাদীস এবং একটি আয়াত লেখা ছিল। তার মধ্যখানে লেখা ছিল, "জাইশে মুহাম্মাদ, হালকা শহীদ আবদুশ শুকুর, নওরঙ্গার পক্ষ থেকে হাদিয়া।"

আমাকে বলা হয় যে, এ বর্ষিয়ান ব্যক্তি শহীদ আবদুশ শুকুরের পিতা। একথা শুনতেই ভক্তি ও ভালবাসায় আমার দৃষ্টি অবনমিত হয়ে যায়। আমি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নিকট দুআর দরখাস্ত করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করি, যাঁর সন্তানকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ক্রয় করে নিয়েছেন এবং হুর ও ফেরেশতারা সম্মিলিতভাবে যাকে স্বাগত জানিয়েছে (ইনশাআল্লাহ)। প্রতিনিধিদল ফিরে যাওয়ার পর আমি জানতে পারি যে, এই বৃদ্ধের সন্তান ছিল দুটি। শহীদ আবদুশ শুকুর তাঁর বড় ছেলে। তিনি কাশ্মীর জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাত লাভ করেন। দ্বিতীয় ছেলে রাশেদও আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এখন তিনি শত্রুর হাতে বন্দী।

আমি আরও জানতে পারি যে, শহীদ আবদুশ শুকুরের শাহাদতের পর রাশেদ রণাঙ্গন থেকে বাড়ী ফিরে আসে। সে সময় তার হাতে 'যরবে মুমিনের' একটি রঙিন কপি ছিল। সে পত্রিকার মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত আমার একটি প্রবন্ধ 'নেকী মুশকিল, গুনাহ আছান' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পাঠ করে সে খুবই প্রভাবিত হয়। তার মাতা সন্তানের চেহারায় ভাসমান হৃদয়বেদনার লক্ষণ উপলব্ধি করে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে তার মাকেও উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনায়। সৌভাগ্যবান সন্তানের মা প্রবন্ধ দ্বারা শুধু প্রভাবান্বিতই হননি বরং অবিলম্বে তার উপর আমল করারও সংকল্প করেন। তিনি একদিনের মধ্যেই পুত্র রাশেদ এবং তার কন্যাকে সুন্নত মুতাবেক বিবাহ করান।

রাশেদ বিবাহের পর একমাস পর্যন্ত বাড়ীতে অবস্থান করে। তারপর ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে চলে যায়। সেখানের একটি যুদ্ধ চলাকালে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। মুজাহিদদের ধারণা ছিল যে, সে দুশমনের হাতে বন্দী হয়েছে। সে সময় আল্লাহ তাআলা আমাকে জম্মু কাশ্মীরের পরীক্ষাস্থল থেকে আযাদী দান করেন। তখন সেই দুই মহান মুজাহিদের সম্মানিতা মাতা আমার গৃহে তাশরীফ আনেন এবং উপরোক্ত বিবরণ শুনান। তিনি আমার সম্মানিতা মাতাকে আমার মুক্তির জন্য মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এক হাজার টাকা দিয়ে বলেন, 'এ টাকাগুলো মাওলানাকে দিবেন, তিনি যেন এ টাকা দ্বারা মুজাহিদদের জন্য এমন কোন জিনিস খরিদ করেন, যা দীর্ঘদিন জিহাদের কাজে ব্যবহার হবে।'

সুবহানাল্লাহ! সেই মা, যার এক সন্তান শহীদ আর অপরজন জিহাদের ময়দানে নিখোঁজ হয়েছে, তিনি এখনো জিহাদের কাজে শরীক থাকতে চান। শহীদ আবদুশ শুকুরের পরিবারের এ ঈমানদীপ্ত আলোচনা আমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি। আজ আমার কক্ষের দেওয়ালে লটকানো তার নামের স্মৃতিবহ তরবারীটি আমাকে তার পরিবারের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। মাত্র তিনদিন পূর্বে মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের নিকট আফগানিস্তানে বন্দী একজন মুজাহিদ কোন এক উপায়ে একটি চিঠি পাঠান। সে চিঠিতে এ সংবাদও ছিল যে, নূরপুরের মুজাহিদ রাশেদকে (শহীদ আবদুশ শুকুরের ভাই) বন্দী

করার পর শত্রুপক্ষ শহীদ করে ফেলেছে। এ সংবাদ শুনতেই আমাদের সকলকে এক অভাবনীয় ও অপার্থিব ভাব আচ্ছন্ন করে নেয়। কত বড় সৌভাগ্যবান ঐ মাতা-পিতা, যাদের মোট দু'জন সন্তান ছিল। আর দু'জনকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন।

আমি উক্ত সংবাদ দিয়ে কয়েকজন মুজাহিদ সাথীকে শহীদ আবদুশ শুকুরের বাড়ীতে পাঠাই। তারা কি সংবাদ নিয়ে আসে, তা জানার জন্য আমি পথ চেয়ে থাকি। মুজাহিদরা ফিরে এসে বললেন ঃ মাশাআল্লাহ রাশেদের মা-বাবা এমন সবর ও শোকর করেছেন, যা দেখে হযরাত সাহাবায়ে কেরামের যামানার কথা স্মরণ হয়ে যায়। এ কথা শুনে সে খান্দানের প্রতি আমার ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পায়। আমার হৃদয়ে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা ঢেউ খেতে থাকে। আমার মধ্যে এ অনুভূতি প্রবল হয় যে, এক হলাম আমরা, যে এত তালাশ করলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত শাহাদতের দেখা পেলাম না। আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও আরও কত জায়গায়ই না তার সন্ধান করেছি, কিন্তু আমরা এখনো তার যোগ্য প্রমাণিত হলাম না। আর অপরদিকে এই খোশ নসীব লোকেরা, আল্লাহর রহমত তাদের দিকে বৃষ্টির বিরামহীন বিন্দুর মত পতিত হচ্ছে।

আমি ভাবছিলাম যে, সেই ভাগ্যবান মাতা-পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করবো এবং আমার এ সাক্ষাত ইনশাআল্লাহ আমার মাগফেরাতের উসীলা হবে। শহীদ সন্তানদ্বয়ের মাতা-পিতার দ্বারা আমি আমার জন্য দুআ করাব। তাহলে ইনশাআল্লাহ জেহাদের পথের সকল প্রতিবন্ধকতা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। তাই পরিস্থিতি অনুকূল না থাকা সত্ত্বেও সংকল্প করে আমি নূরপুরের পথ ধরি। সেখানে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম শহীদদ্বয়ের সম্মানিত পিতার সাথে সাক্ষাত হয়। বিশ্বাস করুন, তাদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির আতিশয্যে আমার চোখ থেকে যে অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তা তার প্রশান্তময় মুচকি হাসি দেখে থেমে যায়। আমি সেখানে উপস্থিত মুজাহিদদের সঙ্গে অল্প সময় কথা বলে শহীদদ্বয়ের মায়ের সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ

করি। তারা জানালেন যে, তিনিও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

অল্পক্ষণ পর আমি সেই জীর্ণ গৃহে পৌছি। যেখান থেকে সংকল্প ও বিশ্বস্ততার খুশবু ভেসে আসছিল। আমি পর্দার আড়াল থেকে সালাম করে বলি ঃ আপনাদেরকে মোবারকবাদ। ভিতর থেকে প্রশান্তিভরা কণ্ঠে উত্তর এল ঃ 'খায়ের, মোবারক। আমি বড়ই আনন্দিত, আমি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ।' আমি বললাম ঃ মানুষ হয়ত বলবে, আপনার উভয় সন্তান শহীদ হওয়ায় আপনার ঘরটাই বিরান হয়ে গেছে। এমনটি মোটেও নয়, আপনার গৃহতো এখন চিরদিনের জন্য আবাদ হয়েছে। ভিতর থেকে উত্তর এল ঃ 'নিঃসন্দেহে আমিও উপলব্ধি করি যে, এখন আমার গৃহ যথার্থই আবাদ হয়েছে।'

আমি দুআর দরখাস্ত করলে তিনি বললেন, 'আমার সন্তান শহীদ হয়েছে, সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই, বরং আমি খুব আনন্দিত, তবে আমার দুঃখ এই যে, আপনি আমার ঘরে আগমন করলেন অথচ আমি আপনার কোন খেদমত করতে পারলাম না।' তারপর তিনি আমার জন্য এবং মুজাহিদদের জন্য দুআ করলেন। আমার মুহতারামা মাতার জন্য অসংখ্য সালাম পাঠালেন। তারপর আমি সম্মিলিত দুআ করে অন্যান্য শহীদদের বাড়ীতে যাই। আমি নূরপুর থেকে ফিরে আসি, কিন্তু আমার কর্ণকুহরে শহীদ আবদুশ শুকুরের মাতার এই কথাগুলো আজও মধু বর্ষণ করে থাকে যে, 'এখন তো আমার গৃহ যথার্থই আবাদ হয়েছে।'

নিঃসন্দেহে তার একথা অতীব সত্য। বাহ! কত চমৎকার হবে সেই দৃশ্য, যখন এ মায়ের এক হাত শহীদ আবদুশ শুকুর, আর অপর হাত শহীদ রাশেদের হাতে ধরা থাকবে। আর তিনি ইনশাআল্লাহ বিজয়ী বাদশাহর মত মুচকি হেসে জান্নাত অভিমুখে যেতে থাকবেন।

হায়! অন্যান্য মায়েরাও যদি এমনটি ভাবতেন! যেসব মায়ের যুবক ছেলেরা শুধুমাত্র দুনিয়া উপার্জনের মেশিন আর গুনাহর ফ্যাক্টরী হতে চলেছে। হায়! তারা যদি কল্পনা করতেন, কিভাবে আবদুশ শুকুর কাশ্মীরের তুষারাচ্ছাদিত প্রান্তর থেকে কিয়ামতের দিন হাসতে হাসতে উঠে আসবে। আর আম্মা আম্মা বলে মায়ের অন্তরকে কিয়ামতের ভয়ংকর দিনে আনন্দিত করবে। আর অপরদিকে শহীদ রাশেদ

আফগানিস্তানের পর্বতসারির মধ্য থেকে হাসতে হাসতে উদয় হবে এবং নিজের মাতাপিতাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের অংশীদার করবে।

যেসব মা এখনো ইসলামের জন্য কিছু করেননি, যারা এখনো মজলুম মুসলমানের জন্য কিছু করেননি, তারা একটু ভেবে দেখুন, আবদুশ শুকুর এবং রাশেদের মা–তো আল্লাহ তাআলার দরবারে একথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন যে, হে আল্লাহ! তুমি দুটি যুবক সন্তান দান করেছিলে, আমি তাদেরকে তোমার নামের আযমত (মহত্ত্ব) প্রতিষ্ঠার জন্য কুরবান করেছি। এক বৃদ্ধ স্বামী ছিলেন, তিনিও দিবস–রজনী জিহাদের কাজে লিপ্ত থাকতেন। যে সামান্য সম্পদ দান করেছিলে, তাও সর্বদা জেহাদের কাজে লাগানোর ফিকিরই আমার ছিল।

হে আবদুশ শুকুর ও রাশেদের মাতা–পিতা! নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগ আপনাদেরকে নিয়ে গর্ব করছে যে, সে এমন একজন মা এবং বাপকে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, যারা চৌদ্দশ' বছর পূর্বের পুণ্যময় যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন।

হে শহীদদের মাতা–পিতা! আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন। আজ ইসলাম ও মুসলমান আপনাদেরকে নিয়ে গর্ব করছে।

আপনাদের গৃহের এই মহান আবাদী আপনাদের জন্য কোটি কোটি বার মোবারক হোক।

মধুবর্ষী সেই শব্দমালা

মুজাহিদ সাথীদের সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল এবং জরুরী কাজ ছিল বলে গত সপ্তাহের 'মা'রেকা' লিখতে পারিনি। এরা সেই মুজাহিদ সাথী, যারা কাশ্মীর রণাঙ্গনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, আল্লাহ তাআলার রহস্যপূর্ণ এসব বান্দা নিঃসন্দেহে আল্লাহর অতি প্রিয়, অতি পছন্দনীয়। তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এমন প্রান্তরে অতিবাহিত হয়, যে প্রান্তরে যাওয়ার প্রত্যাশা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম করতেন। অধিকৃত কাশ্মীরে লড়াইরত এ সকল ঈমানদারদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমার প্রিয় ভাই সাজেদ জিহাদী। অন্যান্য জেলায় ভিন্ন ভিন্ন জেলা কমাণ্ডার

দায়িত্বরত আছেন।

পাকিস্তানে যে সময় জাইশে মুহাম্মাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় রণাঙ্গনের এ সকল সাথীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ ছিল না। কিভাবে আমাদের পয়গাম এ সকল মুজাহিদদের নিকট পৌছানো যায়, আমরা সর্বদাই সে ফিকিরে ছিলাম। সাথে সাথে আমাদের এ চেষ্টাও ছিল যে, রণাঙ্গনে লড়াইরত মুজাহিদদের মধ্যে যেন কোন প্রকারের বিশৃংখলা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়, তাই আমরা অনুকুল অবস্থার প্রতীক্ষায় নীরব ছিলাম। আমরা রণাঙ্গনে অল্প পরিসরে যোগাযোগ স্থাপন করা ও সীমিত আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকি।

এ সময় পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জাইশে মুহাম্মাদ প্রতিষ্ঠার সংবাদ কাশ্মীরের ভিতরে লড়াইরত মুজাহিদদের নিকট পৌছে যায়। তখন সর্বপ্রথম লাওলাবের কমাণ্ডার ভাই মুহাম্মাদ নাঈম (পাঞ্জাবের আটক নামক এলাকার অধিবাসী) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাইশের সাথে পরিপূর্ণরূপে শামিল হওয়ার ঘোষণা করেন এবং অন্যান্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।

তারপর কাশ্মীরের ভিতরের প্রায় সকল সাথী জাইশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ভিতরের সাথীদের ঘোষণার পরপরই শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মুফতী মুহাম্মাদ আসগর খানও জাইশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এমনিভাবে মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথ সুগম হয়ে যায়। যোগাযোগ চলাকালে মুজাহিদগণ যে আনন্দ ও পুলক প্রকাশ করেন, তা শ্রবণ করে আমার প্রথমবার উপলব্ধি হয় যে, সত্যিই আমি এখন কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছি। অথচ আমার দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা কাফের মুশরিকদের কারাগারে বন্দী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এ মুক্তিকে প্রকৃত মুক্তি মনে করবো না।

যাই হোক, সেই তিনটি রাত আমার জন্য বড়ই আনন্দের এবং ভাবময় ছিল, যখন আমি আল্লাহর পথে লড়াইরত মুজাহিদদের মুখ থেকে মধুবর্ষী শব্দ শুনে আনন্দিত হচ্ছিলাম। যখন মুজাহিদরা আমাকে মুক্তির জন্য মোবারকবাদ দেন, তারা সকলেই বলেন যে, আজকের রাত

আমাদের জন্য ঈদের রাতের মতই আনন্দের রাত। মুজাহিদ সাথীরা আমাদের আকাবির এবং উলামা হযরতের নিকটও দরখাস্ত করেন যে, তারা যেন মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলেন এবং উপদেশ দান করেন।

এ যোগাযোগ চলাকালে মুজাহিদগণ জিহাদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় রসদের অভাবের কথা জানান। যেগুলো পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে আমাদের দায়িত্ব। তারা জাইশের প্রতিষ্ঠায় সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নিঃশর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করেন। মুজাহিদ সাথীদের জন্য বিশেষভাবে বয়ান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারা সরাসরি আমার বয়ান শুনেছেন এবং আমল করার ওয়াদা করেছেন। বয়ানের পর তারা ব্যক্তিগতভাবে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য হুকুম করেন, আমি তাদের সে আদেশও পুরা করি।

লাওলাবের কমাণ্ডার ভাই মুহাম্মাদ নাঈমকে আমি বলি ঃ আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়, আমি তাকে কি বলব? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার সালাম বলবেন, আর আপনি অবশ্যই একবার আমাদের এলাকা সফর করবেন, যেন সেখানে জিহাদের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভাই মুহাম্মাদ নাঈমের মত অন্যান্য সাথীরাও এ ব্যাপারে জোরালো আবেদন করেন। একজন মুজাহিদ একথাও বলেন যে, আমার জীবদ্দশায় যদি আমাদের এলাকায় আপনার একটি সফর হত এবং তা আমি জানতে পারতাম! মুজাহিদ সাথীদের ভালবাসাপূর্ণ এসব কথা এখনো আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। আমি তিন রাতেই কয়েক ঘন্টা সময় মুজাহিদ সাথীদের সঙ্গে অতিবাহিত করি। একথা ভেবে আমি লজ্জিত হচ্ছিলাম যে, আল্লাহর এ সিংহরা আমার মত দুর্বল ব্যক্তির নিকট যে আশা পোষণ করে থাকেন, আল্লাহ না করুন তা যদি পুরা না হয়, তাহলে বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে।

এমনিভাবে এ সকল মুজাহিদ ভাইদের সাথে কথা বলে এ বিষয়ে আমার এতমিনান লাভ হয় যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমি অনতিবিলম্বে জাইশের কাজ আরম্ভ করে দিয়ে তাড়াহুড়া করিনি বরং সময়ের চাহিদা

এবং মুজাহিদদের মনের বাসনাকেই পূর্ণ করেছি। আল্লাহ না করুন, আমি মুক্তিলাভ করার পর যদি কয়েকমাস বাড়ীতে বসে থাকতাম, তাহলে নাজানি আল্লাহর সিংহদের অন্তরে কত কষ্ট হত। আমি আমার মালিকের শোকর আদায় করছি, কেননা তিনি আমাকে গাফলত এবং গুমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি আমাকে সময় নষ্ট করা থেকে এবং নেতা হয়ে ঘরে বসে থাকা হতে রক্ষা করেছেন। মুজাহিদ সাথীদের সাথে কথা বলে বীর মুজাহিদরা কি পরিমাণ বিশ্বাস এবং সংকল্প নিয়ে জাইশে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞান লাভ করি।

রণাঙ্গনে লড়াইরত আল্লাহর যে সকল সিংহ মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছেন এবং বদর ও হুনাইনের স্মৃতি পুনর্জীবিত করছেন, তাদের অনেক জিনিসের প্রয়োজন। আমি সংকল্প করেছি যে, ইনশাআল্লাহ! পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি তাদেরকে এসব জিনিস যোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমি একে নিজের সৌভাগ্য মনে করব। মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ ও কথোপকথনের মধুরতা এখনো আমরা হৃদয়ে বিরাজ করছিল, এমতাবস্থায় আজকে ইসলামাবাদের লাওলাবের কমাণ্ডার ভাই মুহাম্মাদ নাঈম (অটকের অধিবাসী) এবং কপওয়ারা জেলার কমাণ্ডার ভাই শাকের (মুলতানের অধিবাসী) ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে এক লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তারা তাদের কাঙ্খিত শাহাদাতের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। কয়েকদিন পূর্বে এ মুজাহিদদ্বয়ও সেইসব মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা জাইশের প্রতিষ্ঠায় সীমাহীন আনন্দিত ছিলেন এবং জাইশকে কাশ্মীরের আযাদী এবং ভারতের বরবাদীর কারণ মনে করছিলেন।

এ কমাণ্ডার দ্বয়ের শাহাদতবরণ একদিকে যেমন তাদের নিজেদের জন্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার, অপরদিকে জাইশের কর্মীরা তাদের এ দুই সাথীর বিচ্ছেদ–বেদনাও তীব্রভাবে অনুভব করছে। তাদের দু'জনের খুন আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। মানুষ যখন খুনের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, তখন মিশনের কথাও বিস্মৃত হয়ে যায়। আমাদেরকে তো তাদের খুনের প্রতিটি ফোটার বদলা নিতে হবে এবং

সর্বদা সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে, যাকে সামনে রেখে তাদের এ পবিত্র খুন প্রবাহিত হয়েছে।

আলোকময় প্রদীপ

কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় যে সব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি আমার হৃদয়–মনকে ক্ষতবিক্ষত করত, তার মধ্যে আমার প্রিয়, শ্রদ্ধেয় ও স্নেহপরায়ণ আকাবিরদের ভালবাসাও ছিল অন্যতম। আমি আল্লাহর দরবারে বারবার দুআ করতাম যে, 'হে আল্লাহ! আকাবিরদের জীবনে বরকত দান করুন। আমাকে ইলম ও আমলের এ সকল মহাসমুদ্র থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করুন।' কারাভ্যন্তরে কয়েকজন আকাবিরের ইন্তেকালের সংবাদে চরমভাবে ব্যথিত হই। তাঁদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন, যাঁদের থেকে উপকৃত হওয়ার আকাংখা আমার অন্তরকে অস্থির করে ফেলত। পাঠক! আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি কোন ঝর্ণা থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার আশা নিয়ে বসে থাকে, আর সে খবর পায় যে, এখন আর সে সরাসরি ঐ ঝর্ণা থেকে পরিতৃপ্ত হতে পারবে না, তাহলে তার অন্তরে কেমন আঘাত লাগবে?

কারাগারের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমার রব দয়া করে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আকাবিরদের নিকট থেকে ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য উপকৃত হওয়া ছিল আমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের শীর্ষ তালিকায়। করাচীতে কয়েকদিন অবস্থান কালে আলহামদুলিল্লাহ! এ নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে লাভ করি। আল্লাহ তাআলা আকাবিরদের যিয়ারতের মাধ্যমে আমার চক্ষুকে শীতল করেন। করাচীর পর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আকাবিরের যিয়ারত ও মুলাকাতের সৌভাগ্যও লাভ হয়। যিয়ারত ও মুলাকাতের এ ধারা চলা অবস্থায়ই আমার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং আমাকে গৃহবন্দী করা হয়। আর আমার কিছু আপনজন তীর তরবারী নিয়ে আমার বিরুদ্ধে মাঠে অবতরণ করে। এমতাবস্থায় আকাবির হযরাতদের থেকে আমার উপকৃত হওয়ার ধারাও কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে কোন কোন আকাবির নেহায়েত

স্নেহ পরবশ হয়ে সাময়িক নিষেধাজ্ঞায় গৃহবন্দী থাকাবস্থায় ভাওয়ালপুর সফর করেন এবং আমাকে হৃদয়ভরে তাঁদের যিয়ারতের সুযোগদান করেন। তাঁদের আগমনে আমি একদিকে যেমন অন্তহীন আনন্দিত হয়েছি, অপরদিকে তেমনি চরম লজ্জিতও হয়েছি। কারণ, এঁরা এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁরা কুরআন মাজিদের তাফসীর এবং বুখারী শরীফের পাঠদান করে থাকেন এবং দিবস রজনী খালিকের সঙ্গে মাখলূকের সম্পর্ক স্থাপনের কাজে রত থাকেন। জানিনা এখানে সফর করার কারণে তাঁদের সে মোবারক কাজের কত না ক্ষতি হয়েছে। কত তালিবে ইলম এবং জনসাধারণ এ সময় তাঁদের ইলম ও আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে মাহরূম হয়েছে। এখন আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে বাধানিষেধ কিছুটা শিথিল হওয়ায় আকাবিরদের খেদমতে হাজির হওয়ার এবং তাঁদের ফয়েয ও বরকত দ্বারা ঈমান দীপ্ত করার সুযোগ নসীব হচ্ছে। এ মহান নেয়ামতের জন্য আমি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছি।

শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস, ওয়াসিল বিল্লাহ হযরত আকদাস জনাব মাওলানা শরীফুল্লাহ্ সাহেব (দাঃ বাঃ)এর সম্মানিত নাম এবং তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী আলেমদের নিকট পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। আমি বেলুচিস্তানের লাসবিলা এলাকায় এক জলসায় প্রায় আট বছর পূর্বে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সে সময় থেকে আমার সংকল্প ছিল যে, আমি হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর ইলম ও রূহানিয়াতের ঝর্ণা থেকে ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই উপকৃত হব। কিন্তু তার সুযোগ হয়ে উঠেনি। বন্দীকালীন সময়ে 'যরবে মুমীন' পত্রিকা মারফত জানতে পারি যে, হযরত আফগানিস্তান সফর করেছেন। হযরত আমিরুল মুমিনীন তদীয় প্রণীত 'তাফসীরে বদী' নিজের কাছে রাখেন এবং তা থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। এ সংবাদ পাঠ করে তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।

আমার মুক্তিলাভের পর হযরত আকদাসের ইলমী স্থলাভিষিক্ত এবং জিহাদের জযবায় উদ্দীপ্ত তরুণ সাহেবজাদা হযরত মাওলানা খলিলুল্লাহ সাহেব (মুঃ যিঃ) ভাওয়ালপুর তাশরীফ আনেন। তার সঙ্গে মুলাকাত হলে আমি হযরত আকদাসের সঙ্গে মুলাকাতের আকাংখা প্রকাশ করি

এবং হযরতের নিকট দুআর দরখাস্ত করি। এ মুলাকাতের কিছুদিন পরে হযরত মাওলানা খলিলুল্লাহ ছাহেব দ্বিতীয় বার তাশরীফ আনেন। এ সময় তার নিকট হযরতের প্রণীত গ্রন্থাবলী এবং কিছু ঔষধও ছিল। জানতে পারি যে, হযরত নিজেই অনুগ্রহ করে এগুলো দিয়েছেন। এর পর হযরতের সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলার সৌভাগ্য হয়। তবে গতকাল অর্থাৎ ১৩ই মুহাররম ১৪২১ হিজরীর দিনটি ছিল আমার জন্য বড়ই আনন্দের। আমি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করার এবং তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার নিয়্যতে জামেয়া তাফসীরিয়া শামসুল উলূম রহীম ইয়ার খান সফর করি। সেখানে হযরত এ অধমের উপর জাহেরী এবং বাতেনী অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া এবং আখেরাতে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। অধমের আবেদনে হযরত বুখারী শরীফের প্রথম বাবের (অধ্যায়ের) পাঠদান করেন এবং তার স্বল্পতম পরম্পরার সনদ লিখিতভাবে দান করেন। এ সনদে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মোট ষোলটি মাধ্যম রয়েছে। কিছু যিকিরের তালকীন করে একটি তাসবীহ দান করেন এবং ইলমী ও রূহানী উপদেশ দানে ভূষিত করেন। হযরত একথাও বলেন যে, আমরা জাইশে মুহাম্মাদের সাথে আছি এবং আমাদের দুআও জাইশের ঐক্য স্থাপনের মোবারক প্রচেষ্টার সাথে রয়েছে। ঐক্যের সাথে ভালবাসা ও হৃদ্যতা প্রকাশ করে তিনি এরশাদ করেন যে, আমার বাসনা ; আমি জিহাদের ময়দানে যাব, সেখানে আমার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, পাখি সেই টুকরোগুলো ভক্ষণ করবে। আর কিয়ামতের দিন পাখির উদর থেকে আমি উত্থিত হব।

হযরতের ইলমী এবং জিহাদী যওকের পূর্ণ লক্ষণ তাঁর মাদরাসার উস্তাদ, ছাত্র এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তাঁর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মহিলা মাদরাসার ছাত্রীরা এবং তাঁর পরিবারের মেয়েরা ইতিপূর্বেও কয়েকবার নিজেদের গহনা ও অর্থসম্পদ জিহাদের কাজে ব্যয় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। গতকাল আমি যখন সেখানে যাই, তখন তারা পুনরায় জিহাদের জন্য আর্থিক কুরবানী পেশ করেন। কিছু শিক্ষা অর্জন করা এবং কিছু লাভ করার নিয়তে এ সফর

করা হয়েছিল। এ সফরের শিক্ষা ও প্রাপ্তির বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে যে বিষয়গুলো সকল মুসলমানের জন্য উপকারী, তা সংক্ষেপে হলেও আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে। সেগুলো এই—

(ক) আমাদের আকাবিরগণ এক মহান নেয়ামত, তাঁরা যেখানেই বসেছেন, সেখানেই ইলম, রূহানিয়াত ও জিহাদের প্রদীপ্ত প্রদীপ হয়ে অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও জুলুমের অন্ধকারকে বিলুপ্ত করেছেন। সর্বশ্রেণীর মুসলমানের উচিত আকাবিরদেরকে মূল্যায়ন করা। তাঁদের থেকে উপকৃত হওয়া। এ কাজে কোন প্রকারের গাফলতী ও অলসতা না করা।

(খ) জিহাদের ব্যাপারে আমাদের আকাবিরদের উৎসাহব্যঞ্জক অবস্থান সকল মুসলমানের জন্য জিহাদের বিষয়টি বুঝতে পরিপূর্ণ মদদ যোগাচ্ছে। তাই আমাদের বিশ্বাস এই যে, এঁরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করেও পরিপূর্ণভাবে জিহাদে শরীক আছেন। তাঁদের দ্বীনী ও ঈমানী মেহনতের তাবৎ ফলাফল জিহাদ ও মুজাহিদগণ লাভ করছে।

(গ) রণাঙ্গনে লড়াইরত মুজাহিদ এবং আল্লাহর ওলীগণের জাইশে মুহাম্মাদের উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি নেয়ামত। জাইশে মুহাম্মাদের মুজাহিদগণ এ নেয়ামতের জন্য আল্লাহ তাআলার যতই শোকর আদায় করুক না কেন, তা কমই বটে। নিঃসন্দেহে মহান ও মকবুল এ দুই শ্রেণীর সমর্থন হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ সৃষ্টিকারী নেয়ামত।

মাত্র তিনদিন পূর্বে ইসলামের খাতিরে শাহাদাত বরণকারী শহীদ আখতার শাকেরের বাড়ী যাহেরপীর নামক স্থানে যাওয়া হয়। ফেরার পথে ইমামুল মানকুল ওয়াল মা'কুল, যাহেদুল আছর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মঞ্জুর নোমানী মুদ্দাজিল্লুহুর খেদমতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। হযরতও অধমের প্রতি অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করেন। তিনি জাইশে মুহাম্মাদের জন্য বিশেষভাবে দুআ করেন। এ অধমকেও দুআ ও তাওয়াজ্জুহ দানে ভূষিত করেন।

এমনিভাবে এক সপ্তাহ পূর্বে সোয়াত জেলার বশামের, কুহেস্তান, সাংগলা এবং বটগ্রাম জেলার আকাবির এবং ওলামা হযরতদের খেদমতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। তখন শাইখুত তাফসীর হযরত

মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ সাহেব (দাঃ বাঃ) সহ সকল আকাবির জাইশের সঙ্গে নিজেদের আন্তরিক সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেন এবং বিশেষভাবে দুআ করেন। আল্লাহ আকাবিরদের নিকট থেকে ইস্তেফাদার এ ধারা যেন অব্যাহত রাখেন। আকাবিরদের দুআ ও বিশেষ তাওয়াজ্জু শামিলে হাল হয়।

প্রিয় এ উপঢৌকন

কয়েকদিন পূর্বে আমার নিকট কারাবন্ধুদের ভালবাসাপূর্ণ পত্র আসে। সুধী পাঠক! আমার সেই সাথীদের পত্র, যাদের সঙ্গে আমি মর্মন্তুদ পরীক্ষার মুহূর্তসমূহ অতিবাহিত করেছি। তারা আমাকে সুখ-শান্তি দিতে কিছুমাত্র কম করেনি। আমি আহত হলে তারা আমার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিত, আমার আঘাতপ্রাপ্ত হাত-পা মালিশ করে দিত। ছয় বছর সময়ে তারা আমাকে কখনো খাবার রান্না করতে দেয়নি, অথচ এজন্য আমি অনেক পীড়াপীড়ি করতাম। মুশরিক কারাকর্তৃপক্ষ যখনই আমাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছে, তারা ঢাল হয়ে আমার চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি অসুস্থ হলে—আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা সারারাত জেগে আমার সেবা করেছে। আমি কোর্টে গেলে এবং ফিরতে বিলম্ব হলে তারা অস্থির হয়ে ছাদ ও প্রাচীরে আরোহণ করে প্রতীক্ষা করত।

কারাকর্তৃপক্ষের সম্মুখে তারা আমাকে এমন সম্মান করত যে, মুশরিক কারাকর্তৃপক্ষ হিংসার আগুনে জ্বলে ভস্ম হত। চাপাস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করত। সেই আল্লাহওয়ালা ভাইদের কত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করব! তাদের কত দয়ার উল্লেখ করব। আমার জীবনের রাতদিন এবং সকল মানবীয় দুর্বলতা তাদের সম্মুখে ছিল। তবুও প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতি তাদের ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন বৃদ্ধি পেত। এমনকি আমার মুক্তিলাভের পর তাদের কেউ কেউ বিচ্ছেদ বেদনায় কয়েকদিন পর্যন্ত কেঁদে কাটায়। অনেকে অজ্ঞান ও অচেতন হতে থাকে। বস্তুত আমার মত অযোগ্য ও দুর্বলের সঙ্গে তাদের এ ভালবাসা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে ছিল। যা কারারূপী অগ্নিকক্ষে আমার জন্য শান্তি ও শীতলতার কারণ ছিল।

এখন আমার সম্মুখে সেই সাথীদের ভালবাসার আবেগপূর্ণ তাজা

চিঠি রয়েছে। তারা অন্য কথার সঙ্গে জাইশের নামও লিখে দিয়েছে। তারা কারাগারের ভিতরে 'যরবে মুমিন' পত্রিকা পাঠানোর জন্য জোর দাবী জানিয়েছে। তারা পূর্বেও এ পত্রিকার জন্য অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করত। গোপন কোন পথে তাদের নিকট যরবে মুমিনের কপি পৌঁছলে তারা বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে এর প্রতিটি লাইন এবং প্রতিটি শব্দ পাঠ করত। পত্রিকাটি তাদের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য বিরাট অবদান রাখত। পত্রিকাটি তাদের নিরাশাকে আশায় পরিণত করে। এই পত্রিকার বদৌলতে তাদের কারো কারো লেখালেখির উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। এমন কিছু সাথী —যারা খুব কষ্টে চিঠি লিখতে পারত—যরবে মুমিনের বরকতে তারা রুচিবান লেখকে পরিণত হয়েছে। অতীতে আমি তাদের কারো কারো লেখা গোপনে আমার লেখার সঙ্গে যরবে মুমিনের জন্য পাঠিয়ে দেই। আলহামদুলিল্লাহ! সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে। যার ফলে সত্যপথের বন্দীদের সাহস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যরবে মুমিন সেই মজলুম বন্দীদেরকে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আলোকময় মিনার দেখিয়েছে। সে মিনার দেখে তারা কারাগারে থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত মনে করছে। এ পত্রিকাই তাদেরকে মক্কা, মদীনার চতুর্পার্শ্বে ইহুদী ও নাসারা সৈন্যদের ঠিকানা বলে দিয়েছে। যা পাঠ করে সেই বন্দীদের আবেগ অগ্নি উদগীরণ করতে থাকে। এ পত্রিকার মাধ্যমে তারা নিজেদের চিন্তা চেতনার প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মত প্রবন্ধসমূহ, সুন্দর ঘটনাবলী এবং জরুরী মাসআলাসমূহ অবহিত হয়েছে। এ পত্রিকায় প্রকাশিত আফগানিস্তানের চিত্র বন্দীরা মুখস্ত করেছে। এভাবে তারা দূরে থেকেও ইমারাতে ইসলামিয়ার নিকটে রয়েছে। এ পত্রিকাই সত্যপথের বন্দীদেরকে কসোভো এবং চেচনিয়ার প্রকৃত অবস্থা এবং ন্যাটোর বোমা বর্ষণের প্রকৃত লক্ষ্য অবহিত করেছে। তারপর যখন এ মজলুম কয়েদীদের উপর ভয়ানক নির্যাতন চালানো হয় এবং তাদের প্রিয় নেতা হযরত সাজ্জাদ আফগানীকে শহীদ করা হয়, তখন যরবে মুমিনই তাদের ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়েছে এবং তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি সঞ্চার করেছে যে, তারা নিঃসঙ্গ নয়। তাদেরকে এ আওয়াজ এবং এ আহবান শুনিয়েছে যে, তারা যেন নিজেদেরকে লাওয়ারিশ মনে

না করে। আমি কোনরূপ অতিরঞ্জন ছাড়া বলতে চাই যে, যরবে মুমিনের মূল্য জানতে চাইলে সেসব মুসলমান বন্দীদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। কারণ, তারাই যরবে মুমিনের স্বরূপ অবগত আছে। এ কথাও বাস্তব যে, যদি সে বন্দীরা জানতে পারে যে, কতিপয় বিশেষ (?) শ্রেণীর লোক যরবে মুমিনের বিরোধিতা করে ও তার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র করে পত্রিকা এবং তার পরিচালকদেরকে খতম করে দেওয়ার জালিমসুলভ সংকল্প রাখে, তাহলে আল্লাহর পথের এ বন্দীগণ আর্তনাদ করে করে বলবে যে, আল্লাহকে ভয় কর, এ জুলুম বন্ধ কর। যরবে মুমিনের দিকে বাঁকা চোখে তাকিও না, তোমরা কি মজলুম বন্দীদের থেকে তাদের এ অবলম্বনটুকুও ছিনিয়ে নিতে চাও?

জুলুম উৎপীড়নের শিকার মহান আল্লাহওয়ালাদের যরবে মুমিনের সঙ্গে এ হৃদ্যতা ও ভালবাসা পাকিস্তানের আযাদ লোকদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা দান করে। আমি আশা করব যে, পাকিস্তানের মুসলমনেরা এই পত্রিকার মূল্য আরও অধিক অনুধাবন করবে এবং মজলুম মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করার কাজে অংশগ্রহণ করবে। কোনপ্রকার নেতিবাচক প্রপাগাণ্ডাকে তারা অন্তরে স্থান দিবে না। আমি আশা করব যে, এ প্রবন্ধের পাঠক প্রত্যেক মুসলমান জিহাদের দাওয়াতের প্রসার ঘটানো এবং মজলুমদের আর্তনাদকে আনন্দে রূপান্তর করার জন্য যরবে মুমিনের বেশী করে প্রসার ঘটাবে। সুধী পাঠক! নিজেই চিন্তা করে দেখুন, আপনাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাই ও প্রত্যেক বোন যদি এ পত্রিকার একজন করে খরিদদার তৈরী করেন, তাহলে জিহাদের জযবা এবং প্রিয় এ উপঢৌকন—যা পূর্ব থেকেই লাখ লাখ মুসলমানের নিকট পৌঁছে থাকে—মাত্র এক সপ্তাহে এর প্রচার সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে।

কাশ্মীর জিহাদের উপর আরোপিত সন্দেহ, সংশয় ও তার অপনোদন

কাশ্মীর জিহাদের পরিণতি ও ফলাফল কি হবে? এ আন্দোলন তো এক সময় মুজাহিদদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না? কার্গিলের জালিমসুলভ চুক্তি সম্মানিত শহীদদের কুরবানীকে তো নিস্ফল করবে

না? এসব প্রশ্নের প্রতিধ্বনি প্রায়ই আমাদের কানে আসতে থাকে। অপরদিকে অনেককে এ বিষয়ে চিন্তিত দেখা যায় যে, জিহাদ সফল হওয়ার পর কাশ্মীরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কি? এতে সন্দেহ নেই যে, এ সব বিষয় এবং প্রশ্নাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব প্রশ্নের জালে আবদ্ধ হয়ে জিহাদের ময়দান থেকে দূরে বসে থাকা জায়েয নেই। আফগানিস্তানের জিহাদ চলাকালেও এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী এবং কন্টকময় সংশয়সমূহ শোনা যেত। কিন্তু অব্যাহত জিহাদ হাতে কলমে এসব সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছে এবং সকল প্রশ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

কয়েকদিন পূর্বে কাশ্মীর সফরকালে এক ব্যক্তি আমার নিকট এসব প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর চেয়ে বসে। আমি তাকে বলি যে, জিহাদ চলতে থাকাই বড় সফলতা ও প্রাপ্তি। জিহাদের দ্বারা ইসলামের শিরায় শিরায় খুন প্রবাহিত হতে থাকে। মুসলমানরা জীবন্ত হয়ে ওঠে। জিহাদ নিজেই ঈমানী জযবার সংরক্ষক। জিহাদের প্রভাব ও ফলাফল এমন চমৎকারভাবে প্রকাশ পায় যে, বিশ্ববাসীর বিবেক বিমূঢ় হয়ে যায়। আমাদের জন্য তো এতটুকু প্রাপ্তিই যথেষ্ট যে, জিহাদ অব্যাহত রয়েছে। তবে সংশয় সন্দেহ আর প্রশ্নের ব্যাপারেও গাফেল থাকা চাই না। কিন্তু সঠিক এবং প্রকৃত পন্থা এই যে, জিহাদকে নীরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রেখে সংশয় ও বিপদকে দূর করার চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে বড় বড় বিপদ এবং ভয়ংকর সংশয় নিজে নিজেই বিদূরীত হবে।

আফগানিস্তানের জিহাদের ব্যাপারেও এ আশংকা ছিল যে, পবিত্র এ সংগ্রামের চূড়ান্ত ফলাফলকে দুশমন হাইজ্যাক করে না নেয়। আফগানের পবিত্র ভূমি বিভক্ত হওয়ারও আশংকা ছিল। জিহাদের আবরণ পরিহিত মুনাফিকরা মসনদে আরোহণ করার এবং শহীদদের খুনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার মুসলমানদের মুখে আঘাত করার আশংকা ছিল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! মুজাহিদগণ জিহাদ অব্যাহত রেখেছেন এবং অন্যান্য দিকেও গভীর দৃষ্টি রেখেছেন। পরিশেষে সকল সংশয় এবং আশংকা মাঠে মারা গিয়েছে। সম্মানিত শহীদদের শক্তিশালী খুনের বরকত বিজয়ী হয়েছে। ঈমানদারদের হৃদয় শীতল হয়েছে। কিন্তু সন্দেহ,

সংশয়, আশংকা ও বিপদের গীত গেয়ে যদি জিহাদকেই থামিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রথমে বিপদ দূর করে পরে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান করা হয়, তাহলে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। তখন আমলের ময়দান ঠাণ্ডা আর বিতর্কের ময়দান থাকবে গরম। তার দ্বারা কেউই লাভবান হবে না। বরং উম্মত জিহাদের বরকত ও তার ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবে।

বদরের যুদ্ধের পূর্বে কি মুসলমানদের যাবতীয় শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল না? উহুদ যুদ্ধের সময় কি দারুল ইসলাম মদীনা মুনাওওয়ারা মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়ার এবং মুসলমানরা তাদের কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ছিল না? হুদায়বিয়ার সন্ধি কি শংকা ও কল্পিত বিপদ থেকে মুক্ত ছিল? বস্তুত জিহাদ এক বিরল বিস্ময়কর আমল, যার বাহ্যিক দিকে ধ্বংস, ক্ষতি এবং হারানো ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। জিহাদের উপকারিতা মৌখিক প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পায় না। কারণ, এটি একটি ফরয আমল। জিহাদের অব্যাহত আমল দ্বারাই তার ফলাফল ও উপকারিতা সামনে আসতে থাকে।

জিহাদ চালু থাকাই বিরাট এক নিয়ামত। যেমন নামায এবং যিকির নিয়মিত করতে থাকা বিরাট নেয়ামত, সৌভাগ্য ও সফলতা। কোন কোন মুরীদ তার শায়েখের কাছে যখন লেখে যে, আমি নিয়মিত যিকির করছি কিন্তু উপকার পাচ্ছি না এবং বিশেষ কোন স্বাদ উপলব্ধি করছি না। তখন মাশায়েখগণ উত্তরে লেখেন যে, যিকির চালু থাকাই বিরাট ফায়দা, শুধু স্বাদ উপভোগের জন্য যিকির করা হয় না।

জিহাদের অন্যান্য আন্দোলনের মত কাশ্মীরের জিহাদ সম্বন্ধেও আমরা এ কথাই বলি যে, কাশ্মীরের জিহাদ চালু রাখা হোক, বরং পূর্বের চেয়ে অধিক শক্তি দিয়ে এ পবিত্র আমল আদায় করা হোক। তবে বিপদ ও আশংকা দূর করার জন্য সামগ্রিক কৌশল অবলম্বন করা হোক। জিহাদের বাস্তব ভিত্তিক কৌশলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে সময় সময় নিজেদের কর্মকৌশলে কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করে দুশমনের অধিকতর ক্ষতি এবং মুজাহিদদের অধিকহারে লাভের পথ করা হোক। এ পবিত্র আন্দোলনকে দুশমনের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছানোর বাস্তব কৌশল

অবলম্বন করা হোক। তাহলে এ আন্দোলনকে কেউ বিক্রি করতে পারবে না এবং শহীদদের খুনকে আলোচনার টেবিলে বিক্রি করার মত অপরাধ করার দুঃসাহস আর কারো হবে না। কিন্তু আমরা যদি বিপদাপদের ভয়ে জিহাদকে বন্ধ করে দেই, কিংবা সাময়িকভাবে বিশ্রামের জন্য বিরতি দেই, তাহলে অতীতের সাথে ভবিষ্যতের সম্পর্ক গড়ার জন্য আমাদেরকে পুনরায় অসংখ্য কুরবানী দিতে হবে এবং এ পবিত্র আন্দোলন অনেক পিছিয়ে যাবে।

আজকাল একথাও শোনা যাচ্ছে যে, কোন কোন সম্মানিত মুজাহিদ কাশ্মীরের জিহাদ সম্পর্কে কিংবা তার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন। একথা সঠিক হলে তা অতীব দুঃখের ব্যাপার হবে। কারণ, মূর্তিপূজারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই রক্ত রাঙ্গা আন্দোলনের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা কোন মুজাহিদ তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমানেরও শোভা পায় না। যরবে মুমিনের মধ্যে কাশ্মীরের জিহাদ সম্পর্কে এমন অনেক ফতোয়া এবং প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, যার আলোকে কাশ্মীর জিহাদের গুরুত্ব এবং তার স্বরূপ সম্পর্কে জানা যেতে পারে। সত্য কথা হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতকে ভয় করে এবং কুরআনের মাধ্যমে জিহাদের জ্ঞান লাভ করেছে, সে আফগানিস্তানের জিহাদেরও বিরোধিতা করতে পারে না। তার দৃষ্টিতে চেচনিয়া বা ফিলিস্তীন কোন জিহাদই গুরুত্বহীন হতে পারে না। বরং তার একমাত্র সংকল্প হবে, সে জিহাদের প্রত্যেক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক জায়গার লড়াইরত মুজাহিদদেরকে ভালবাসবে এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

শহীদদের খুনের শক্তি

কাবুল থেকে কান্দাহার যাওয়ার পথে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জঙ্গী বিমানে বসে যরবে মুমিনের সুধী পাঠকদেরকে সম্বোধন করে আজকের এ প্রবন্ধ লিখছি। কয়েকজন মুজাহিদ সাথী আমার জন্য বিমানের মেঝেতে (ফ্লোরে) লেপ বিছিয়ে দিয়েছেন। আমি

আসন থেকে নেমে এখন সেই লেপের উপর বন্ধুদের মাঝে উপবিষ্ট। আমার ডানদিকের আসনে মুরশিদুল উলামা হযরত আকদাস মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (দাঃ বাঃ) গভীর মনোযোগ সহকারে যিকিরে রত আছেন। বিমানে আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ইলমী ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব আরোহী রয়েছেন। বিমানের আওয়াজ মুসাফিরদেরকে নীরব নিস্তব্ধ করে রেখেছে। কেউ কথা বলতে চাইলে বিমানের শব্দের কারণে দেহের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে হয়। ইমারাতে ইসলামিয়ার সেনাপ্রধান মোল্লা ফযল মুহাম্মাদ আখওয়ান্দ আকাবির ও উলামা হযরতের জন্য এই বিমানের ব্যবস্থা করেছেন। ঘটনাটি নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। তবে আফগানিস্তানে আকাবির ও উলামাদের এভাবে সম্মান প্রদর্শন করা এক সাধারণ অভ্যাস।

সমগ্র বিশ্ব গলা ফাটিয়ে যে আলেমদেরকে সন্ত্রাসী প্রমাণিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, সমগ্র আফগানিস্তান সেই আলেমদের সম্মানার্থে নয়নমন বিছিয়ে দিয়েছে। সারাদেশের সরকারী সংস্থা উলামায়ে কেরামের সম্মানের জন্য সরগরম হয়ে ওঠে। যে দেশে বিশ্বের শক্তিশালী ইসলামের দুশমনরা প্রবেশাধিকার পায় না, যে দেশে আসার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আটদিন পর্যন্ত কাঠখড়ি পোড়াতে হয়, যে দেশ কাফেরদের জন্য পাথরের মত শক্ত প্রমাণিত হয়েছে, সেই দেশ দ্বীনের খাদেম আলেমদের জন্য কত কোমল, কত মসৃণ!

হযরত আমীরুল মুমিনীন (দাঃ বাঃ)—যার সঙ্গে কথা বলার জন্য দুনিয়ার শক্তিশালী মিডিয়া হা-পিত্যেস করছে—তিনদিন পূর্বে উলামায়ে কেরামের এ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দীর্ঘ আধাঘন্টা সময় মন খুলে কথা বলেন। যে দেশের উপর মারাত্মক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সে দেশ উলামায়ে কেরামের এ কাফেলা কাবুল থেকে কান্দাহার গমন এবং কান্দাহার থেকে কাবুল প্রত্যাবর্তনের জন্য বিশেষ বিমানের বন্দোবস্ত করেছে। যে দেশের জনগণকে মুসলমান হওয়ার অপরাধে ক্ষুৎপিপাসায় হত্যা করার চেষ্টা চলছে, সেখানকার দেশ প্রধানরা উলামায়ে কেরামের সম্মানে সবধরনের খাবারের এমন দস্তরখান সাজিয়েছে যে, তা দেখলে ক্লিনটন এর বদহজম হয়ে যাবে। যে দেশের

স্বাধীনচেতা মানুষ বিশ্বের বড় বড় নমরুদ ও ফেরাউনদেরকে ঘাস–পানি দেয় না, সে দেশের প্রেসিডেন্ট, সেনাপ্রধান এবং মন্ত্রীবর্গ আলেমদের হস্তচুম্বন করতে এবং তাঁদের জুতা সোজা করতে দেখা যায়। কিন্তু এসব কিছু কেন হচ্ছে?

বর্তমান বিশ্বে কি এমনটি হয়ে থাকে যে, দেশের পাঁচটি প্রদেশের গভর্নর মিলে ফকিরসুলভ উলামায়ে কেরামকে স্বাগত জানানোর জন্য পথ চেয়ে থাকবে? দেশের বিমান বাহিনীর প্রধান তাঁদেরকে বিমানে বসানোর জন্য নিজে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে? বিশ্ববাসী উত্তর দাও! এসব কেন হচ্ছে? এখনো কি জিহাদের মর্যাদা ও তার ফলাফল বুঝে আসে না? নিঃসন্দেহে এ সবকিছু জিহাদ এবং একমাত্র শরয়ী জিহাদের বরকত। বর্তমানে আফগানিস্তানের দরজা কাফেরদের জন্য বন্ধ, আর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত। এটি জিহাদেরই বরকত যে, আফগানিস্তানের সীমান্ত এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, যার কল্পনাও কেউ করেনি। নিঃসন্দেহে এটি জিহাদের বরকত যে, আফগান ভূমি মুসলমানদের জন্য মাতৃক্রোড়সম শান্তিময় ও নিরাপদ। বরং এ সবকিছুই জিহাদের বরকত যে, আজ আফগানিস্তানে তাগুতী শক্তির নয়, বরং চাটাইয়ে উপবেশনকারী শুভ্রপরিধেয় পরিহিত উলামায়ে কেরামের সম্মান রয়েছে। এটি জিহাদের বরকত যে, সে দেশে এক সহস্রাধিক দ্বীনী মাদরাসা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মরত রয়েছে এবং বিশ্ববাসীকে পয়গাম দিচ্ছে যে, সেখানে মাদরাসা বিস্তার লাভ করছে, মাদরাসা শক্তিশালী হচ্ছে। পক্ষান্তরে সেখানে কুফর সংকুচিত হচ্ছে। মিটে যাচ্ছে।

বর্তমানে আফগানিস্তানের আনাচে কানাচে জিহাদের ফলাফল দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানকার বাজার আনন্দিত যে, সেখান থেকে আর গানের শব্দ ভেসে আসে না। দোকান আনন্দিত যে, তাতে মূর্তি বিক্রি হয় না। অলিগলি আনন্দিত যে, সেখানে অশ্লীল ও নির্লজ্জ দৃশ্য বিরাজ করে না। সুবহানাল্লাহ! শহীদদের খুনের শক্তি দেখুন। সমগ্র আফগানিস্তানে বেপর্দা কোন নারী কিংবা দাড়ি কামানো কোন স্থানীয় ব্যক্তি চোখে পড়ে না। সেখানকার ভূমি আনন্দিত যে, তা যিকির ও কুরআনের নূরে আলোকিত এবং শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নে উদ্ভাসিত। মসজিদসমূহ

তার নির্মাণ ও সমৃদ্ধিতে গর্ব করছে। মক্তব থেকে উত্থিত কুরআনের আওয়াজ কুফরের প্রাসাদকে প্রকম্পিত করছে। হায়! মুসলমানরা যদি এসব দেখত এবং দাসত্বের চশমা ছুড়ে ফেলে আলোকময় ও আত্মমর্যাদায় সমৃদ্ধ এসব দৃশ্য অবলোকন করত! তাহলে ইনশাআল্লাহ জিহাদের মর্ম বুঝে আসত। আর জিহাদের মর্ম বুঝে আসলে আমাদের জীবন চালনার পদ্ধতিও আয়ত্বে এসে যেত।

সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত

পূর্বের কলামে যে যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আলোচনা করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে আপনারা হয়ত সংবাদ শুনেছেন যে, তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। আফগানিস্তানের পুরা সফরে তাঁর উপর যে অপার্থিব ভাব আচ্ছন্ন ছিল, তা এ কথারই ইঙ্গিত বহন করছিল যে, তিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মোলাকাতের কাজে মগ্ন রয়েছেন। তিনি সারাটি জীবন যে দ্বীনের খেদমত করেছেন, সেই দ্বীনকে তিনি আফগানিস্তানে স্বচক্ষে কার্যকর দেখেন। সেই সত্য ও পবিত্র মতাদর্শ, যার হেফাজতের জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। সেখানে তিনি সে মতাদর্শের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করেন। নিশ্চয়ই এসব কিছু তাঁর জন্য সীমাহীন আনন্দদায়ক এবং অপরিসীম প্রশান্তির ব্যাপার ছিল। যে কৃষক প্রচণ্ড রোদের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে হালচাষ করেছে, বীজ বপন করেছে, রাতের ঘুম কুরবান করে জমিতে পানি সিঞ্চন করেছে, পাকা শস্য কাটতে দেখাই হয় তার সর্বোচ্চ বাসনা।

হযরত আকদাস মাওলানা শহীদ মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহঃ) বাল্যকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত এবং যৌবনকাল থেকে শাহাদত পর্যন্ত চাটাইয়ে উপবেশন করে দ্বীনের পাঠদান করেছেন। তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আলেমদের মাঝে তার প্রসার ঘটিয়েছেন। সর্বসাধারণের সম্মুখে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। সীমাহীন কষ্ট ও সাধনা করে দ্বীনের হেফাজতের মেহনত করেছেন এবং সিরাতে মুস্তাকিমের হেফাজতের জন্য পাহারা দিয়েছেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের হেফাযতের জন্য রাতদিন একাকার করেছেন। ইসলামী

মতাদর্শকে ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বিদ'আত থেকে বাঁচানোর জন্য রক্তকে পানি করেছেন। তিনি একদিকে শিক্ষার মসনদকে সম্মানিত করেছেন। অপরদিকে গ্রন্থ প্রণয়নের আসনের মর্যাদাও সর্বদা রক্ষা করেছেন। তার মুখ থেকে ইলম ও মারিফতের ভাণ্ডার প্রবাহিত হয়েছে। তার কলমের মধ্যে তরঙ্গের গতি ও নক্ষত্রের উচ্চতা স্থান পেয়েছে। তিনি মারিফাতের ঝর্ণাধারা থেকে অসংখ্য পানপাত্র বিতরণ করেছেন। আজীবন তৃষ্ণার্তদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন। তিনি সুন্নাতকে সংরক্ষণ করার দৃঢ়সংকল্প করে প্রথমে নিজে সুন্নাতের উপর অবিচল থেকেছেন। তারপর অনেক বিপথগামীকে সে পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘসময় কিতাবের সমুদ্রে ডুব দিয়ে যখন সেখান থেকে বের হয়ে আসতেন, তখন তাঁর আঁচল আলোকিত মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ থাকত। তারপর তাঁর কলম সেই মণিমুক্তাকে অতি সুন্দর আঙ্গিকে এক সুতায় গেঁথে দিত।

হযরতে আকদাস বিশ্বস্ততার পথে শাহাদত বরণ করতে অবিচল ছিলেন। তাঁকে হযরত বিন নূরী (রহঃ) যে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি সে কাজেই অটল থাকেন। হৃদয় বিদীর্ণকারী পরীক্ষা এবং মন ভোলানো প্রলোভন তাঁকে সে আসন থেকে হটাতে পারেনি। তাঁর লেখা ছিল মনোমুগ্ধকর। তাঁর প্রমাণ ছিল ওজস্বী। তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন তার হক আদায় করতে কম করেননি। ফলে ইলমে নবুয়তের খেদমত, খতমে নবুয়তের সংরক্ষণের ন্যায় সৌভাগ্য এবং শাহাদতের মত মহান নেয়ামত তিনি লাভ করেন। সম্ভবত এগুলো তাঁর এখলাসের পুরস্কার। তাঁর এত বড় সৌভাগ্য যে, তিনি হযরত মাওলানা আল্লামা খায়ের মুহাম্মাদ জালেনধারী (রহঃ)এর শিষ্যত্ব ও বিশেষ স্নেহ, হযরত মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন নূরী (রহঃ)এর তত্ত্বাবধান ও তরবিয়ত, হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহঃ)এর খেলাফত এবং হযরত আকদাস ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল হাই সাহেব (রহঃ)এর সুদৃষ্টি লাভে ধন্য হন। তিনি এ সমস্ত আকাবির থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফয়েয লাভ করেন। তিনি ছিলেন আকাবিরদের পাগলপারা আশেক। যখনই তিনি তাঁর আকাবিরদের আলোচনা আরম্ভ

করতেন, তখন তাঁর কথার মধ্যে তাঁদের ভালবাসার ফল্গুধারা ঝরে পড়ত এবং তাঁর দৃষ্টিতে বিশেষ একধরনের আলো প্রদীপ্ত হত। তাঁর আরো সৌভাগ্য লাভ হয়েছে যে, তিনি জামিআ বিন নূরী টাউনের হাদীসের উস্তাদ, মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়তের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, 'মাসিক বাইয়েনাতের' সম্পাদক, দৈনিক জঙ্গ পত্রিকার ইসলামী পাতায় প্রকাশিত 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' নামে প্রশ্নোত্তর ধারার প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক এবং মুজাহিদদের আমলী সংগঠন জাইশে মুহাম্মাদ এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তিনি প্রত্যেক ময়দানে খুব সাবধানে পা ফেলতেন, কিন্তু দেখতে দেখতে সেই ময়দানের শীর্ষে আরোহন করতেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের সংকল্প করেন। বায়াত আলাল জিহাদের পথকে পুনর্জীবিত করেন এবং অনতিবিলম্বে আফগানিস্তান তাশরীফ নিয়ে আমলী জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তারপর জিহাদের সুউচ্চ মকাম অর্থাৎ শাহাদাত লাভ করেন।

তদীয় প্রণীত গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য ইলমী ও দ্বীনী খেদমতসমূহকে গভীরভাবে দেখা হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝে আসে যে, তিনি দ্বীনের খেদমতে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেছেন এবং তার হক আদায় করেছেন। তবেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে আখেরাতের নেয়ামতরাজির পূর্বে ইহজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্থাৎ শাহাদত দান করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি এমন এক মহান নেয়ামত, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর খাস বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। একবার এক সাহাবী দুআ করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সেই মহান নেয়ামতটি দান করুন, যা আপনি আপনার নেক বান্দাদের দান করে থাকেন। দুআ শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—'তাহলে তো তোমার ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হবে এবং তোমার খুন প্রবাহিত করা হবে।' সুবহানাল্লাহ! হযরতের সাথেও এমনি আচরণ করা হয়। তাঁর বাহনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তাঁর গ্রীবা ও বক্ষের খুন দ্বারা তাঁর সারাদেহ রঞ্জিত হয়ে যায়। এই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতটিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর এ মহান বান্দার জন্য মনোনীত করেন।

হযরতে আকদাস এক অনুকরণীয় ঈমানী জীবন অতিবাহিত করে হাসতে হাসতে শহীদ হয়ে যান। আর এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক বিশেষ জীবন, স্বীয় আতিথ্য, ফেরেশতাদের অভ্যর্থনা এবং মহাসৌভাগ্য দান করেন এবং সেই বেচাকেনা পাকাপোক্ত হয়ে যায়, যা আল্লাহ পাক তাঁর খাস বান্দাদের সাথে করে থাকেন এবং স্বীয় সন্তুষ্টি ও জান্নাতের বিনিময়ে তাঁদের জান ক্রয় করেন।

হযরতে আকদাস তো সুউচ্চ সোপান লাভ করেছেন, কিন্তু সে সরকারের কি হবে, যে এমন মহান ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তার ব্যাপারে গাফেল থাকে? সে জালিমদের কি হবে, যারা হযরতের উপর গুলি চালিয়ে নিজেদের হতভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপর শেষ মোহর অংকিত করেছে? হযরতের খুন নিস্ফল যাবে না এবং ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহও এত বড় খুনকে হজম করতে পারবে না। ইসলামের দুশমনশক্তিসমূহ এ ঘটনায় আজ আনন্দিত, কিন্তু তাদের এ আনন্দ ইনশাআল্লাহ ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হবে এবং এ খুনের প্রতিটি ফোটা মৃত্যুর রূপ পরিগ্রহ করে কুফরের প্রাসাদের উপর আপতিত হবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে যে, এ মহান কুরবানী মুসলমানদের মধ্যে নতুন আবেগ এবং ঈমানী উচ্ছাস সৃষ্টি করবে এবং কাফেরদেরকে প্রতি মুহূর্তে একথা স্মরণ করিয়ে দিবে যে, শহীদ অমর হয়ে থাকে, আর শহীদী জীবন কুফরের মৃত্যুর পয়গাম বয়ে আনে।

হযরতে আকদাসের শাহাদাত জাইশে মুহাম্মাদের জন্য বিরাট বড় এক ধাক্কা। কিন্তু জিহাদ সর্বাবস্থায় চালু থাকবে এবং জিহাদের কাজে এমন ধরনের বেদনাদায়ক ঘটনা সহ্য করতেই হয়। আজ আমাদের হৃদয় আহত। আমরা আহত হৃদয় নিয়ে একথার অঙ্গীকার করছি যে, ইনশাআল্লাহ আমরা জিহাদের এ কন্টকাকীর্ণ পথে চলে হয় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের গন্তব্যে উপনীত হব, অথবা হযরতের ন্যায় শাহাদতের উদ্যান পর্যন্ত পৌছার সাধনা করে যাব। হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে সবর দান কর। আমাদেরকে জিহাদের জীবন এবং শাহাদতের মৃত্যু থেকে মাহরূম কর না।

কিভাবে করব তীরের মুকাবেলা

আজ ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে

সর্বপ্রধান লক্ষ্য বানিয়েছে। তারা জিহাদের নাম এবং মুজাহিদদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিতে চায়। তারা এ লক্ষ্যে সফলতা লাভের জন্য অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে। তারা নিত্য নতুন কর্মকৌশলের মাধ্যমে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কয়েক দিন পূর্বে ইসলামী দেশ আফগানিস্তানের সচেতন সংস্থাসমূহ আমেরিকা ও ইসরাইলের পক্ষে কর্মরত কয়েকজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে। পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকায় গুপ্তচরদের ছবি এবং তাদের কাজের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকার পর এখন রাশিয়াও আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ করার ভয় দেখাচ্ছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনও ইসলামের দুশমনদের চোখে খুব বিঁধছে। চেচনিয়ার বীর মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামের দুশমন দেশসমূহ পরস্পরকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করছে। ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিষে ফেলার জন্য উঁচু পর্যায়ের সামরিক ও কূটনৈতিক চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টার কর্মপরিধি সমগ্র আরব দেশসমূহে বিস্তৃত করা হয়েছে, যেন আরব মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখার এবং তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখার কাজ শক্তভাবে অব্যাহত থাকে। সমগ্র বিশ্বে জিহাদ ভিত্তিক বক্তৃতা এবং জিহাদ বিষয়ে লেখালেখির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক রাখাকেও অপরাধ সাব্যস্ত করা হচ্ছে। এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার ভয়ে মুসলমানরা নিজেরাই জিহাদকে ভয় করতে এবং সন্ত্রস্ত হতে আরম্ভ করছে। এমনকি তারা মুজাহিদদেরকে স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার বিপদ মনে করছে।

বাহ্যদৃষ্টিতে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সর্বত্র এক দৃঢ়সংকল্প ও শক্তিশালী আন্দোলন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। জিহাদ বিরোধীরা মারাত্মক ভীতি, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত। তাদের সবধরনের চেষ্টা হীতে বিপরীত হচ্ছে। বাহ্যত তাদেরকে দৃঢ়সংকল্প দেখা গেলেও বাস্তবে তাদের চেতনা হারানোর মত অবস্থা বিরাজ করছে। তাদের পা কাঁপছে। তারা পরিপূর্ণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী দেশ আফগানিস্তান পূর্বাধিক শক্তিশালী হচ্ছে। কাশ্মীর স্বাধীন

করার ইসলামী আন্দোলনেও নতুন শক্তি ও নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হতে দেখা যাচ্ছে। চেচেন মুজাহিদদের আক্রমণও তীব্রতর হচ্ছে এবং ফিলিস্তীনে বায়তুল মুকাদ্দাসের মুজাহিদদের সাহসও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমতাবস্থায় জিহাদ ও মুজাহিদদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার এবং কাফেরদের প্রোপাগাণ্ডা ও ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত না হওয়া অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। রণাঙ্গনে সাহস বিরাট একটি অস্ত্র। ইসলামের দুশমনরা প্রথম থেকেই এ পন্থা অবলম্বন করেছে যে, তারা নানাধরনের মিথ্যা কথা ছড়িয়ে মুসলমানদের সাহসকে দুর্বল এবং মনকে হীনবল করে দিতে চায়। আজ থেকে সাড়ে ছয় বছর পূর্বে আমি যখন বন্দী হই, তখন প্রথম কয়েক মাস কাফেররা আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে হীন মনোবল করে দেওয়ার জন্য অব্যাহতভাবে চেষ্টা করেছে। সুতরাং আমাদেরকে অন্ধকার সেলে বন্দী রাখা হয়। সংবাদ শোনা এবং পত্রিকা পড়া থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। কাফেরদের বিশেষ সংস্থার লোকেরা রাতদিন আমাদের নিকট যাতায়াত করত এবং আমাদেরকে এমন এমন মিথ্যা সংবাদ শুনাত যেগুলো শুনে মনে হত যে, পৃথিবী থেকে জিহাদ ও মুজাহিদগণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সর্বত্র কুফরী শক্তি ছেয়ে গেছে। আমাদেরকে বলা হত যে, কাশ্মীর আন্দোলনের কোমর ভেঙ্গে গেছে। মুজাহিদরা আত্মকলহে লিপ্ত। বড় বড় প্রখ্যাত কমাণ্ডার অস্ত্র সমর্পণ করে স্বেচ্ছাবন্দী হচ্ছে। পাকিস্তানের অবস্থা সীমাহীন খারাপ। ইসলামাবাদের অধিবাসীরা পান করার মত পানি পর্যন্ত পাচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষ স্বভাবতই এমন পরিস্থিতির কথা শুনে নিরাশ হয়ে যায়। সর্বত্র পরাজয়ের দৃশ্য দেখে নিরাপত্তার জায়গা খুঁজতে থাকে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের নিকট পবিত্র কুঁরআন ছিল, যা কাফেরদের প্রত্যেক কথার উত্তর দিত এবং আমাদেরকে বুঝাত যে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। সর্বাবস্থায় আমাদের কাজ চালু রাখতে হবে। বদরের পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক বা উহুদের, হুনাইনের অবস্থা দেখা দিক বা হুদাইবিয়ার, লক্ষ কোটি মানুষ সঙ্গ দিক কিংবা নিঃসঙ্গ হই। কুরআন আমাদেরকে বলত যে, হত্যা করার মত নিহত হওয়াও সফলতা।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত নিশ্চিহ্ন হওয়াও ইসলামের আযমতের মাধ্যম। সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মনোবল অটুট থাকে। এখন মুক্তিলাভের পর যে সব অবস্থা সম্মুখে আসছে, তাও কারাগারের অবস্থা থেকে ভিন্নতর নয়। বি.বি.সি ওয়ালারা আমাদেরকে শুধু নৈরাশ্যজনক সংবাদ শুনিয়ে থাকে। ঠিক একই অবস্থা অন্যান্য সংবাদ সংস্থারও। বিশ্বের কাফেররা মিডিয়া জগতকে কব্জা করে রেখেছে। তারা মুসলমানদের মধ্যে হতাশা বিস্তার করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

এমতাবস্থায় আমাদেরকে পবিত্র কুরআন থেকে ছবক নিতে হবে। বর্তমানে হযরত আকদাস মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহঃ)কে শহীদ করার কারণ হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে যে, শেষ বয়সে তাঁর মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি মুজাহিদদেরকে খোলামেলাভাবে সমর্থন করে আফগানিস্তানও সফর করেছিলেন। তাই বলে এর দ্বারা আমাদের এ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করলে চলবে না যে, আমরা মৃত্যুর ভয়ে মুজাহিদ ও জিহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দুর্বল করব এবং কাফেরদের নিকট বলে বেড়াব যে, আমাদেরকে মের না, জিহাদ এবং মুজাহিদদের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। বরং আমাদেরকে এ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে যে, হযরত আকদাস বিফল হননি। তিনি তো সফলতার সর্বোচ্চ সোপান শাহাদাত লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাহাদাতের মত মহান নেয়ামত দান করেছেন। যদি জিহাদের মাধ্যমে এ নেয়ামত লাভ করা যায়, তাহলে আমরাও জিহাদের পাগল ও আসক্ত হব ; যেন আল্লাহর দুশমনদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয় এবং আমরাও ইসলামের দুশমন বলয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রতিদান ও সুযোগ লাভ করতে পারি। হযরত তো মহাসাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর খুন আমাদেরকে জিহাদের জন্য উঠে দাঁড়ানোর দাওয়াত দিচ্ছে। জিহাদ থেকে পালানোর নয়। তাই আমরা জিহাদের সঙ্গে পূর্বাধিক নিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক গড়ব। কাফেররা যেভাবে জিহাদকে তাদের সর্ববৃহৎ লক্ষ্য বানিয়েছে, তার বিপক্ষে আমরাও জিহাদকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সফলতা লাভের সর্বোচ্চ মাধ্যম মনে করব।

মনে রাখবেন! কাফের সৈন্য মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে

তখন জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। বর্তমানে কাফেররা জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের সেনাবাহিনী খাড়া করে দিয়েছে। এখন আমাদের কাজ জিহাদ থেকে পালানো নয়, বরং আমাদেরও জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতিরক্ষার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করতে হবে। কাফেররা জিহাদকে মিটাতে চাইলে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে জিহাদকে রক্ষা করব এবং কাফেরদেরকে এ ময়দানেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এ পয়গাম শোনাব যে, ইসলামে জিহাদ ফরয। আমরা কারো ভয় করে তা আদায় করা থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়াব না।

পরিশেষে যে সব মুসলমান কাফেরদের আক্রমণের ভয়ে জিহাদ ও মুজাহিদদের থেকে দূরে অবস্থান করছে, তাদেরকে বলব, হে মুসলমান ভাইয়েরা! কুফর ও ইসলামের লড়াই শুরু হয়েছে। এখন বাহ্যত শুধু মুজাহিদগণ কাফেরদের লক্ষ্য হলেও মূলত তারা ইসলাম ও সমস্ত মুসলমানকে ধ্বংস করতে চায়। মুজাহিদরা তাদের পথের সবচেয়ে বড় বাধা বলে তারা প্রথমে মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করতে চায়। তারপর তারা অন্যান্য মুসলমানকে মেরে সাফ করবে। কারণ, তারা অবগত আছে যে, মুসলমান মাতাগণই মুজাহিদ সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। তাই এ বীজকে খতম করার আগ পর্যন্ত তাদের সংকল্প পুরা হবে না।

হে মুসলমান ভাইয়েরা! আমাদেরকে কাফেরদের তীরের মোকাবিলা করতেই হবে। হয় বুক পেতে, না হয় পিঠ পেতে। তবে মনে রাখবেন! যে সব মুসলমান বুক পেতে দিয়ে কাফেরদের তীরের মোকাবেলা করে, তারা আল্লাহরও প্রিয় হয় এবং তাদের বংশধরগণও টিকে থাকে। কিন্তু যে মুসলমান নিজের পিঠে তীর খায়, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং ইসলামকেও লাঞ্ছিত করে। যে সব মুসলমান তাতারীদের মোকাবিলায় নিজেদের সিনা পেতে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ হয়েছেন আর কিছু ঈমান নিয়ে নিরাপদে ছিলেন। কিন্তু যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছিল এবং নিজেদেরকে শান্তিপ্রিয় দেখিয়ে তাতারীদের নিকট জীবন ভিক্ষা করেছিল, তাদের পরিণতি এই হয় যে, একেকজন তাতারী শত শত ব্যক্তিকে বকরীর মত জবাই করে। শান্তিপ্রিয়তার পোশাক তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। আফগান জাতি বুক পেতে দিয়ে

রাশিয়ার তীরের মোকাবিলা করেছে, তাদের পুরো জাতি এবং তাদের ঈমান রক্ষা পেয়েছে বরং আরো সুদৃঢ় হয়েছে। কিন্তু মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের অনেক লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং নিজেকে শান্তিপ্রিয় প্রমাণ করার জন্য জিহাদকে দূরে নিক্ষেপ করেছে, তারা নিজেদের এবং নিজেদের বংশধরদের ঈমান রক্ষা করতে পারেনি। আজ তাদের কন্যা-জায়াদেরকে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে।

হে মুসলমান ভাইয়েরা! মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, লাঞ্ছনার মউত হোক কিংবা ইজ্জতের, যথাসময়ে তা আসবেই। তাহলে কি কারণে আমরা জিহাদ এবং মুজাহিদদের থেকে দূরে থেকে কাফেরদের নিকট জীবন ভিক্ষা চাব। আমাদের তো কাফেরদের প্রস্তুতি দেখে সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমানের শিখরে আরোহণ করে ঘোষণা করা উচিত—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرِ

(আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের সবকিছু।)

আমরা যদি আমাদের জীবন, আমাদের মসজিদ এবং আমাদের দ্বীনী কাজসমূহ রক্ষা করার জন্য জিহাদের ফরয থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, কিছুই রক্ষা পাবে না। আজ মুসলমানদের সেই ছাগলপালের মত অবস্থা, যার মধ্যকার কিছু শক্তিশালী ও চৌকস ছাগলের কারণে বাঘ সেই ছাগলপালের উপর আক্রমণ করতে পারে না। তখন বাঘ শৃগালের মাধ্যমে ছাগল পালকে সেই শক্তিশালী ও চৌকস ছাগলদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করায় এবং তাদেরকে বুঝায় যে, এসব ছাগলের কারণে তোমাদের যত আপদ। তোমরা নিজেদেরকে তাদের থেকে পৃথক করে নিলে এ মাঠ এবং মাঠের ঘাস সবই তোমাদের একার থাকবে। শৃগালের কথা শুনে যদি ছাগলপাল নির্বোধের আচরণ করে এবং শক্তিশালী ছাগলসমূহকে নিজেদের থেকে পৃথক করে দেয়, তাহলে ছাগলপালের কি পরিণতি হবে তা সকলেরই জানা। আজকের মুসলমানদেরও বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল সমস্যার কারণ এ কয়েকজন মুজাহিদ। তোমরা জিহাদ ও মুজাহিদদের নিকট থেকে মুক্তিলাভ করলে সমগ্র বিশ্বে তোমাদের

উন্নতির সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

হায়! মুসলমান যদি এ ষড়যন্ত্র বুঝত এবং অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ইহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের কীর্তি দেখত যে, তারা স্পেনসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছে।

মুসলমানদের পবিত্র কুরআন থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা দরকার। পবিত্র কুরআনকে বিশ্বাস করে তার আলোকে ইহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের প্রকৃত চেহারা ও তাদের ঘৃণার্হ সংকল্প চেনা ও জানা প্রয়োজন। সুধী পাঠক! ভেবে দেখুন, কত বড় দুঃখের কথা যে, বর্তমান যুগের অনেক মুসলমান ইউরোপ ও আমেরিকার মিথ্যা কথাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শাশ্বত মূলনীতিকে বিশ্বাস করে না। কুরআন মাজিদ আমাদেরকে বলছে যে, আমরা মুসলমান থাকা পর্যন্ত এই ইহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা আমাদের বন্ধু হতে পারে না এবং তারা আমাদের উপর খুশী থাকতে পারে না। এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তাহলে জিহাদকে গোপন করে এবং মুজাহিদদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়ে কি লাভ হবে? কাফেররা সাময়িকভাবে তাদের নিশ্চিন্ততা দেখালেও তাদের অন্তর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবেই।

পরিশেষে পুনরায় নিবেদন করছি যে, হে মুসলমান ভাইয়েরা! সাহস, নির্ভীকতা ও আত্মমর্যাদাকে কাজে লাগাও। কাফের প্রত্যেক মুসলমানেরই শত্রু। তাই শহীদ আফাকের মত সিনা দিয়ে তাদের মোকাবিলা কর, পিঠ দিয়ে নয় এবং এই ঈমানদীপ্ত ঘোষণা দাও যে—

دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے

اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت

অর্থ ঃ "শত্রুকে বলে দাও, চাইলে তাদের তূনীর পুনরায় পূর্ণ করে আনুক। তাদের অসংখ্য তীর থাকলে আমাদেরও সহস্র বক্ষ রয়েছে।"

উদারমনা হোন

মানুষ সাধারণত সংকীর্ণ হৃদয় ও সংকীর্ণ দৃষ্টির হয়ে থাকে, এমনকি দুআ করতেও মানুষ সংকীর্ণতা দেখায়। প্রভুর শক্তিকে ভুলে যায়। মানুষ নেক কাজ করতেও সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দেয়। অথচ নেক কাজ

করতে অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কিছু খোয়াতেও হয় না। দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ। তাঁর কাছে তো কোন কিছুর কমতি নেই। মানুষ মনে করে, আমার মূল্যবান সময়ে অন্যের জন্য দুআ করব? অন্যের জন্য দুআ করলে আমার সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে? অথচ আল্লাহর দরবারে অন্য রকম নিয়ম। সেখানে সব বিষয়ে 'ঈছার' তথা অন্যকে প্রাধান্য দেওয়াকে মূল্যায়ন করা হয়। নিজের জন্য চাইলে তা পাক বা না পাক, অন্যের জন্য চাইলে সাধারণত নিজেরা পেয়েই থাকে। কারণ, যারা অন্যের জন্য চায় তাদের জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতারা দুআ করে থাকেন। তবে অন্যের জন্য দুআ করা উচ্চ সাহসীদের কাজ, ঈমানওয়ালাদের তরীকা। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে সেই সাহস আর বিশ্বাস দান করুন। আমীন।

দুআ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেক কাজ। যে ব্যক্তি যত বেশী নেক কাজ করার সাহস ও সংকল্প রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে সে পরিমাণই তাওফীক এবং উপকরণ দান করবেন। মায়ের পেট থেকে কেউ কিছু নিয়ে আসে না। পৃথিবীতে সবাই খালি হাতে আসে, আবার খালি হাতেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। তবে যে ব্যক্তি সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করে এবং কল্যাণের পথ তালাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার হাত পরিপূর্ণ করে দেন। তার হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন, তার দ্বারা আল্লাহ তাআলা এমন নেক কাজ করিয়ে নেন যে, জান্নাতের দরজাসমূহও তার আগমনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) এবং হযরত ওসমান গনী (রাযিঃ)এর নিকট কোন খান্দানী ভাণ্ডার ছিল না। কিন্তু তারা হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং প্রত্যেক নেক কাজে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য সংকল্প করেন। তারপর কি হল? তাঁদের জন্য আসমান জমিনের দরজা খুলে গেল। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করার মহাসৌভাগ্য লাভ করেন। সাথে সাথে জিহাদ, ইয়াতিম ও বিধবাদের ভরণপোষণ, অনাহারীদের আহার দান এবং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রত্যেক শাখায় মুক্ত হস্তে মাল খরচ করার মর্যাদাও তাঁরা লাভ করেন। তাঁদের হৃদয় উন্মুক্ত হওয়ার ফলে আল্লাহও তাঁদের

জন্য নিজ ভাণ্ডার খুলে দেন।

ভেবে দেখুন! এসব সম্পত্তি তাঁদের হাতে কোত্থেকে এসেছিল? তাঁরা তো সারারাত এবাদতে এবং সারাদিন দ্বীন ও জিহাদের খেদমতে লেগে থাকতেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেক নেক কাজে অংশগ্রহণের নিয়ত করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে তাঁদের নিয়তেরও বেশী দান করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইয়াহুদী ও তাদের পথের অনুসারী বখিলদেরকে লক্ষ্য করুন যে, তারা হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও পাষণ্ডতার কারণে সারা জীবনে কাউকে এক ঢোক পানি পান করানোর তাওফীকও পায়নি। কল্যাণের পথ তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু তারা হৃদয়ের সংকীর্ণতায় সংকুচিত হয়ে যায়। তারা ভাবে, সম্পত্তি খরচ করলে কমে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের সন্তানেরা অনাহারে মারা যাবে। বিধায় তাদের সম্পদ তাদের জন্য কষ্টদায়ক সাপ ছাড়া আর কিছুই হয় না। যে সাপ ইহজগতেও তাদেরকে ক্লান্ত করে, অস্থির করে এবং পরজগতেও তাদেরকে দংশন করবে। সম্পত্তি তাদের জন্য এমন বোঝা হবে যে, এই সম্পত্তিই তাদেরকে দোযখের খাদে নিপতিত করবে। আমরা প্রতিদিন আমাদের বাস্তব জীবনে দেখে থাকি যে, দানকারীরা স্বল্পতা বা ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, আর কৃপণেরা অভাবের তাড়নায় সর্বদা অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। অনেকের কোটি কোটি টাকা থাকে, কিন্তু তাদের হজ্জ করতে এবং যাকাত দিতে কষ্ট অনুভব হয়। অথচ অনেক দরিদ্র ব্যক্তি প্রতি বছর হজ্জ করে এবং আল্লাহ্ পাক তাকে আরও দান করেন।

বস্তুত বান্দা আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে সেরূপ আচরণই করেন। বর্তমানে এমন লোকও আছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা জিহাদেও ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন, তারা মসজিদও বানাচ্ছে, মাদ্রাসায়ও দান করছে, হজ্জও করছে, যাকাতের পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণে দান করছে। তারা দ্বীনের খাদেমদের বেশী বেশী খেদমত করছে। ইয়াতিম ও বিধবাদেরও দেখাশুনা করছে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আরও অধিক দিচ্ছেন, তাদের সম্পত্তি কমতে দেখাত যায় না। এরা সৌভাগ্যবান, এদেরকে

আল্লাহ ভালবাসেন। তাই আল্লাহ পাক এদের হাত দিয়ে নিজের মাল বন্টন করান। তাদেরকে মধ্যস্থতা বানিয়ে বিরাট সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী করেন। বর্তমানে আবার এমন লোকও আছে, যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের সম্পদ তাদের জন্য বিষাক্ত সাপ আর জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে আছে। কোন ভাল কাজে তাদের হাত দ্বারা একটি পয়সাও ব্যয় হয় না। তারা মনের সংকীর্ণতায় আক্রান্ত হয়ে এমন মালের পাহারাদার হয়ে আছে, যা তাদের জন্য আযাবের কারণ হবে।

অবস্থা যখন এই, তাহলে আমরা নিজেদেরকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আল্লাহর রহমতের অধিকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করি না কেন? দুনিয়ার ধনসম্পদ আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি দান করলে খুশী হন, দানকারীকে নগদ বিনিময় দেন, তাহলে কেন আমরা সংকীর্ণ মন রাখব? আজ জিহাদে খরচ করার প্রয়োজন দেখা দিলে অকুণ্ঠচিত্তে আমরা নিয়্যত করে ফেলি। এর মধ্যে যদি বেলুচিস্তানের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্য করতে হয়, তাহলে আমরা আমাদের পকেটের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহর খাজানার দিকে তাকিয়ে সেখানেও ব্যয় করার নিয়্যত করি। আমরা আল্লাহর দেওয়া সবকিছু বিলিয়ে দেই। আমাদের বিশ্বাস থাকা দরকার যে, দানকারীর জন্য আসমানের ফেরেশতা দুআ করছেন—

"হে আল্লাহ! তুমি দানকারীদের উত্তম বদলা দাও। আর যারা দান করে না, তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দাও।"

এক বুযুর্গ চমৎকার বলেছেন—

"আল্লাহর গায়রত এটা কি মেনে নিতে পারে যে, বান্দা তাকে নগদ দিবে আর তিনি কিয়ামতের মাঠে সওয়াবের শুধু আশা দিতে থাকবেন?"

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তিনি অনেক বেশী দান করবেন। কারণ, সেদিন তাঁর রহমতে যৌবনের উদ্যম থাকবে, তবে তিনি দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। তিনি তো দয়ালু। তাঁর দয়ার আবেদনও এটাই যে, মুসলমান নিজেদের রবকে চিনবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুকম্পাকে জানবে। নেক কাজে সংকীর্ণতা ও কৃপণতা করা থেকে বেঁচে থাকবে। একথা বুঝা দরকার যে, কোন ভাল কাজ করার দ্বারা অন্য ভাল কাজের ক্ষতি হয়

না। তবে শর্ত হল, নিয়্যত সঠিক হতে হবে এবং মুক্ত মনের অধিকারী **হতে** হবে। জিহাদও আল্লাহর কাজ, গরীব মিসকিনদেরকে দান করাও **তাঁর** কাজ। মাদরাসা মসজিদ আবাদ করাও তাঁর কাজ। বিপদগ্রস্তদের **সহ**যোগিতা করাও তাঁর কাজ। এ সমস্ত কাজই কিয়ামত আসার আগ **পর্যন্ত** চলতে থাকবে। আমরা না করলে আল্লাহ তাআলা অন্যদের দ্বারা **করিয়ে** নিবেন। আমরা পিছনে থাকলে আল্লাহ তাআলা অন্যদেরকে **অগ্রসর** করবেন।

আমাদের কৃপণতার কারণে এবং আমাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের কারণে জিহাদ বন্ধ থাকবে না, মাদরাসা বিরান হবে না এবং মাখলূকের জন্য সেবামূলক কাজও আটকে থাকবে না। এ কাজ আল্লাহ তাআলা কারো না কারো দ্বারা অবশ্যই করাবেন। তাই আমরা হাত তুলে কেন আল্লাহর কাছে দুআ করব না—

"হে আল্লাহ! আপনি এ সমস্ত কাজ অব্যাহত রাখবেন এবং কারো না কারো দ্বারা করাতে থাকবেন। তাই আপনি আমাদেরকে এ কাজের জন্য মনোনীত করুন। আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করুন। কল্যাণের সকল কাজ আমাদের দ্বারা করিয়ে নিন। আমরা কাজ করতে প্রস্তুত। হে আল্লাহ! আমাদের জানও হাজির, মালও হাজির। আপনি কল্যাণের সমস্ত দরজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিন এবং সমস্ত নেক কাজ করার সাহস আমাদের দান করুন। হে আল্লাহ! সমস্ত মাখলূককে আমাদের কল্যাণ পৌছে দিন। আমাদেরকে এমন মেঘমালায় পরিণত করুন, যার বর্ষণে লক্ষ জীবন পরিতৃপ্ত হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কল্যাণের মাধ্যম বানান। আমরা যেন মজলুমদের সাহায্য করতে পারি, সহায়হীনদের আরামের ব্যবস্থা করতে পারি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের বিজয়ের জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের নেয়ামতের মাধ্যমে সফলতা দান করুন। বেদনার্ত মানবতার কল্যাণের জন্য খেদমত করার প্রেরণা দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দা বানিয়ে নিন ; আমাদের দ্বারা আপনি আপনার নিজের কাজ করিয়ে নিন। আমীন ছুম্মা আমীন।

দুরন্ত কাফেলা

সম্প্রতি আযাদ কাশ্মীর সফরকালে যখন 'বাগের' প্রসিদ্ধ মাদরাসা তালীমুল কুরআনে অবস্থান করছিলাম। তখন আমাকে জানানো হয় যে,

মুজাহিদদের একটি দল অধিকৃত কাশ্মীর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তারা আপনার সাথে মুসাফাহা করতে ইচ্ছুক। আমি বললাম, শুধু মুসাফাহাই নয় ; আমি তো কিছু সময় এ আল্লাহওয়ালাদের সাথে অবস্থান করব এবং তাদের দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্যও অর্জন করব। কিছুক্ষণ পর মুসলমানদের সৌভাগ্যবান একটি দল কক্ষে প্রবেশ করে। সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সারিবদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে মুসাফাহা ও মুয়ানাকা করে। মুয়ানাকার পর আমি তাদেরকে বসার জন্য অনুরোধ করি। তারা বসেন। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের চোখে ভালবাসার মুক্তা অশ্রু হয়ে ঝরছে। তারা কিছু কথা শ্রবণ করার জন্য আমার দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমার অন্তরে উত্থিত ভাব ও আবেগের প্লাবন আমার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিল। তাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আমি তাদেরকে অতি মহান আর নিজেকে অতি তুচ্ছ দেখতে পাই। এমন লোকদেরকে সম্বোধন করে কথা বলার সাহস আমার হচ্ছিল না, যাদের খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। মহান আল্লাহ তাদেরকে সেই জিহাদের ময়দানের জন্য নির্বাচিত করেছেন, যে ময়দানে যাওয়ার বাসনা স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। অবশেষে আমি ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে বলি—

"আপনাদের উপর আমার ঈর্ষা হচ্ছে। হায়! আজ যদি আমি আপনাদের স্থানে থাকতাম! সন্ধ্যা নাগাদ আমিও দুশমনের এলাকায় প্রবেশ করে আমার অস্ত্র ও খুন দিয়ে জিহাদের প্রদীপকে আলোকিত করতাম! হায়! আমার উপর যদি এসব দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমিও আজ আপনাদের মত রণাঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করতে পারতাম। আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! এটি মহান এক রাস্তা। যে রাস্তার খাতিরে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছিলেন। প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার ভালবাসার দৃষ্টি আপনারা লাভ করেছেন। তাই আপনাদের পালা এসেছে। আর আপনারা সেই পথ পেয়েছেন, যা সোজা জান্নাত ও মর্যাদার দিকে যাচ্ছে।"

আমি সে মুজাহিদদের নিকট পরোপকারী হওয়ার, অন্যকে পানি

নিজে নিজে শাহাদাতের শরবত পান করার তরীকা জিন্দা করার এবং পরস্পর মতবিরোধ না করে ভালবাসার নতুন ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করার নিবেদন করি। আমি তাদেরকে বলি, আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর দ্বীনের হেফাজতের জন্য কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে আপনাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। বর্তমানে কোটি কোটি মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করা থেকে মাহরুম। তাদের জীবন নাপাক দুনিয়া উপার্জনের কাজে নষ্ট হচ্ছে। তাদের অনেকের রাত সিনেমার নাপাক ও মিথ্যা পরিবেশে ব্যয় হচ্ছে।

আমার বন্ধুরা! তোমাদের কাজ মুবারক হোক। তোমাদেরকে মুবারকবাদ। আল্লাহ তাআলা তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, আমাদেরও মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তাঁর রহমত তোমাদেরকে মনোনীত করেছে, তোমাদেরকে পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর যখন এতই মেহেরবানী করলেন, তাই তাঁর নাফরমানীর কথা কল্পনাও করবে না। গুনাহের কাছেও ভিড়বে না। জিহাদের আযমত এবং আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ রেখে গুনাহের পংকিলতার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে। পরিশেষে আমি সেই তরুণদের নিকট নিবেদন করি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শাহাদাত দান করলে তোমরা আমার জন্য শাফায়াত করবে। একথা শুনে তরুণরা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অবশেষে দুআ হলো। আমি আল্লাহর নিকট তাদের নিরাপত্তা এবং সফলতার জন্য দুআ করি। দুআ শেষে তারা আমার সঙ্গে পুনরায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। সে আলিঙ্গন এমন হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসাপূর্ণ ছিল যে, তার মধুরতা আমি এখনো উপলব্ধি করি। ধীরে ধীরে তারা কক্ষ থেকে বের হতে থাকে। আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের দিকে ঈর্ষা আর ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

আমার কল্পনার দৃষ্টিতে গাযওয়ায়ে বদর থেকে আরম্ভ করে জাইশে মুহাম্মাদের এ বাহিনী পর্যন্ত শত সহস্র কাফেলা আসমানের উচ্চতায় নক্ষত্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করছিল। সত্যের খাতিরে হত্যা করা ও নিহত হওয়ার এ কাফেলা কতদিন ধরে চলছে এবং কতদিন চলতে থাকবে, সে কথা তো আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে এ কাফেলায় শরীক হয়ে তাঁর প্রত্যেক উম্মতকে এতে শরীক হওয়ার জন্য আহবান করেছেন। সৌভাগ্যবান উম্মত দয়ালু নবীর ডাকে সাড়া দেয়, পক্ষান্তরে যারা হতভাগা তাদেরকে জমিন গিলে না ফেলা পর্যন্ত জমিনের সাথে আটকে থাকে।

পাহাড়ের তুষার গলেছে ও পথ পরিষ্কার হয়েছে। প্রতিদিন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের কাফেলা মুসলমানদের বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য করে ক্লাশিনকোভ হাতে নিয়ে রক্তাক্ত সীমান্ত অতিক্রম করছে। কোন কোন কাফেলা রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছে আর কিছু কাফেলা সীমান্তের আশেপাশে প্রতীক্ষায় আছে। কিছু কিছু মুজাহিদ বিশটি ক্যাম্পের প্রতীক্ষা–কক্ষে বসে বসে নিজেদের পালা আসার প্রতীক্ষায় আছে। সুধী পাঠক! আসুন দেরী না করে আপনিও আপনার জানমাল আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিতে পারেন। আপনিও মুজাহিদ হওয়ার বিরাট ও বিরল মর্যাদা লাভ করতে পারেন। আসুন! বাহিনী প্রস্তুত, কাফেলা তৈরী। নিজের জান হাতে নিয়ে আসুন, তারপর ঈমানের মধুরতা এবং গায়রতে ঈমানের উত্তাপের পুলক উপলব্ধি করুন।

মুজাহিদদের কাফেলা রণাঙ্গনে প্রেরণ করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। তাই সাহাবায়ে কেরামের মত মন খুলে নিজের মালও আল্লাহর দরবারে পেশ করুন। এ সময় প্রাপ্তির সময়। আল্লাহর রহমত লুটে নেওয়ার সময়। সৌভাগ্যবান মুসলমান অনতিবিলম্বে লাব্বাইক বলুন, এ ব্যাপারে আমাদের বিলম্ব এবং আমাদের কৃপণতা আমাদেরকে বঞ্চনার অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে পারে। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে হেফাজত করুন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বোনদের নামে

মুসলমান নারীদের উপর জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই করা সাধারণ অবস্থায় ফরয নয়। তবে একথাও সত্য যে, জিহাদের ফরয নারীদের সহযোগিতা ছাড়া আদায় করা সম্ভব নয়। তাই একথাই

বলা উচিত যে, নারীরাও জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ এবং মোক্ষম ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সব পরিবারের নারীরা ইসলাম ও জিহাদকে ভালবাসেন এবং এর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন, সেসব পরিবার থেকে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ, গর্বিত ও নামকরা মুজাহিদ জন্ম নিচ্ছেন। কিন্তু যেসব পরিবারের নারীরা উদাসীনতা, ভীরুতা ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজায় জড়িত, সেসব পরিবার থেকে ইসলামের মুহাফিজ (সৈনিক) কম এবং মুখালিফ (বিরুদ্ধবাদী) বেশী জন্ম হচ্ছে।

হাদীস শরীফে এসেছে—"প্রতিটি শিশু ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, পরবর্তীতে তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী, নাসারা এবং মজুসী পর্যন্ত বানায়।" মা-বাবার মধ্য থেকে শিশুর প্রথম জীবনের সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে থাকে গভীর। শিশুর উপর মার প্রাথমিক প্রতিপালনের প্রভাব অধিক গভীর হয়ে থাকে। মার অন্তরে ঈমান থাকলে সে তার শিশুকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী পর্যন্ত বানায়। কিন্তু মা নিজেই যদি ঈমানী গায়রত থেকে রিক্ত হয়, তাহলে মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সন্তান কাফেরদের দাস, তাদের দোসর এবং অনেক সময় তাদের সংরক্ষক হয়ে যায়।

ইসলাম নারীকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে, তাকে সতীত্বের প্রতীক ও গৃহের রানী বানিয়েছে। অতীতে ইসলামের উত্থানের পিছনে অগণিত মা-বোনের নিষ্পাপ মুখকে কার্যকর দেখা যায়। জিহাদের ময়দানে তো সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, নুরুদ্দীন যঙ্গী, মাহমুদ গজনভী ও মুহাম্মাদ বিন কাসেমকে বেশী দেখা যায়। কিন্তু মহান এই যোদ্ধাদের পিছনে নিশ্চয়ই কোন মা-বোন ও বউ-বেটীর ভূমিকা কার্যকর রয়েছে। আল্লাহ তাআলা নারীর মুখে অসাধারণ প্রভাব দিয়েছেন। কিন্তু এ প্রভাব দ্বারা সে কল্যাণ সংগ্রহ করে, নাকি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা তার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নারী যদি শয়তানের পথে ডাকতে আরম্ভ করে তাহলে বড় বড় হাতীও ধরাশায়ী হয়ে যায়। তখন শয়তানের অন্য কোন ফাঁদের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এ নারীই যদি তার ভাই, ছেলে ও স্বামীর অন্তরে ঈমানী জযবার প্রদীপ জ্বালায়, তখন সত্যপন্থীদের আক্রমনের সম্মুখে কাফের বাহিনী মাকড়সার জালের মত দুর্বল প্রমাণিত হয়।

* আল্লাহ তাআলা নারীকে যে শক্তি দান করেছেন, বেশীর ভাগ নারী তার মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয়। তাই তাদের অধিকাংশ যোগ্যতা পারিবারিক কলহ বিবাদ বাধানো ও তা মিটানো এবং অলংকারাদির পিছনে ব্যয় হয়ে থাকে। অথচ নারী জাতি যদি তাদের শক্তির দিক ফিরিয়ে দেয়, তবে পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে যে কেমন মূল্যবান বানিয়েছেন, অধিকাংশ নারী সে সম্পর্কে ধারণা রাখে না। বিধায় তারা নিজেদেরকে বাহ্যিক সাজসজ্জা ও স্বর্ণ–চাঁদির তুচ্ছ জাকজমকের পিছনে বরবাদ করে। অথচ তারা চাইলে নিজেদের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং পৃথিবীকে কল্যাণ ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করতে পারে।

তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া নারীর একটি সহজাত অভ্যাস। তাই ইসলাম তাদেরকে সজাগ রাখার জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছে। পবিত্র কুরআনের বড় একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে তাদের নামে। ঈমানের কষ্টিপাথর ও তার মাপকাঠি হিসাবে পবিত্র কুরআনে হযরত মারিয়ম এবং হযরত আছিয়ার দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ সাহসিকতার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে কুরআনে সরাসরি সম্বোধন করে নারী জাতির মর্যাদা ও তাদের দায়িত্ব স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। বৈষয়িক ঝামেলা ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখার জন্য নারীদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নতর বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেন নারীর উপর অধিক বোঝা না হয়। তারা মানব বংশ অক্ষুন্ন রাখা এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রাথমিক তরবিয়্যতের কাজ নিবিষ্ট মনে ও সহজে সম্পাদন করতে পারে।

পুরুষদের কাজের জন্য অফিসের প্রয়োজন পড়ে। আল্লাহ তাআলা নারীদের দায়িত্বে গৃহের মজবুত চৌহর্দীর সংরক্ষণের কাজ দিয়ে কর্ম সম্পাদনের উত্তম অফিসের ব্যবস্থা করেছেন। এমন অফিস, যেখানে নারীর পূর্ণ অধিকার ও পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে। অথচ এসব অফিসের ব্যয়ভার এবং বহিরাঙ্গনের বোঝা তাদের মাথা থেকে সরিয়ে পুরুষের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত নারীর মর্যাদা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিধানাবলী নারীকে এমন নিরাপদ ও উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, যার কল্পনাও ঈমান বৃদ্ধি করে। সন্তান প্রসবের সময় মা যে কষ্ট করে, তা পবিত্র কুরআনের প্রতিপাদ্য হয়েছে। পুরুষের উপর নারীর অনুকম্পাকে পবিত্র কুরআন বারবার উল্লেখ করেছে। যেন পুরুষ নারীর মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে এবং খোদ নারীও স্মরণ রাখে যে, সে কে? তার মর্যাদা কত? এবং তার দায়িত্ব কি? একজন সৎ নারী কেমন উচ্চ মর্যাদায় আরোহণ করতে পারে পবিত্র কুরআন তাও বর্ণনা করেছে। আবার একজন অসৎ নারী কত অধঃপতনে নামতে পারে পবিত্র কুরআন সে সম্পর্কেও অবহিত করেছে। পবিত্র কুরআন নারীর উন্নতি ও মর্যাদার সোপানে আরোহন করার এমন রহস্য ব্যক্ত করেছে, যা বাস্তবায়ন করলে ব্যর্থতার কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। পবিত্র কুরআন নারীদেরকে লাঞ্ছনার সেই গহ্বর সম্পর্কেও সতর্ক করেছে, যাতে পতিত হলে নারী নিরেট তামাশা ও কৌতুকের পাত্র হয়ে যায়।

ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামের চাদর, শালিনতার উড়না, আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের, পরিধেয় এবং ঘরের চার দেয়ালের নিরাপত্তা যে নারী গ্রহণ করেছে, সে ইহ–পরকালে এমন মর্যাদা লাভ করেছে, আমাদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছতেও অক্ষম। হায়! বর্তমান যুগের মুসলিম বোন ও কন্যারাও যদি ইসলামের এসব উপহার ও আমানতকে সামলে রাখত! আজ যখন কাফেরদের প্রথম লক্ষ্য হল নারী এবং ইহুদী ও খৃষ্টান নারীরা কুফুরী, ধর্মদ্রোহিতা, নির্লজ্জতা ও বিষয় পূজার ব্যাধি বিস্তারের জন্য মাঠে নেমেছে, তখন আমাদের মুসলিম নারীদেরকেও বাড়ীর চৌহর্দীর ভিতরের মোর্চা সামলাতে হবে। আজ যখন ভীরু ইহুদী নারীরা ইসরাইলকে রক্ষা করার জন্য দেহ–মন বিলিয়ে দিচ্ছে, তখন আমাদের মুসলিম নারীদেরকেও গহনার মিথ্যা চমক এবং পারিবারিক অর্থহীন কলহ থেকে মুক্তিলাভ করে হযরত সুফিয়া এবং হযরত খাউলার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।

আজ যখন বাইতুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের হাতে এবং বাবরী মসজিদের উপর মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে, তখন আমাদের মুসলিম নারীদেরকে

জাগতে হবে। ফ্যাশন করে মিথ্যা মর্যাদা লাভের পরিবর্তে ইসলামের প্রকৃত মর্যাদা লাভের জন্য সাধনা করতে হবে। আজ যখন কাফের নারীরা বিশ্বময় অপবিত্রতা বিস্তার করার জন্য পথে নেমে এসেছে—তখন আমাদের মুসলিম নারীদেরকেও শালিনতা ও পবিত্রতার প্রসার ঘটানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

হে মুসলমান বোনেরা! হে মা আয়েশা ও মা ফাতেমার মেয়েরা! একটু ভেবে দেখুন! আপনারা কি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আপনারা হীনমন্যতার শিকার হয়ে পোশাক এবং গহনার মাঝে সম্মান তালাশ করছেন। একে অপরকে খাট করার অসার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। একবার বলুন দেখি, চাকচিক্যময় পোশাক আর নিষ্প্রাণ স্বর্ণ আপনাদেরকে এবং মুসলিম উম্মাহকে কি দিয়েছে? লজ্জা আপনাদের ভূষণ এবং ইসলাম মেনে চলার মধ্যে আপনাদের মর্যাদা।

আপনারা যদি জান্নাতে যেতে চান, তাহলে জান্নাতী নারীদের সরদারের কর্মপন্থাকে কেন গ্রহণ করছেন না? আপনাদের সর্দারের হাতে দাগ ও কড়া পড়েছে, অথচ আপনারা নিজেদেরকে এবং সমগ্র জাতিকে অলসতার আযাবে লিপ্ত করেছেন।

হে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী বোনেরা! আপনাদের মস্তকচ্যুত উড়না এবং আপনাদের ঘরে ব্যবহৃত টেলিভিশন আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কি দিয়েছে? যে আল্লাহ আপনাদেরকে কুরআনের আয়াত দ্বারা সম্মানিত করেছেন, সে আল্লাহর নাফরমানী করে আপনারা কি পেয়েছেন?

হে মুসলিম কন্যারা! আজ আপনাদেরকে দুনিয়ার প্রতি লোলুপ বানানো হচ্ছে। অথচ দুনিয়ার লালসা কোন মুসলমানের শোভা পায় না। এটি তো কুকুর ও অন্যান্য নোংরা প্রাণীর খাসলত। আপনারা তো মা ও কন্যার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। দুনিয়া তো বটেই আপনাদের পদতলে জান্নাতের নহর প্রবাহিত। আপনাদের কি প্রয়োজন এ নোংরা দুনিয়াকে লক্ষ্য বানানোর? আপনারা তো অবগত আছেন যে, যার ভাগ্যে দুনিয়া যতটুকু লেখা আছে, সে তা পাবেই।

আমার মহিয়সী বোনেরা! আপনারা তো মহান নবীর অনুসারী।

ভীরুতা আপনাদের শোভনীয় নয়। আপনারা নিজেদের স্বামী, ভাই ও সন্তানদেরকে ইসলামের মুজাহিদ এবং দ্বীনের পাগলপারারূপে কেন তৈরী করছেন না? আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, কিয়ামতের দিন বড় কঠিন হিসাব হবে। সেদিন নেকী ছাড়া অন্যকিছু কাজে আসবে না। আমার বোনেরা! আপনারা যদি নিজ গৃহকে মজবুত করেন, অন্তরকে ইসলামের খাঁটি প্রেমিক বানান, শহীদদের পরিবারের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করেন, ঘরে ঘরে জিহাদের প্রস্রবণ প্রবাহিত করেন এবং মুক্তাসম ঘটনাবলী শোনাতে থাকেন এবং ইসলামের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হন তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের ভাইয়েরা বিশ্বের মানচিত্র পাল্টে দিব। আল্লাহর জমিনকে জুলুম ও ফাসাদ থেকে পবিত্র করবো।

প্রিয় বোনেরা! আপনাদের চক্ষু যদি জ্বলে ওঠে এবং লজ্জার পবিত্র আবেগকে অন্যান্য মুসলিম বোন ও নিজ সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত করেন, তাহলে আপনাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা এক আঘাতে কুফরকে ভুলুণ্ঠিত করবে।

হে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বোনেরা! আপনারা যদি কার্পণ্য, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপূজাকে দূরে নিক্ষেপ করেন, ঐগুলোকে নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন এবং নিজ গৃহে কাফেরদের কোন নোংরামী এবং অপবিত্রতা প্রবেশ করতে না দেন, তাহলে আপনাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা কুফরের মারকাজসমূহে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করবে।

উঠুন! আমার মুসলমান বোনেরা উঠুন! শক্ত হোন। সাহস করে নিজেকে নিজে ঈমান ও ইসলামের খেদমতের জন্য তৈরী করুন। তারপর দেখুন আপনারা কেমন প্রশান্তি লাভ করেন এবং কেমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

সৌভাগ্যবতী বোনেরা

গতকাল সফর থেকে ফেরার পর আমার পরিবার আমার হাতে দুটি ইনভেলাপ (খাম) দেয়। একটি ইনভেলাপে কিছু গহনা আর কিছু টাকা ছিল। অপরটিতে ছিল একজন তরুণের চিঠি। তাতে লেখা ছিল যে, এসব গহনা ও টাকা তার মা, ছোট বোন, খালা এবং আরো কয়েকজন নারী জিহাদে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে একথাও লেখা

ছিল যে, আমাদের ঘরে নিয়মিতভাবে যরবে মুমিন পত্রিকা এবং ফাযায়েলে জিহাদ কিতাবের তালিম হয়। বাড়ীতে মহিলা মাদরাসা আছে। সেখানে আপনার ক্যাসেট শোনা ও শোনানো হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! এ জাতীয় চিঠি এখন অনেক আসছে। মহিলাদের মনে নিজেদের নিস্প্রাণ গহনা দান করে জিহাদকে প্রাণবন্ত করার এবং মৃত্তিকা থেকে বের হওয়া স্বর্ণ দিয়ে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা। এজন্য সেসব নারীর আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার, যাদেরকে তিনি ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন এবং তাদের সৌভাগ্যের উপর মোহরাঙ্কিত করেছেন।

এটি এক বিশ্বয়কর বন্টন যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে একজন নারীকে সারাজীবন স্বর্ণ-চাঁদির বেড়িতে আবদ্ধ রাখেন। এমন স্বর্ণ, যার দ্বারা পেটও ভরে না এবং পিপাসাও নিবৃত হয় না বা পরিধান করলে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় না এবং সম্মানও বৃদ্ধি পায় না। বরং স্বর্ণের মালিকরা সব সময় এ আশংকায় থাকে যে, স্বর্ণ চুরি না হয়ে যায়। কেউ ছিনিয়ে না নেয়। সব সময় এ নিস্প্রাণ চমককে হেফাজত করতে হয়। উপরন্তু এই স্বর্ণের হক আদায় করা না হলে কেয়ামতের দিন এই স্বর্ণ উত্তপ্ত করে মালিকের মুখমণ্ডলে, পিঠে ও পেটে দাগ দেওয়া হবে। স্বর্ণকে নেড়ে মাথা বিশিষ্ট সাপে রূপান্তরিত করে তার মালিককে দংশন করানো হবে। উহ! কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, একজন নারী সারাজীবন এমন সাপের হেফাজত করে, যা তাকে কিয়ামতের দিন দংশন করবে।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে একজন নারীকে স্বর্ণ-চাঁদি দান করেন। তারপর তাঁর অন্তরে ঈমান ও বদান্যতার নূর দান করেন। ফলে সে নারী স্বর্ণ-চাঁদিকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। তখন এ স্বর্ণ সে নারীর কবরের আলো এবং জান্নাতের অমূল্য নেয়ামতরাজি লাভের কারণ হয়। এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত থাকবে এবং আল্লাহ নিজে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

অর্থাৎ, স্বর্ণ ব্যয় করার পর সে ইহকালীন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ করল এবং দুনিয়া আখেরাতে তার অসংখ্য কল্যাণও লাভ করল।

নিশ্চয়ই এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাই পবিত্র কুরআনে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদেরকে সফল আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে বালাকোটের ঐতিহাসিক স্থানে জাইশে মুহাম্মাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম মাদরাসা সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)। সেখানে একটি মসজিদ, পানির বড় একটি টাঙ্কি, প্রশিক্ষণের বড় একটি মাঠ এবং মুজাহিদদের বোর্ডিং বানানো হচ্ছে। কিছু মুসলমান নারী সেখানে মসজিদ ও অন্যান্য ঘর নির্মাণের জন্য তাদের গহনা পাঠিয়েছেন। নিজেই ভেবে দেখুন! সেই সৌভাগ্যবান নারীরা নিষ্প্রাণ স্বর্ণের বিনিময়ে কত বড় সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ মসজিদে কত মুজাহিদ এবং ভবিষ্যতের কত শহীদ নামায পড়বে তার ইয়ত্তা নেই। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কত মুহাম্মাদ বিন কাসিম এবং সালাহউদ্দিন আইউবীর মত বীর তৈরী হবে, তা জানা নেই। এ ময়দানে কত শহীদ আফাক প্রশিক্ষণ লাভ করবে তা কেউ বলতে পারে না। এদের সকলের সওয়াবের মধ্যে এ মুসলমান নারীরাও অংশীদার হবে।

এ কথা তো সুপ্রমাণিত যে, মুজাহিদদের সমান মর্যাদা কেউ লাভ করতে পারবে না এবং জিহাদের কাজে এক রাত পাহারাদানকারী সারা বিশ্বে যত নেক কাজ হয় তার অংশ লাভ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এ অংশ লাভ করতে থাকবে। তাহলে যেসব নারীর গহনা এবং আর্থিক সহযোগিতা মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ কাজে সাহায্য করল এবং যেসব মুসলমান মুজাহিদদের দায়িত্ব বহন করল, তারা কি পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে তা অনুমান করাও কঠিন। কেননা, জিহাদ এমন একটি ব্যবসা, যার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ পাক মুজাহিদদের ক্রেতা হন। আর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বর্ষণের কেউ অনুমান করতে পারে কি?

মুসলমান হত্যা

একজন মুসলমান কি তার কোন মুসলমান ভাইকে হত্যা করতে পারে? ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, একজন মুসলমানের জন্য এমনটি ভাবাও অসম্ভব। এক মুসলমান তো অন্য মুসলমানের সংরক্ষক। প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানকে একদেহ সাব্যস্ত করে এ সম্পর্ককে অধিকতর দৃঢ় করেছেন। দেহের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের জন্য সমবেদনশীল, সহমর্মী ও সংরক্ষক হয়ে থাকে। প্রত্যেক অঙ্গ অপর অঙ্গের মুখাপেক্ষী। কোন অঙ্গকে বাদ দিয়ে দেহ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মুসলিম সমাজের অবস্থাও ঠিক তাই। আদর্শ ও বরকতময় এ সমাজে কেউ নিজের অধিকারের কথা বলে না। বরং প্রত্যেকে তার দায়িত্বে অন্যের কি হক এবং কি পরিমাণ হক রয়েছে, তা নিয়েই চিন্তা করে। নিজের হক ছেড়ে দেওয়া মুমিনের শান এবং নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে ভালবাসা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের এমন মহান সম্পর্কে আবদ্ধ যে, সে সব মুসলমানকে নিজেরই অঙ্গ মনে করে থাকে। তাই কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে গালি দেয় না। তার গীবত করে না, অপবাদ দেয় না এবং প্রহার করে না। হত্যা করাতো বিরাট ব্যাপার! এক মুসলমান অপর মুসলমানের দিকে অস্ত্রের মাথা দিয়ে ইঙ্গিত পর্যন্ত করে না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনরা ইসলামী সমাজে চিড় ধরানোর জন্য এবং এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের সংরক্ষক হওয়ার স্থলে প্রতিপক্ষ বানানোর ব্যাপারে পূর্ণ সচেষ্ট।

সম্পদ, নারী, পদ ও অসার জাতীয়তাবাদের পূজার মাধ্যমে মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়। এক আল্লাহর সম্মুখে মস্তক অবনতকারী মুসলমান, আখেরাতের ফিকিরে ফিকিরমান মুসলমান, অপর মুসলমানকে নিজের উপর প্রাধান্যদানকারী মুসলমান, কালিমার সম্পর্ককে রক্ষাকারী মুসলমান এবং কালিমার সম্পর্কের সম্মুখে অপরাপর সকল সম্পর্ককে তুচ্ছ জ্ঞানকারী মুসলমান যখন বিগড়ে যায় এবং কোন মানুষকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে করে এবং এমন নেতা হিসাবে গ্রহণ করে, যার হুকুমে আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ করে, কিংবা আখেরাতকে বাদ দিয়ে গান্ধা সম্পদকে নিজের লক্ষ্য বানায়, কিংবা নিজেকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে, কিংবা ইসলাম ছাড়া দেশ, জাতি অথবা ভাষাকে নিয়ে গর্ব করতে থাকে, তখন

এমন ব্যক্তি মুসলিম জাতির জন্য উপকারী নয়, বরং দুশমন হয়ে যায়। তখন তার দ্বারা মুসলমানকে হত্যা করার মত মারাত্মক গোনাহও সংঘটিত হয়। নাউযুবিল্লাহ! কোন মুসলমানকে হত্যা করা এমন এক গোনাহ, যার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এটি এমন গোনাহ, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফর আখ্যা দিয়েছেন। এমন গোনাহ, যার বেদনায় আসমান ও জমিন অশ্রু বিসর্জন করে, এমন গোনাহ, যাকে পবিত্র কুরআনে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার সমকক্ষ বলা হয়েছে।

হায়! মুসলমান যদি এ সত্যকে অনুধাবন করত এবং অন্তরে প্রবিষ্ট করত যে, দুনিয়াতে তারা এক আল্লাহ তাআলার গোলামী করার জন্য এসেছে ; তাদের মতই কোন মানুষের গোলামী করার জন্য নয়। হায়! মুসলমান যদি বুঝতে যে, একজন মুসলমানের মূল্য ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট কাবাঘরের চেয়েও অধিক। হায়! মুসলমান যদি উপলব্ধি করত যে, যারা তাদেরকে অন্য মুসলমানকে হত্যা করার হুকুম দেয়, তারা বন্ধু নয় বরং নিকৃষ্টতম শত্রু।

হায়! মুসলমান যদি বুঝত যে, একজন মুসলমানকে হত্যা করলে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ উত্তেজিত হয়, ফলে সমগ্র জাতি আল্লাহ তাআলার নুসরাত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। হায়! মুসলমান যদি বুঝত যে, ইসলাম তো সবধরনের কাফেরকেও হত্যা করার অনুমতি দেয় না। সেখানে একজন মুসলমানকে হত্যা করার তো প্রশ্নই আসে না। হায়! মুসলমান যদি বুঝত যে, হত্যা করা একটি এবাদত, যখন তা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক করা হয়। ইসলামী শরীয়ত যাদেরকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে শুধু তাদেরকেই হত্যা করা হয়। মূর্তিকে খুশী করার জন্য মূর্তির সামনে মস্তক অবনতকারী ব্যক্তি যেভাবে মুসলমান থাকে না, তেমনিভাবে নিজের নেতার আদেশে মুসলমানকে হত্যাকারী ব্যক্তিও কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। চরম দুর্ভাগ্য তার ভাগ্যলিপি হয়ে যায়।

হায়! মুসলমান যদি বুঝত যে, জিহাদের দুটি দিক রয়েছে, যার প্রত্যেকটিই অপরটির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একদিক হল, ইসলামের

দুশমনদেরকে বিলুপ্ত করা, যাতে করে কুফরী শক্তি ও প্রতাপ ভেঙ্গে পড়ে। আর অপরদিক হলো, মুসলমানদেরকে সংরক্ষণ করা, তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া। যার ফলে ইসলামী সমাজ শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় হয়। জাইশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের উভয় দিকের উপর আমল করায় বিশ্বাসী। আমরা একদিকে ইসলামের দুশমনদেরকে আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করতে আরম্ভ করেছি এবং এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ এমন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যার সফলতা সমগ্র আলমে ইসলামের সফলতা হবে। ইনশাআল্লাহ এর সফলতার আনন্দ মুসলিম উম্মাহর সবাই উদযাপন করবে।

আমরা সমস্ত মুসলমানকে দাওয়াত দিচ্ছি যে, তারা যেন সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে জিহাদের ময়দানে জাইশে মুহাম্মাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিকদল এখনো জীবিত আছে এবং পূর্ণ প্রতাপের সাথে জীবিত আছে। যারা তাদেরকে ধ্বংস করার তদবীর করছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের গর্ত খনন করছে।

অপরদিকে আমরা সংকল্প করেছি যে, আমরা মুসলমানদেরকে হেফাজত করব। তাদের জন্য সম্ভাব্য সকল সুখ–সুবিধার ব্যবস্থা করব। চাই তারা আমাদের সংগঠনের লোক হোক কিংবা অন্য সংগঠনের। আমরা জাতি, গোত্র, দেশ ও ভাষার পার্থক্য থেকে উপরে উঠে সকল মুসলমানকে নিজেদের ভাই মনে করি। তাদের খেদমত ও হেফাজত করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করি।

আমরা জাইশে মুহাম্মাদের নেতা ও কর্মীদেরকে হেদায়েত দান করছি যে, তারা যেন কোন মুসলমানের গীবত না করে, কাউকে শক্তি বলে অধীন না করে। কোন মুসলমানকে যেন কষ্ট না দেয় বরং সকল মুসলমানের খেদমত করাকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মত সাহস নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে। এমনিভাবে জাইশে মুহাম্মাদের সশস্ত্র বাহিনীকে এ অলংঘনীয়

হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অস্ত্র শুধুমাত্র ইসলামের দুশমন শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনোই নয়। সুতরাং কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্রই তাক করবে না। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মুজাহিদ সাথীরা এ হেদায়েতের উপর কাজ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি মুসলমানদেরকে বলা হয় যে, জাইশে মুহাম্মাদের মুসলমানগণ অন্য মুসলমানকে কষ্ট দিয়েছে, তাহলে আপনি মানুষের মুখের শোনা কথার উপর নির্ভর করে ইসলামের মুজাহিদদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করবেন না। বরং জাইশে মুহাম্মাদের কেন্দ্র থেকে বিষয়টি যাচাই করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্যাবধি মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডাসমূহ অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। তবুও আপনি এ জাতীয় কোন অভিযোগ পেলে জাইশে মুহাম্মাদের ইহতিসাব শাখাকে অবহিত করুন কিংবা সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কিন্তু আপনি যদি যাচাই-বাছাই না করে এ ধরনের খবরের উপর ভিত্তি করে বিষয়টির আরও বিস্তার ঘটান, তাহলে এ কাজ আপনার নিজের জন্যও কল্যাণকর হবে না এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণ বয়ে আনবে না।

জাইশে মুহাম্মাদ মুসলিম উম্মাহর ঈমানী বাসনাসমূহকে পূর্ণতা দানের জন্য সাধনাকারী একটি ইসলামী বাহিনী। ইসলামের দুশমনরা তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা নানারকম মিথ্যা কথা ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে জাইশ এবং জিহাদ সম্পর্কে হতাশ করছে। সকল মুসলমান ভাই ইসলামের দুশমনদের এসব চক্রান্তের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। জাইশকে আল্লাহ প্রদত্ত একটি নেয়ামত মনে করে তাকে রক্ষা করবেন। শুধু মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা কিংবা কিছু মানুষের ব্যক্তিগত প্রবণতাকে প্রমাণ মনে করে শহীদ ও গাজীদের এ কাফেলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদেরকে মন্দ ধারণাকারী বানানো কোন নেক বা উত্তম কাজ হবে না। তবে যে মুসলমান ভাই এমন কাজ করবে আমরা তাকেও পর্যাপ্ত দুআ দিব। তার খেদমত ও হেফাজত করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করব। কেননা আমাদের জিহাদ আমাদের নিজেদের জন্য কিংবা আমাদের সংগঠনের জন্য নয়। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

কালিমার মান রক্ষা করুন

কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'–এর সম্পর্ক বিরাট একটি নেয়ামত। আমাদের জন্য এটি অনেক বড় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বটে। নেয়ামত এজন্য যে, কালিমার বদৌলতে আমরা সত্যিকারের মানুষ হতে পারি। এ কালিমার সঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখার বদৌলতেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত সঠিক, সুন্দর ও মধুর হয়। আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এজন্য যে, এ কালিমা সকল মুসলমানকে এক সূত্রে গেঁথে দেয় এবং আমাদের মাঝে বিদ্যমান এমন সম্ভাব্য ভাঙ্গনকে বিলুপ্ত করে দেয়, যা একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এ কালিমার বরকতে আমরা এক জাতি ও এক সম্প্রদায়। এ কালিমা সাদা–কালোর পার্থক্য তুলে দিয়েছে। আঞ্চলিকতার বিভেদকে বিলুপ্ত করেছে। শ্রেণী বিভক্তির শিকড় কেটে দিয়েছে। সীমান্তের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছে। ভৌগলিক দিক থেকে আমরা পারস্যের হই, চাই আফ্রিকান হই, অর্থের দিক থেকে মালিক হই চাই শ্রমিক হই, বর্ণের দিক থেকে সাদা হই কিংবা কালো হই, ভূখণ্ডের দিক থেকে আরব হই চাই আজম হই, এ কালিমা আমাদের প্রত্যেককে অপরের ভাই বানিয়েছে। আমাদের একের যোগ্যতাকে অপরের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমাদের একের শক্তিকে অপরের শক্তি বানিয়েছে। দেশের পরিবর্তন হয়, সীমানার পরিবর্তন হয়, বংশের মধ্যেও বিচিত্র পরিবর্তন আসে, পেশারও পরিবর্তন হয় কিন্তু কালিমার সম্পর্ক কখনো পরিবর্তিত হয় না, টুটে যায় না এবং দুর্বল হয় না।

এ কালিমা আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে, যা মানুষকে পরস্পরের সংরক্ষক বানায়। এ কালিমা আমাদেরকে এমন দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে, যে দ্বীনে পরস্পরকে মর্যাদা দেওয়া এবং পরস্পরকে হেফাজত করার আবশ্যকীয় হুকুম রয়েছে। এ কালিমা আমাদেরকে এমন রবের সঙ্গে জুড়ে দেয়, যে রবের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি দেহের অঙ্গের মতই অপরের জন্য অঙ্গ হয়ে যায়। এ কালিমা আমাদেরকে এমন শক্তি এবং কেন্দ্র দান করে যে, আমরা কেউই নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করি না।

আমাদের দুশমন আমাদের কাউকে একাকী মনে করে তাকে শিকার করতে পারে না। এ কালিমা আমাদেরকে এমন এক জাতিতে পরিণত করে, যা অটুট এবং অজেয়। এ কালিমা আমাদেরকে আখিরাতের এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়, যে উচ্চতার উপলব্ধি আমাদেরকে বৈষয়িক তুচ্ছ বস্তুর জন্য পরস্পর কলহে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে রাখে। এ কালিমা আমাদেরকে এমন শিখরে আরোহণ করায় যে, আমরা মাটির তৈরী বস্তুর জন্যে স্বার্থপর পশুতে পরিণত হই না। বরং আমাদের মাঝে আত্মত্যাগের সৎসাহস জন্মায়। এ কালিমা আমাদের মধ্যে এমন ঈমানী শক্তি পয়দা করে, যার ফলে আমরা এমন মানবে পরিণত হই, যাদের উপর ফেরেশতাদের ঈর্ষা হয়। এ কালিমা আমাদের মাঝে মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের এমন সুকুমারবৃত্তির জন্ম দেয়, যার ফলে আমরা 'আশরাফুল মাখলুকাত' আখ্যা পাওয়ার মর্যাদা লাভ করি। সারকথা এই যে, এ কালিমাই আমাদের সবকিছু। এ কালিমার সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা আমাদের সফলতার গ্যারান্টি।

সুধী পাঠক! আসুন, আমরা অতীতের সুদৃশ্য উদ্যানের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাই। জ্বি হ্যাঁ, ধুলোমলিন অবস্থা ছেড়ে অল্পক্ষণের জন্য সেই অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাই, যখন এ কালিমা প্রতাপের সঙ্গে আমাদের কাছে ভাস্বর ছিল। প্রত্যেকটি মুসলমান কালিমার সুদৃঢ় বন্ধনের মধুরতায় উন্মত্ত ছিল। সে সময় বিশ্বে আমরাই শ্রেষ্ঠ ছিলাম। বিশ্বের বড় বড় শক্তি আমাদের পদধূলি লেহন করছিল। সে সময় আমাদের আওয়াজ এত বুলন্দ ছিল যে, একজন মজলুম নারীর আর্তনাদে সমগ্র পৃথিবী কেঁপে উঠত। সে সময় আমাদের গতি এত দ্রুত ছিল যে, সেই মজলুমের আর্তনাদে লক্ষ লক্ষ নির্ভীক মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনী চোখের পলকে উদয়াচল ও অস্তাচলের দূরত্ব অতিক্রম করত। সে জামানায় মুসলমানের অস্তিত্ব এমন প্রবল ছিল যে, তাদের অস্তিত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারত না। প্রত্যেকে আমাদেরকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য ছিল। সে সময় আমরা সংরক্ষিত ছিলাম, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিরাপদ ছিল, আমাদের সীমান্তের বিস্তৃতি দিগন্তের প্রান্ত স্পর্শ করছিল।

সে সময় আমরা আমাদের ভূখণ্ড, আমাদের ভাষা এবং আমাদের

পেশা ভুলে গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ রেখেছিলাম। আল্লাহর নামে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে স্মরণ রেখেছিলাম। ফলে আল্লাহ তাআলার নুসরাত ও রহমত সর্বদা আমাদেরকে স্মরণ রেখেছে। আমাদেরকে কোথাও একাকী ছেড়ে দেয়নি। কালিমার বন্ধনের খাতিরে আমরা মৃত্যুর জন্য বায়আত গ্রহণ করি, ফলে মৃত্যু আমাদের থেকে পালিয়ে আমাদের দুশমনের উপর সওয়ার হয়ে যায়। আমরা কালিমার বন্ধনের খাতিরে বিপদ ক্রয় করে নেই, ফলে বিপদ–আপদ আমাদের থেকে পালিয়ে আমাদের দুশমনদের মাথা ব্যথার কারণ হয়। আমরা কালিমার বন্ধনের খাতিরে তরবারী ধারণ করি, ফলে আমাদের তরবারীর সঙ্গে আল্লাহর শক্তি যুক্ত হয়ে যায়। আমরা কালিমার বন্ধনের খাতিরে দুশমনের সঙ্গে লড়াই করার পণ করি। ফলে আসমানও ভালবাসার পুলকে দুলে উঠে। সেখান থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। আমরা কালিমার বন্ধনের খাতিরে দুশমনকে রণাঙ্গনে আহবান করি, ফলে আসমানের বজ্র আমাদের নাদ হয়ে যায়। ফলে দুশমনকে স্বীকার করতে হয় যে, এ জাতির প্রত্যেক সদস্য সমগ্র জাতির শক্তি বহন করে।

কিন্তু তারপর কি হল? কাফের আমাদের শক্তির রহস্য বুঝে ফেলল। আমাদের থেকে সেই রহস্য ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। আমাদেরকে কালিমার বন্ধন ভুলিয়ে দিল। তারা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিল যে, আমাদের মুসলমান পরিচয় পরে। তার পূর্বে আমাদের আরো অনেক পরিচয় রয়েছে। এই বহুবিধ পরিচয়ের মধ্যেই আমাদের ধ্বংসের বীজ লুকিয়েছিল। সুতরাং আমরা কেউ আরব জাতি হয়ে যাই, আর কেউ অনারব। কেউ আফগানী, আর কেউ তুর্কী। কেউ পাঞ্জাবী, আর কেউ পাঠান। কেউ উর্দূ ভাষী, সারায়েকী, আর কেউ বেলুচী ও সিন্ধু ভাষী। আমাদের আরো কত পরিচয় যে হল, তার শেষ নেই। ফলে আমরা বুদবুদের মত শক্তিহীন ও মূল্যহীন হয়ে পড়ি, অথচ আমরা সাগরের ফুঁসে উঠা তরঙ্গ ছিলাম। আমরা তুচ্ছ বিন্দুতে পরিণত হয়ে যাই, অথচ আমরা সাগরের নিনাদ ছিলাম। তারপর আমাদেরকে গিলে ফেলা হয়। কখনো আফগানিস্তানে, কখনো বসনিয়ায়, কখনো চেচনিয়ায়, কখনো কসোভোতে, কখনো ফিলিস্তিনে আর কখনো ইরাক ও কুয়েতে।

তারপর এমন দুর্দিন এলো, যখন আমাদের তরবারী আমাদেরকেই বধ করছিল। আমাদের হাত আমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছিল। আমরা যখন এক ছিলাম এবং আমাদের নিকট জিহাদের শক্তি ছিল, তখন কেউ আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকানোর হিম্মত করত না। কিন্তু যখন আমরা শতধা বিভক্ত হলাম এবং জিহাদ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো, তখন সকলে আমাদের দিকে আগ্রাসনের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করে। সারা বিশ্বের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমাদের ভাগ্যলিপি হয়ে যায়। তারপর সেই কুক্ষণও এল, যখন আমরা আমাদের কলিজার টুকরাদেরকে নিজ হাতে বাঘের মুখে তুলে দেই। রমজি ইউসুফের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হয়? আইমাল কান্সিকে কারা দুশমনের হাতে সোপর্দ করে? হায়! এই কুক্ষণ আসার আগে যদি জমিন বিদীর্ণ হয়ে যেত! মিল্লাতের ও গায়রতের জানাযা যদি আসমান না দেখতে পেত! হায়! এমন সময় আসার পূর্বে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।

সুধী পাঠক! ভেবে দেখুন তো, যখন কালিমা পাঠকারী মুসলমানরা রমজি ইউসুফকে ধরে ক্রুশ পূজারীদের হাতে তুলে দেয়, তখন তার ও তার মায়ের অন্তরে কেমন অবস্থা বিরাজ করছিল। প্রত্যেক বীর মুসলমানকে হৃদয় বিদীর্ণকারী এ দৃশ্য কি দেখতে হবে? ইসলামের সিংহ প্রসবকারিণী প্রত্যেক মাতাকে কি এ অলুক্ষণে দৃশ্য দেখতে হবে? আফসোস! শত আফসোস! মুসলমান আজ নিজ ভাইয়ের সংরক্ষক নয়, বরং দালালে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর কসম! কোটি কোটি কাফেরের জুলুম একদিকে আর মুসলমান পক্ষের জুলুম একদিকে, যে জুলুম ঈমানকে বিপদে ফেলে এবং কুফরী শক্তির সাহস বৃদ্ধি করে।

এ দৃশ্য অবলোকন করে আজ হুংকার দিয়ে শায়খ উসামা বিন লাদেনকে চাওয়া হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে ইণ্ডিয়ান মুশরিকরা পাকিস্তান সরকারের নিকট সেই সাতজন মুসলমানকে চাওয়ার সাহস পেয়েছে, যারা ভারতের অসম্পূর্ণ তথ্যমতে তাদের বিমান হাইজ্যাকের সাথে জড়িত ছিল। আফসোস! শত আফসোস! যে ইণ্ডিয়ার প্রতি কোণে ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমন আশ্রয় নিয়ে আছে, যার প্রত্যেক শহরে মুসলমানদের ঘাতক বাস করে, মুসলমানদের নিকট তাদেরই মুসলমান

ভাইদেরকে জবেহ করার জন্য মূর্তি পূজারীদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী করার সাহস তার কি করে হল?

আলহামদুলিল্লাহ! আবার দৃশ্যের পট পরিবর্তন হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি জন্ম নিয়েছেন, যিনি শুধু মুখে নয় অন্তর দিয়ে কালিমা পড়েছেন। কালিমার সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। জ্বি হ্যাঁ, এ যুগের কালিমার মর্যাদা রক্ষাকারী মহান ব্যক্তিত্ব মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর। তিনি পুনরায় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন, হে আল্লাহর দুশমনেরা! উসামা বিন লাদেনকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিব না। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হলেন আফগানী, আর ওসামা বিন লাদেন হলেন আরবী। কালিমার বন্ধন পুনরায় চমকাচ্ছে এবং তার শক্তি দেখাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ সত্যের বিজয় হবে। তবে আফগানিস্তানের ক্ষতি হলেই বা কি? কালিমার খাতিরে একটি নয় হাজার হাজার দেশ কুরবান করা যায়। দেশ আর জান তো এমনিও ধ্বংস হয়ে যাবে। আসল বস্তু হলো মতাদর্শ। মোল্লা ওমর আপনার এই সুউচ্চ অবস্থানের কারণে আপনাকে কোটি কোটি বার মোবারকবাদ।

কিন্তু পাকিস্তান ভবিষ্যতেও কি কালিমার পণ্যে পরিণত হবে? এ বিশাল দেশে কালিমার সম্মান এবং কালিমার বন্ধনের হেফাজতকারী কি একজনও নেই? এদেশে কি কালিমাকে ক্রুশধারীদের বুট আর মুশরিকদের জুতার নীচে এভাবেই পিষ্ট করা হবে? এমনটি না হয়ে থাকলে সমস্ত পাকিস্তানীকে অতীত পাপের জন্য মাফ চেয়ে ঘোষণা করতে হবে যে, ওহে মূর্তি পূজারীরা! সাতজন তো দূরের কথা, একজন মুসলমানকেও তোমরা এদেশ থেকে নিতে পারবে না। কারো হাত আমাদের মুসলমান ভাইদের দিকে উঠলে সে হাত আমরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবো। পাকিস্তানের ভাইয়েরা! লাঞ্ছনার জীবনের চেয়ে সম্মানের মৃত্যু উত্তম। হে আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান! সম্মুখে অগ্রসর হও এবং ঐসব জিহ্বাকে মুখ থেকে ছিঁড়ে ফেল, যেগুলো তোমাদের নিকট মুসলমান ক্রয়ের দাবী করে।

হে পাকিস্তানবাসী! কিয়ামতের দিন শুধু মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরেরই হিসাব হবে না। সেদিন সবাইকে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তাই আমরা সবাই কেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হই না? আল্লাহর দরবারে যারা আল্লাহর নামের হেফাজতকারী এবং তার কালিমার মর্যাদা রক্ষাকারী বলে গণ্য হয়েছেন তাদের তালিকায় আমাদের নাম লিখাই না কেন?

আকাবিরদের সবর ও শোকর

রোগব্যাধি সবারই হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর সৌভাগ্যবান বান্দারা এর ফলে এমন কিছু লাভ করে থাকেন, সাধারণ মানুষ যা সুস্থাবস্থায়ও লাভ করতে পারে না। বস্তুত আল্লাহর নৈকট্য, তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর মা'রেফাত এক মহান নিয়ামত। এ নিয়ামতের বদৌলতে মানুষ সুস্থাবস্থায়ও আল্লাহর রহমতের অনন্ত ভাণ্ডার লাভ করে থাকে এবং রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও আল্লাহর খাজানা থেকে নিজের ঝুলি পূর্ণ করতে থাকে।

আমি হযরত আকদাস ফকীহুল আসর মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেব (মুঃ যিঃ)এর খেদমতে যাই। হযরতের গলার আওয়াজের সমস্যার কথা বেশ কিছুদিন ধরে শুনছিলাম, তাই হযরতের আরামের প্রতি লক্ষ্য করে ফোনেও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। তবে হযরতকে দেখার জন্য নিজে উপস্থিত হওয়ার সংকল্প করি। করাচী পৌঁছেই আমি দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ–এ হাজির হই। হযরতকে দেখতেই সব দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ, তিনি পূর্ববৎ প্রাণবন্ত এবং পুলকিত। আসর নামাযের পর তিনি উপস্থিত লোকদের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। তার পর তাঁর পক্ষ থেকে একটি লিখিত কাগজ পড়ে শোনানো হয়। তারপর আলিমদের মজলিসে প্রদত্ত বয়ান শোনানো হয়। এ সব কিছু শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে, হযরত অসুস্থ অবস্থায়ও আল্লাহর ভালবাসার স্বাদ অঞ্জলী ভরে নিচ্ছেন। তিনি পূর্বাধিক আল্লাহর শোকর আদায় করছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে পাঠ করা লিখিত কাগজ এবং প্রদত্ত বয়ানে রোগের চেয়ে অধিক আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের আলোচনা ছিল। তিনি এজন্য বার বার শোকর আদায় করছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা

এখনও আমার দ্বারা তাঁর কাজ নিচ্ছেন। তাঁর দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করছেন।

হযরত আকদাসের পরশমণিতুল্য মজলিস প্রায় ২৫ মিনিট সময় অব্যাহত থাকে। তাতে তিনি মা'রেফাত, সবর ও শোকরের মুক্তা বিলাতে থাকেন। হযরতের এ কথাগুলো এখনও আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে যে, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি তো সেই রবই আছ, আর আমি তো সেই বান্দাই আছি। তুমি তো সেই সত্তাই, যে এতদিন পর্যন্ত আমার উপর অসংখ্য নিয়ামত বর্ষণ করেছ। আর আমি তোমার সেই বান্দাই, যে তোমার এত নিয়ামত লাভ করেছি। তুমি তো অপরিবর্তনীয়, তোমার বান্দা যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে তুমি তাকে পূর্বের মত বানিয়ে দাও।'

সুবহানাল্লাহ! কথাগুলোতে মা'রেফাত, মুহাব্বাত এবং বিনয় ও নম্রতার অনন্ত ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা হযরতকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে আরও অধিক দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। এই মজলিসে হযরতকে দেখার উদ্দেশ্যে আমি হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু মজলিস চলাকালে হযরতকে মাশাআল্লাহ বেশ সুস্থ মনে হচ্ছিল, আর নিজেকে মনে হচ্ছিল রোগী। আমি যেন এখানে ঔষধ নিতে এসেছি। আল্লাহর দরবারে দুআ করছি, তিনি যেন এ মোবারক মজলিসকে আমার জন্য ও অন্যান্য উপস্থিত লোকদের জন্য সত্যই ঔষধ বানিয়ে দেন। আমীন।

করাচী সফরকালে হযরত আকদাস আরেফ বিল্লাহ মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব (মুঃ যিঃ)এর এয়াদতের (দেখা ও সেবা শুশ্রূষা) জন্য যাই। কিছুদিন ধরে তাঁর দেহের একাংশ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। আশরাফুল মাদারিসে গিয়ে অনতিবিলম্বে হযরতের খেদমতে হাজির হই। তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে শেকায়েতের পরিবর্তে শোকর জারি ছিল। সালাম মুসাফাহার পর বললেন ঃ সুস্থতাও একটি নিয়ামত এবং অসুস্থতাও একটি নিয়ামত, কিন্তু আমরা দুর্বল বিধায় দুআ করি যে, আল্লাহ যেন অসুস্থতার নিয়ামতকে সুস্থতার নিয়ামতে পরিবর্তন করে দেন। আমরা আমীন বললাম। কারণ, এ দুআ কবুল হওয়ার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং অগণিত মানুষের দ্বীনী,

ঈমানী এবং রূহানী ফায়দা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত হাকীম সাহেবকে সুস্থতা এবং নিরাপত্তা দান করুন, আমীন, ছুম্মা আমীন।

করাচী থেকে ফেরার পথে জানতে পারলাম যে, হযরতে আকদাস মুফতী আবদুস সাত্তার সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুও অসুস্থ। তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। সংবাদ শুনতেই অনতিবিলম্বে জামিআ খাইরুল মাদারিস মুলতানে যাই। খাদেমগণ হযরতকে অবহিত করলে তিনি সাক্ষাত রুমে আসেন। স্নেহ ও ভালবাসা ভরে দীর্ঘক্ষণ মোয়ানাকা করলেন। নানারকম সংবাদ শুনে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু হযরত মুফতী সাহেবকে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা ও শোকরের মধ্যে নিমজ্জিত পাই। তাঁর চোখের অসুখ ছিল। এখন কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এক চোখ পুরা খুলতে পারেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন। খুব মুহাব্বতের সাথে জিহাদ ও মুজাহিদদের হালত শুনতে থাকেন এবং খুব আবেগ নিয়ে দুআ করতে থাকেন।

আমি তাঁর খেদমতে আরয করি যে, আমরা আমাদের সংগঠনকে শরীয়তের মূলনীতির উপর দাঁড় করাচ্ছি। শরীয়ত পরিপন্থী এবং অসমীচিন অনেক পদক্ষেপ নিষিদ্ধ করছি। একথা শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন। অনেক দুআ দিলেন। বললেন, ভাই! আসল জিনিস তো দ্বীন। সংগঠন, দল ও সংস্থা আসল নয়। আসল হল আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা। তাঁর দ্বীনের উপর আমল করা। অন্যান্য বস্তু মাধ্যম বা উপকরণ মাত্র। সবশেষে দুআ হল। আমরা সবাই হযরতের হস্ত চুম্বন করে বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় মুহূর্তে তাঁর ভালবাসাপূর্ণ আচরণের স্বাদ হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর গৃহ থেকে বের হয়ে আসি।

সর্বত্র যখন অকৃতজ্ঞতার ব্যাধি ছড়িয়ে আছে, তখন রোগ অবস্থায় আমাদের আকাবেরদের সবর ও শোকর আমাদের জন্য বিরাট বড় শিক্ষার বস্তু। এমনিভাবে বর্তমানে সামান্য কষ্টেই দ্বীনের কাজ পরিত্যাগ করার ব্যাধিও ব্যাপক দেখা যাচ্ছে। জীবনের আসল উদ্দেশ্য ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বানানো হচ্ছে। অথচ আমি দেখেছি যে, আকাবিরদের নিকট প্রধান ফিকির ছিল দ্বীনের খেদমত। চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের ছিল।

হে মুসলমান! আকাবিরগণ আমাদের মতই মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা ও ভালবাসা তাঁদেরকে এ স্তরে উপনীত করেছে। তাই আমরাও কেন আজ থেকে তাঁদের এ পবিত্র অভ্যাস বাস্তবায়ন করছি না? রোগব্যাধি ও পেরেশানীর মধ্যেও কেন আল্লাহর মুহাব্বত ও মা'রেফাতের স্বাদ গ্রহণ করছি না? নাশোকরীর ব্যাধি থেকে বেঁচে সবর ও শোকরের স্বাদ আস্বাদন করছি না কেন? আকাবিরদের সবর ও শোকর আমাদেরকে এমন বরকতপূর্ণ জীবন পদ্ধতি বাস্তবায়নের শিক্ষাই দান করে।

অধিক কাজ করার পন্থা

গত সপ্তাহে চেষ্টা সত্ত্বেও 'মা'রেকা' কলাম লিখতে পারিনি। অন্যান্য ঝামেলায় লেখা হয়ে উঠেনি। সেজন্য মুহতারাম পাঠকদের নিকট ওজরখাহি করছি। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) মাদরাসায় প্রতি মাসের প্রথম পাঁচদিন অতিবাহিত করার একটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, এতে কিছু অবসর সময় লাভ করতে পারব। সেই অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে কলম কাগজের বন্ধনকে বহাল রাখার সুযোগ হবে। কিন্তু সে আশা আজও অতৃপ্তই রয়ে গেল। কারণ গত দুই মাসে এ পাঁচদিন সময়ও নানা রকম ঝামেলায় পার হয়ে যায়। সাক্ষাতপ্রার্থীদের ভীড়, জলসায় দাওয়াতকারীদের বিশৃঙ্খলা, রণাঙ্গনের সমস্যা এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজ আমাকে সব সময় ঘিরে রাখে। দু'বারই আমি 'মুসকারাতে জখম' (কাশ্মীর রণাঙ্গনে) কিতাবটির পাণ্ডুলিপি সাথে নিয়েছি। এ পাঁচদিনে তা পুনরায় দেখে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাও হয়ে উঠেনি। অথচ কাজটি শেষ করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। সুধী পাঠকের সমীপে আবেদন, তারা যেন আমার জন্য এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দুআ করেন, যেন কলমের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে আমার ব্যাপক মোলাকাত নসীব হয়। এ পর্যায়ে এসে আকাবিরদের কার্যাবলী এবং তাঁদের সময়ের বরকত দেখে অন্তহীন ঈর্ষা জাগে। কয়েকদিন পূর্বে করাচীতে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব মুদ্দাজিল্লুহু এর সঙ্গে মোলাকাত হয়।

তিনি এ যুগের মুসলমানদের জন্য যে আল্লাহর বিরাট একটি নেয়ামত তাতে সন্দেহ নাই। তাঁর আন্তরিক ও আবেগপূর্ণ দুআ আমাকে অনেক ভরসা দেয়। তাঁর অবস্থা দেখে আমি অভিভূত হই এবং আনন্দিতও হই যে, মাশাআল্লাহ তিনি দরস দানের প্রাণান্তকর মেহনত, সুপ্রিম কোর্টের বিশৃঙ্খল ব্যবস্থায় দায়িত্ব পালন, ওয়াজ-উপদেশ উপলক্ষ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করা সত্ত্বেও লেখার ধারাবাহিকতা খুব যত্নের সাথে এবং জোরেশোরে রক্ষা করে চলেন। প্রতিদিন তাঁর অমূল্য গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ফয়েয অব্যাহত রাখুন।

তারপর গুজরানওয়ালা সফরকালে মুহাক্কিকুল আসর হযরত আকদাস মাওলানা সারফরায খান সফদর সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুর খেদমতে হাজির হই। মাশাআল্লাহ তিনি বার্ধক্য ও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও খুব অবিচলতার সঙ্গে দ্বীনের খেদমত এবং তা'লীম ও তায়াল্লুমের কাজ অব্যাহত রেখেছেন দেখে পরম আনন্দিত হই। আল্লাহ তাআলা হযরতকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। তাঁর ফয়েয সর্বদা অব্যাহত রাখুন।

সারগুদা সফরকালে সুদূরবর্তী সাহিওয়াল শহরে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুফতী আবদুশ শুকুর তিরমিযী সাহেব (মুঃযিঃ)এর সঙ্গে মোলাকাত হয়। তিনি এ বৃদ্ধ বয়সেও আহকামুল কুরআনের ভূমিকা এবং হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী (রহঃ)এর 'তাকরীরে বুখারী' লিখছেন। তাঁর দ্বীনী খেদমতের তৎপরতা দেখে আমার ঈমান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ পাক তাঁর কল্যাণময় শ্রমকে কবুল করুন।

বস্তুত এঁদের সাহস, সাধনা ও ধর্মীয় কাজে নিবিষ্টতা দেখে যেমন ঈর্ষা জাগে, তেমনি দুর্বল অন্তরে সাহসও সঞ্চার হয়। সাথে সাথে মনে হয় যে, আমার বন্ধুরা যদি আমার কাজকে বিন্যস্ত করতে সহযোগিতা করতো এবং কাজ বন্টন করে নিজেরাও কিছু কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতো, তাহলে দ্বীনের অধিক থেকে অধিক কাজ মজবুতভাবে করা সম্ভব হতো। সভা-সম্মেলনে অধিক সময় ব্যয় না করে জিহাদের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করা এবং মুজাহিদদের জন্য এমন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যার ফলে দীর্ঘদিন সহজভাবে জিহাদের কাজ অব্যাহত থাকবে—সময়ের দাবী।

এমনিভাবে জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য অধিকহারে চিন্তা ও আদর্শের উপকরণের ব্যবস্থা করা, মুজাহিদদের চেতনার পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কেন্দ্র, মাদরাসা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জাল বিস্তার করাও খুব জরুরী।

প্রত্যেক শহীদের জানাযায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে শহীদদের মিশনকে গতিশীল রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাদের পরিবার পরিজনের যথাযথ ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা অতীব জরুরী। এমনিভাবে জিহাদের প্রত্যেক শাখাকে মজবুত মূলনীতির উপর সংগঠিত করাও জরুরী। যাতে করে মালের খিয়ানত এবং সময়ের অপচয়ের মহা অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এখানে এ বিষয়টির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা দরকার যে, জিহাদের কাজে প্রচুর পরিমাণে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়। এজন্যই কুরআন ও হাদীসে জিহাদে সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত খুব গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, বড় বড় সমাবেশ হতে থাকল, র‍্যালী বের হতে থাকল, শহীদদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভ্রমণ চলতে থাকল এবং মাদরাসার জলসাসমূহে অংশ গ্রহণ চলতে থাকল কিন্তু সেনানিবাসে প্রশিক্ষণরত মুজাহিদদের খাবার থাকল না, রণাঙ্গনে লড়াইরত মুজাহিদদের গুলি থাকল না, জিহাদে আহত ব্যক্তিদের ঔষধ ও হাসপাতালের ব্যবস্থা থাকল না, তাহলে জিহাদ কিভাবে চালু থাকবে? বিধায়, মুজাহিদ এবং জিহাদকে মুহাব্বতকারী মুসলমানদের সমীপে নিবেদন এই যে, তারা যেন এসব সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাভাবনা করেন।

এমন যেন না হয় যে, একজন ব্যক্তিকে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বক্তৃতার কাজে ব্যস্ত রাখা হল। পাঁচ মিনিট করে সময় দেওয়ার জন্য শত শত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। সভা-সম্মেলনের ব্যস্ততায় শ্বাস গ্রহণের সময় দেওয়া হল না, অপরদিকে তার নিকট ট্রেনিং সেন্টারে খাদ্য সামগ্রী পৌছানো, রণাঙ্গনে মুজাহিদদের নিকট রসদ পাঠানো, পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লেখা, মোয়ানাকা ও মুসাফাহার নামে হাজার হাজার লোকের ধাক্কা খাওয়া এবং প্রত্যেকের দাওয়াতেই লাব্বাইক বলে তার জলসায় হাজির হওয়ার দাবীও জানানো হল। দুআ করি, আল্লাহ

তাআলা যেন সমস্ত কাজকে অব্যাহত রাখেন। কোন কাজেই যেন বিঘ্ন না ঘটে।

তবে যোগ্য লোকেরা মাঠে এসে কাজ বন্টন করে নিলে কেবল তখনই সব কাজ নির্বিঘ্নে চলা সম্ভব। কেউ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণরত সাথীদের খাদ্যের দায়িত্ব নিল, কেউ রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ করল, কেউ আহতদের জন্য হাসাপাতাল তৈরীর জন্য ব্যস্ত থাকল (সত্ত্বরই এমন একটি হাসপাতাল মুজাফফরাবাদে চালু করা হবে, ইনশাআল্লাহ)। কেউ শহীদদের উত্তরাধিকারদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করল। আর কেউ বক্তৃতা ও লেখার ময়দানে নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করল। আর যেসব মুসলমান এর কোনটাই করতে সক্ষম নয়, তারা যেন এসব কাজে কমপক্ষে বাধা সৃষ্টি না করে। তাদের দাওয়াত গ্রহণে অপারগতা জানালে হাসিমুখে যেন তা মেনে নেয়।

জীর্ণগৃহের পরিচর্যা করুন

সম্প্রতি পাঞ্জাব সফরকালে কয়েকজন শহীদের গৃহে যাওয়ার সুযোগ হয়। সর্বত্রই আমি শহীদের পিতা ও পরিবারের অন্যান্য লোকদেরকে আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে ও আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে দেখেছি, যা শহীদদের জিন্দা কারামত। জামেয়া নুসরাতুল উলূম গুজরানওয়ালার মেহমানখানায় একজন বর্ষিয়ান ব্যক্তি হাস্যোদ্বীপ্ত চেহারায় আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি এক ছেলেকে কবুল করেছেন এখন আমি অপরজনকে তৈরী করেছি।'

শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এ বর্ষিয়ান ব্যক্তির মুখমণ্ডলের বিকীর্ণ হাসি ও প্রশান্তি বিশ্বের বড় বড় বিত্তশালীরা তাদের সমগ্র ধনভাণ্ডার ব্যয় করেও ক্রয় করতে পারবে না। আর ইনশাআল্লাহ তিনি আখেরাতে যা লাভ করবেন, তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

সাহিয়ওয়ালে শহীদ নাবিদ (রহঃ)এর গৃহে গিয়ে তার সম্মানিত পিতাকে ঈমানী জযবায় উজ্জীবিত দেখতে পাই। তিনি বার বার আল্লাহর শোকর আদায় করছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে আনন্দ ঝরে পড়ছিল।

তাঁর শহীদ ছেলের লাশ যখন সাহিওয়ালে আনা হয়, তখন তিনি সফরে ছিলেন। লাশ নিয়ে কবরস্থানে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি এসে পৌঁছেন। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে একটি বিষয় দেখতে দাও। তারপর তিনি শহীদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে আলহামদুলিল্লাহ পড়তে থাকেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আমার সন্তানের দেহের কোন্ স্থানে গুলি লেগেছে তা দেখতে চাচ্ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! শেষ বিদায়কালে আমি ললাটের যে জায়গায় চুম্বন করেছিলাম সেখানেই গুলি লেগেছে। তিনি আরো বলেন যে, আমার ছেলে প্রত্যেকবার আমার নিকট তার শাহাদাতের জন্য দুআ করার দরখাস্ত করত, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমি তা এড়িয়ে যাই। শেষবারে সে জিহাদের ফযীলত শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে এজন্য উদ্বুদ্ধ করে। তখন আমি তার জন্য শাহাদতের দুআ করে তার কপালের একদিকে চুম্বন করি। আল্লাহ পাক আমার দুআ কবুল করেছেন। আমি যেখানে চুম্বন করেছিলাম ঠিক সেখানেই গুলি লেগে সে শাহাদাতের মহান মর্যাদা লাভ করেছে।

সাহিওয়ালে জাইশের স্থানীয় সদস্যরা সাহিওয়াল জেলার সম্মানিত শহীদদের আপনজনদের সাথে মোলাকাতের প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন। সে মজলিসে সাহিওয়াল জেলার প্রায় পঁয়ত্রিশজন শহীদের আপনজনেরা এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে ঐ জেলার সত্যের পথে বন্দীদের পরিবার পরিজনের সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা এবং দুআর পর তাদেরকে জিহাদ বিষয়ক কিতাবের একটি করে সেট প্রদান করা হয়। তাদের মুখাবয়বেও ঈমানের মধুরতা এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সুস্পষ্ট ছিল। বুরেওয়ালা; আরেফওয়ালা এবং সারগুদাতেও কয়েকজন শহীদের বাড়ীতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। বেশীর ভাগ শহীদই তাদের অন্তিম অসীয়তে আপনজনদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে, মুজাহিদরা তাদের শাহাদাতের খবর নিয়ে এলে তাদেরকে যেন মিষ্টিযোগে আপ্যায়ন করা হয়।

এখানে ভাববার বিষয় এই যে, সাধারণত তরুণ সন্তানের মৃত্যুবেদনা মাতাপিতাকে জীবন্ত-মৃত করে ফেলে। তারা বহু বছর ধরে সে বেদনার

বোঝা বহন করে থাকে। সে বেদনা পরিবারের আনন্দ–উল্লাস ছিনিয়ে নেয়। কারণ, তাদের তরুণ সন্তানের জানাযা তাদের চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এটি শাহাদাতের কারামাত যে, শহীদ সন্তানদের রক্তস্নাত চেহারা মাতাপিতার হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে না, বরং তাদের প্রশান্তির কারণ হয়। শহীদদের ঘরে শোকের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা উদযাপন করা হয়। মুসলিম উম্মাহর এই যুবকদের বৃদ্ধ মাতাপিতা আল্লাহর দরবারে অনুযোগের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বদদ্বীন লোকদের তিরস্কার সহ্য করেও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। নিশ্চয়ই এটি শহীদের মাতাপিতা ও পুরা মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট সৌভাগ্য।

কিন্তু আমাকে অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমি অধিকাংশ শহীদের ঘরে দরিদ্রতা ও রিক্ততা দেখতে পেয়েছি। এ অবস্থা দেখে আমার হৃদয় সীমাহীন দুঃখিত ও লজ্জিত হয়। কোথাও ঘরে ছাদ নেই, কোথাও দেয়াল বিধ্বস্ত, কোথাও বৃদ্ধ মাতাপিতা ঋণের দায়ে জর্জরিত, কোথাও যুবতী মেয়ে নিয়ে মাতাপিতা সমাজের অসার ও অন্যায় যৌতুক প্রথার ভারে আক্রান্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের কাঁচা গৃহ থেকে উম্মতের সেই গর্বিত তরুণদের দাঁড় করিয়েছেন, যাদের রক্তের বিনিময়ে পাকা মসজিদ এবং পাকা ঘরসমূহ অক্ষত রয়েছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর চরম গাফেল সদস্যরা তাদের কাঁচা গৃহের মূল্য দিচ্ছে না। তাদের কাঁচা গৃহ উম্মাহর নির্জীবতার অভিযোগ করে ভেঙ্গে পড়ছে। উম্মাহর শহীদদের জন্মদাতা বৃদ্ধ মাতাগণ খোলা আকাশের নীচে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। জীবন্ত জাতিসমূহ কি তাদের বাহাদুর সন্তানদের সঙ্গে এমন আচরণই করে থাকে? ইসলামের মুহাফিজদের গৃহ কি নিজের হেফাজতের জন্য এভাবেই পথ চেয়ে থাকবে?

যে কোন দেশের উর্দি পরিহিত কোন সৈন্য মারা গেলে সে দেশের সরকার তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়। কোন খেলোয়াড় মারা গেলে তাদের পরিবারের জন্য ক্রীড়া সংগঠনসমূহ বিভিন্নরকম প্রোগ্রাম করে। কোন নর্তকী–গায়িকা মারা গেলে সে পেশার লোকেরা তাদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। ইহুদী সংগঠনগুলো তাদের বাড়ীতে স্বর্ণের

বৃষ্টি বর্ষণ করে। কিন্তু ইসলামের নামে একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা কুরবানী পেশ করে, মুসলিম উম্মাহর হেফাজতের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করে, তাদের পরিবারের ভার কার দায়িত্বে?

কে ভাববে? কে চেষ্টা করবে? কেউ ঘরে কুকুর পালছে, কেউ ভবিষ্যৎ সাত প্রজন্মের জন্য ব্যাংক একাউন্ট পূর্ণ করছে, কেউ নিজের বিলাসিতার পিছনে পানির মত পয়সা ব্যয় করছে। কেউ নির্মিত মসজিদ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করছে। কেউ নিজের মনোবাসনা পূরণে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করছে। কেউ নফল এবাদতের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে।

হায়! আজ যদি ইসলামী হুকুমাত থাকত, যা শহীদদের পরিবারের মূল্য উপলব্ধি করত এবং তাদের দায়িত্ব বহন করা নিজের জন্য প্রধান ফরয কাজ মনে করত। হায়! মুসলমানদের বক্ষে যদি কুরআনে বর্ণিত দ্বীনের মর্যাদা থাকত, তাহলে তারা জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করত, শহীদদের মর্যাদা উপলব্ধি করত এবং তাদের পরিবার পরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। হায়! ধনীদের বক্ষে যদি মুসলমান হৃদয় থাকত, তাহলে একেক ব্যক্তি দশ দশ পরিবারের ব্যয় সহজেই বহন করতে পারত। হায়! জিহাদের গুরুত্ব যদি যথার্থভাবে তুলে ধরা হত, তাহলে আজ এ ব্যাপারে উৎসাহদানের প্রয়োজন হত না।

হায়! মুসলমানরা যদি এ যুগের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করত এবং নিজের জানমালের কুরবানীকে সৌভাগ্য মনে করত! কেননা, আমাদের সম্মুখে সত্বর রক্তাক্ত লড়াইয়ের যুগ আসছে। এমন যুগ, যখন মৃত্যু ব্যাপক আকার ধারণ করবে। খুন খারাবী প্রত্যেককে আঁচলে জড়িয়ে ফেলবে। রাতের অন্ধকারের ন্যায় ফেতনা আচ্ছন্ন হবে। তখন তো বাধ্য হয়ে লড়তে হবে এবং অপারগ হয়ে লড়াইয়ের পথে নামতে হবে। পক্ষান্তরে বর্তমানে জিহাদ একটি ঐচ্ছিক নিয়ামত। জিহাদে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া নিজের জন্যই কল্যাণকর। সুধী পাঠক, সম্মুখে অগ্রসর হোন। নিজেও জিহাদের ময়দানের পথিক হোন এবং শহীদদের পরিবার পরিজনের জন্য আপনার যা কিছু করা সম্ভব তার সবই করুন।

দুটির যে কোন একটি

অনেকেই বলেন যে, বর্তমান যুগে দ্বীনের কাজ করার জন্য প্রচার মাধ্যম তথা প্রেস ও মিডিয়াকে খুশী রাখতে হবে। বর্তমান যুগ মিডিয়ার যুগ। প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগানো ছাড়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। জাইশে মুহাম্মাদ (নামক মুজাহিদ বাহিনী) প্রতিষ্ঠা করার পর বন্ধুরা জোরে শোরে এ দাবী করছে। যেন জাইশের তৎপরতা পত্রপত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করতে পারে। অথচ আমাদের অবস্থা এই যে, জাইশের যেসব তৎপরতায় ভারতের সংবাদ জগত প্রকম্পিত হয়, পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় সেগুলো স্থান পায় না। ফলে জাইশের লক্ষ লক্ষ সুহৃদ হতাশ হচ্ছে। বন্ধুদের এ পরামর্শ ও দাবী যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হল মিডিয়াকে কিভাবে খুশী করা যাবে?

মিডিয়ার কাজ যদি সংবাদ অন্বেষণ করা ও তা প্রচার করা হত তাহলে আমাদের পেরেশানীর কারণ ছিল না। স্বচ্ছ সাংবাদিকতার প্রসার ঘটানো যদি মিডিয়ার লক্ষ্য হত, তাহলে আমাদের কোন ঝামেলা ছিল না। মিডিয়ার কাজ যদি সত্য ও ন্যায় প্রচার করা হত, তাহলে আমরা অবশ্যই মিডিয়ায় আসার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে সাংবাদিকতা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। যে ব্যবসায় লটারীর মত দ্রুত বিরাট মুনাফা করা যায়। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অধিকাংশ সাংবাদিক নিজেদের মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। বিধায় বর্তমান যুগে মিডিয়াকে সন্তুষ্ট করার প্রথম শর্ত আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করা। তবে যেসব সংগঠনের জীবন ধারণের জন্য মিডিয়ার অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে, তারা সাংবাদিকদের সন্তুষ্ট করার কাজে বিরাট অংকের পুঁজি ব্যয় করে। গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাসমূহে বিবৃতি ছাপানোর জন্য টাকার অংক নির্ধারিত আছে এবং নিজের পছন্দ সই কলামে ছাপানোর জন্যও পৃথক মূল্য ধার্য করা আছে।

তথাকথিত প্রতিবেদন লেখক ও কলামিষ্টরা বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির কৃপাতলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রতিবেদন লিখে থাকে। তারা অতি দ্রুত উন্নতির সোপানের উচ্চ মার্গে আরোহণ করে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নিজেদের মিডিয়া সেল প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা বিরাট

অংকের পুঁজি ব্যয়ে নিজেদের দলকে পত্রিকার বুকে জীবিত রাখে। বিভিন্ন পত্রিকা ও সাংবাদিকের সেবা গ্রহণ করে। আপনারা দেশের জাতীয় পত্রিকাসমূহে সেসব রাজনীতিকদের বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দেখতে পান, যারা মিডিয়ার পিছনে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে থাকে। অথচ দেশের মাটিতে সেসব রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষক কিছু জংলী পশুর মত বিরল, স্বল্প কিংবা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। এসব রাজনীতিক কোথাও দশজন লোককে সম্মিলিত করলে পত্রিকার বড় কলাম তাদের জন্য রিজার্ভ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা মিডিয়াকে খুশী করতে পারে না, তারা লক্ষ মানুষের সম্মেলন করলেও কোন পত্রিকায় তাদের সমাবেশের আলোচনা দেখা যায় না।

এমতাবস্থায় অনেক মানুষ তাদের সেবা দানের জন্য মাঠে নেমে বলেন যে, আপনারা পকেট থেকে কিছু বের করুন। তাহলে পত্রিকার চেহারাই অন্য রকম দেখতে পাবেন। যেমন—ফাইভ ষ্টার হোটেলে সাংবাদিকদেরকে একবেলা ভাল খাবার কিংবা একবার চা ও চমচম খাইয়ে দিন কিংবা কোন কলামিষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে তার নিজস্ব সমস্যার সমাধান করে দিন অথবা আর কিছু না হলেও পত্রিকার অফিসে ঘোরাঘুরি করতে থাকুন, তাদের অভিমান ও ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করুন।

কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কথা চিন্তা করেন যে, আমরা এসব কেন করব? জিহাদের তহবিলের অর্থ এসব উদ্দেশ্যে ব্যয় করা জায়েয হবে কি? সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে ঘুষের মত কবীরা গুনাহ করার বৈধতা আছে কি? কোন কোন পত্রিকার নেতিবাচক প্রোপাগাণ্ডা ও তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য পত্রিকা ব্যবহার করা, নিজের সময় ও পুঁজি নষ্ট করা জায়েয হবে কি? এসব প্রশ্নের উত্তর যে নেতিবাচক তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবেও দ্বীনের কাজ মিডিয়ার মুখাপেক্ষি নয়। তবে খোদ মিডিয়া অনেক সময় এসব দ্বীনী কাজের উল্লেখ করতে বাধ্য হয়।

তাবলীগ জামাতের বিশ্বব্যাপী কাজ জাতীয় প্রচার মাধ্যম থেকে দূরে থেকে এবং অনেক সময় মিডিয়ার অবৈধ বিরোধিতা সহ্য করেও

আলহামদুলিল্লাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বীনী মাদরাসাসমূহ (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) জাতীয় প্রচার মাধ্যম থেকে সব সময় বিচ্ছিন্ন থেকেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের শিকড় ভূমির তলদেশে এবং শাখা-প্রশাখা আকাশের উচ্চতায় পৌঁছেছে। আত্মশুদ্ধির নির্ভেজাল ইসলামিক কেন্দ্রসমূহের নূর মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়াই চতুর্দিগন্তে বিস্তার লাভ করছে। আর সর্ববৃহৎ জিহাদের কাজ মিডিয়ার ন্যাক্কারজনক বিরোধিতা সত্ত্বেও এক অজেয় বাস্তবতারূপে দিগন্তের বুকে সূর্যের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

তাছাড়া বিশেষভাবে ভাববার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ব্যাপার এই যে, দ্বীনের একনিষ্ঠ কর্মীরা মিডিয়ার খাতিরে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট না করার ফলে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের প্রচার মাধ্যমকে সীমাহীন বরকত দান করেছেন। তাদেরকে এমন তারাক্কী দান করেছেন, যা কয়েক বছর পূর্বে ধারণাও করা যায়নি। যেমন সাপ্তাহিক 'যরবে মুমিন' এবং পাক্ষিক 'জাইশে মুহাম্মাদ'-এর পাঠক সংখ্যা লাখের কোঠা পার হয়ে যাচ্ছে। এখন এমন পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে যে, এ সংস্থা যদি দৈনিক পত্রিকা বের করে, তাহলে মুসলমানরা তাও হাতে হাতে নিয়ে নিবে। অশ্লীল চিত্র ও গল্প না থাকায় কোনরূপ লজ্জা ও আত্মমর্যাদা না খোয়ায়ে তা নিজ গৃহেও নিয়ে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে আজ লক্ষ লক্ষ মুসলমান দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো অশ্লীল ছবি ও বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ থাকার কারণে ঘরে নিয়ে যেতে লজ্জা ও অপমান বোধ করে থাকে।

আরো শোকরিয়ার ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা জাতীয় পত্রিকাসমূহ এবং সাধারণ সাংবাদিকতার পংকিলতার প্লাবনের মধ্যেও এমন নির্মল মানসিকতার লোক পয়দা করেছেন, যারা লালসা ও জাগতিক মোহ থেকে পবিত্র। যারা শুধু সত্য কথা লেখে এবং সত্যেরই অনুসরণ করে চলে। এই পরিস্থিতি অবলোকন করে আমাদের এ সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে যে, আমরা সাময়িক সমস্যা ও ক্ষণস্থায়ী ঝুঁকির পরোয়া করব না এবং প্রতিকূল পরিবেশে ভীত হয়ে মিডিয়ার দুর্বল ছাদের নীচে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে দেব না। কারো নেতিবাচক প্রোপাগাণ্ডায় ভীত হয়ে আমরা ইসলামের সোনালী

মূলনীতি হতে বিচ্যুত হব না।

এ ক্ষেত্রে পবিত্রাত্মা উম্মুল মুমিনীনগণ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীগণ উৎকৃষ্টতম আদর্শ। একবার তাঁদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করুক অথবা পার্থিব সাজসজ্জাকে গ্রহণ করুক। তখন আমাদের পূতপবিত্র সেই মাতাগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে গ্রহণ করেন। তাঁরা দুনিয়ার সাজসজ্জাকে পদাঘাত করেন। ফলে তাঁরা আল্লাহ, রাসূল ও ইহ-পরকালীন সার্বিক সফলতা সবকিছুই লাভ করে ধন্য হন।

আজ আমাদের সম্মুখেও দুটি পথ রয়েছে, আমরা হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করব আর না হয় মিডিয়াকে। এ স্থলে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলাকে খুশী করব। মিডিয়ার পরোয়া করব না। জিহাদের মালে খেয়ানত, ঘুষ ও ছবি উঠানোর মত অপরাধ করে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট এবং মিডিয়াকে সন্তুষ্ট করব না।

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, যদি আমরা আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকে খাঁটি অন্তরে এ অবস্থানে অবিচল থাকি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব। যেভাবে হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের ঘর থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন, তেমনিভাবে আমরাও ইনশাআল্লাহ বর্তমান মিডিয়ার পঙ্কিলতার মধ্য থেকে এমন ব্যক্তি ও পত্রিকাসমূহ লাভ করব, যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে এবং আখেরাতের চিন্তাকে সামনে রেখে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাবে।

মেলা শেষ হল

খুব জোরে শোরে জাতিসংঘের সম্মেলন শুরু হয়েছিল—তা শেষ হয়ে গেল। সম্মেলনকে 'সহস্র বর্ষ সম্মেলন' নাম দেওয়া হয়েছিল। অথচ জাতিসংঘের বয়স কয়েক শতাব্দীও নয়। কয়েক দশক মাত্র। কিন্তু খৃষ্টানরা বর্তমানে সব ব্যাপারেই নতুন সহস্রের নাম বসিয়ে নিজেদের

শক্তি, ক্ষমতা ও রাজত্বের প্রতাপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তারা বিশ্বাস করাতে চায় যে, আমরা পৃথিবীতে দু' হাজার বছর অতিক্রম করেছি। এখন তৃতীয় হাজার বর্ষে সমগ্র বিশ্বে ক্রুশ প্রতিষ্ঠা করব। এটি তাদের অলীক স্বপ্ন ও আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তবে ক্রুশধারীরা এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়েই থাকতে চায়। সুতরাং জাতিসংঘ তার ঐতিহ্যমত বার্ষিক সম্মেলনকে বিরাট রূপ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের চেলাদেরকে নিজ নিজ কর্ম প্রদর্শনের জন্য আহবান করে। অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান স্বভাবতই এ সুযোগকে সুবর্ণ সুযোগ এবং মহাসৌভাগ্য মনে করে স্বদেশ থেকে কোটি কোটি ডলারের থলে ভরে নিয়ে বড় বড় প্রতিনিধি দল সঙ্গে গিয়ে বড় খেলোয়াড়দের খেদমতে হাজির হয়।

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্মেলন আরম্ভ হয়ে চোখ ঝলসে দিয়ে তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু একথা বলতে কেউ প্রস্তুত নয় যে, এ সম্মেলন দ্বারা কোন মজলুম ব্যক্তির কি লাভ হয়েছে? কোন দরিদ্র ব্যক্তি কি শান্তি পেয়েছে? ইরাকের শিশুরা জাতিসংঘের দুয়ারে আজও বলি হচ্ছে। এ সম্মেলন তাদেরকে কি দিয়েছে? কাশ্মীর সমস্যা জাতিসংঘের জালেমসুলভ পলিসির কারণে ঝুলে আছে। সেখানে প্রত্যহ যে পঁচিশটি লাশ পড়ছে এ সম্মেলন তাদেরকে কি দিয়েছে? আফগানিস্তানের মুসলমানরা জাতিসংঘের অবিচারের ফলে নানারকম জটিলতার সম্মুখীন। অথচ রাতদিন যারা আফগানিস্তানকে ধ্বংস করছে, তাদেরকে জাতিসংঘের প্রধান দফতরসমূহে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এ সম্মেলন সেই আফগানিস্তানের বিধবাদেরকে কি দিয়েছে? সুদান ও লিবিয়ার মুসলমানরা জাতিসংঘের অবৈধ নিষেধাজ্ঞার কারণে অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। এ সম্মেলন সেই মজলুমদেরকে কি দিয়েছে? আফ্রিকা মহাদেশ জাতিসংঘের পলিসির শিকার হয়ে অসুস্থ, দুর্বল ও কঙ্কালসার মানবদের জনপদ হয়েছে। এ সম্মেলন তাকে কি দিয়েছে? জাতিসংঘের নিরাপত্তা বাহিনী মুসলিম দেশ সুমালিয়াকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিয়ে পালিয়েছে। এ সম্মেলন সুমালিয়ার শিশুদেরকে কি দিয়েছে?

সব প্রশ্নের উত্তর একটিই যে, জাতিসংঘ দেখতে যা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়। বরং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে

হীনচক্রান্তের যে কেন্দ্র অধুনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জাতিসংঘ তারই নাম। সুতরাং যেসব দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সামরিক আগ্রাসনের প্রয়োজন পড়ে, সেখানে জাতিসংঘ নিজে গণতন্ত্রের গলায় ছুরি চালায়। আর যেসব দেশে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুতার খেল-খেলা হচ্ছে, সেখানে জাতিসংঘ গণতন্ত্রের সংরক্ষক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শ্লোগানের মাধ্যমে জাতিসংঘ মুসলমানদেরকে শিকার করে থাকে। জাতিসংঘের কান পূর্ব তিমুরে সেনাবাহিনীর বুটের আওয়াজ শুনতে পায় কিন্তু তারা অধিকৃত কাশ্মীরে চালিত তোপের আওয়াজ শুনতে পায় না। জাতিসংঘের আফগানিস্তানের পর্দানশীন নারীদের পর্দা উন্মোচনের চিন্তা রয়েছে, কিন্তু ইরাকের ক্ষুধার্ত নারীদের ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।

বিশ্বের জ্ঞানীরা ভাবছিলেন যে, জাতিসংঘের সহস্রাব্দের সম্মেলন হয়ত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কিন্তু এ সম্মেলনও কাওয়ালী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক কাওয়াল অন্যের লেখা কাওয়ালী পাঠ করে। আর কাওয়ালের সাথে আগত দর্শকরা সেই কাওয়ালীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে। তারপর মিডিয়ায় টাকার বৃষ্টি বর্ষণ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, অমুকের সফর সফল হয়েছে, আর অমুকের সফর বিফল হয়েছে। অমুকের কাওয়ালী বেশী ভাল ছিল, আর অমুকের কাওয়ালী ছিল নিরর্থক। অমুকের সাথে অমুকের সাক্ষাত ফলপ্রসূ ছিল। আর অমুকের সাথে ছিল ব্যর্থ।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিশ্ব জাতিসমূহের এ প্লাটফর্মে বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আফগান জাতির কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না এবং সে প্লাটফর্মে কোন মজলুমের কোন কথা শোনা হয়নি। এতটুকু মাত্র কাজ হয়েছে যে, বড় একটি মেলা আরম্ভ হয়েছিল, বিমান কোম্পানীসমূহ টাকা উপার্জন করে। আমেরিকার হোটেলগুলো ডলারের স্তূপ গড়ে। সংবাদ জগতে ঢেউ বয়ে যায়। আমেরিকার পর্যটন কেন্দ্র ও মার্কেটগুলোতে প্লাবন বয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠীর কাছের সেক্রেটারীরা বাহবা পায়, আর ধমক খায়।

কয়েকদিন পর্যন্ত মিডিয়ায় সেই মেলার বাজনা প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু এর ফলে কোন অনাহারী ব্যক্তির আহার জোটেনি এবং জালেমদের জিন্দানখানায় বন্দী সন্তানদের প্রতীক্ষার দিন গণনাকারী মাতাদের প্রতীক্ষার মুহূর্ত শেষ হয়নি।

বোমা বিস্ফোরণ নাকি জিহাদের কম্পন

সম্প্রতি ইসলামাবাদের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ভীরু সাংবাদিকদের কলমকে 'বীর' বানিয়ে দিয়েছে। তারা জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে খুব লেখালেখি করছে। তারা দেশবাসীকে ভীতি প্রদর্শন করছে যে, দেশে জিহাদের শ্লোগান অব্যাহত থাকলে প্রতিউত্তরে এরূপ বোমা বিস্ফোরণ হতেই পারে। তাই আমরা জিহাদ থেকে তাওবা করি, মুজাহিদদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি এবং কাফেরদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব শিকার করে তাদের থেকে নিরাপত্তার ভিক্ষা চেয়ে নেই।

অপরদিকে যেসব সাংবাদিকের নিকট বেনজীর ভুট্টো ও নওয়াজ শরীফের শাসনকাল অধিক মনোপুত ছিল, তারা বোমা বিস্ফোরণের জন্য বর্তমান সামরিক সরকারকে দায়ী করছে। তারা জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে, নিকট অতীতে মুসলিম লীগ ও পিপলস পার্টির সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে পাকিস্তান শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকারের আমলে বোমা বিস্ফোরণের মত অঘটন ঘটছে।

এমনিভাবে একদল কলামিষ্ট বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর গণতন্ত্রের জন্য মায়া কান্না করে অশ্রু বিসর্জন করছে। তারা জাতিকে বুঝাচ্ছে যে, গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আজ এসব বিপদ ঘটছে। সুতরাং যেসব দেশ পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছে তারাই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটাচ্ছে। যেন বর্তমান সরকার দেশে গণতন্ত্রকে পুনর্বহাল করে।

এ তিন শ্রেণীর লোক মারাত্মক এই বোমা বিস্ফোরণে শহীদ ও আহতদের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনাকে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য পূরণের কাজে ব্যবহার করছে। তারা ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের থেকে জাতির দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাচ্ছে। এতে সন্দেহ নেই যে,

এ ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণ ইসলাম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কয়েকটি শত্রু শক্তির সম্মিলিত ধারাবাহিক চক্রান্তের অংশ বিশেষ। এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য পাকিস্তান সরকারকে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো এবং নিজ হাতে স্বদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা শক্তিকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

অতীত সাক্ষী যে, ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ ইরাকেও এই একই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তার পার্টিকে প্রথমে ইসলামের একনিষ্ঠ মুজাহিদ শ্রেণীর বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়। তার পার্টি ইরাককে ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী লোকদের থেকে খালি করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এ পদক্ষেপ পূর্ণ হলে ইরাককে অন্য একটি জালে ফাঁসিয়ে ইরাকের মাটিতে লোহা ও বারুদের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। পুরো দেশটিকে সর্বোতভাবে ধ্বংস ও বরবাদ করা হয়। এ কথা নিশ্চিত যে, যখন কোন দেশ আল্লাহওয়ালা মুজাহিদদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে, তখন তাকে দুশমনের গ্রাসেই পরিণত হতে হয়। এটি প্রকৃতির এমন এক অমোঘ বিধান, যা কেউ প্রতিহত করতে পারেনি এবং কেউ তা পরিবর্তন করতেও পারবে না।

বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের চতুর্পার্শ্বে এমন লোকদের জাল মজবুত হচ্ছে, ইসলাম ও দেশের কল্যাণের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাদেরকে উচ্চপদে আসীন করা হলে তারা নিজের দেশে অন্যের বিধান জারী করে। আর তাদেরকে পদ থেকে অপসারণ করা হলে তারা বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ, কিংবা অন্য কোন বড় সংস্থায় তাদের পাকাপোক্ত চাকুরীতে ফিরে যায়। দেশে গণতন্ত্র চালু হোক বা সামরিক শাসন, আমাদের প্রত্যেক শাসক ভিনদেশীদের নিকট থেকে এ ইঙ্গিতই পেয়ে থাকে যে, তোমরা দেশ চালাতে চাইলে এবং অর্থনীতিকে রক্ষা করতে চাইলে আমাদের এসব কর্মীদের সেবা গ্রহণ করতে হবে।

ভিনদেশী সে কর্মীরা বর্তমান সরকারকেও গ্রাস করে চলছে। তারা হুকুম দিচ্ছে যে, এ দেশকে জিহাদ ও মুজাহিদদের থেকে মুক্ত করে এনজিওদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাহলে দ্রুত এ দেশের উন্নতি হবে, তাদের চাপ শক্তিশালী করার জন্য ধমকী ও বোমা বিস্ফোরণ আরম্ভ

হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার যদি প্রকৃত মুসলমানের অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ধমকী ও বিস্ফোরণে ভীত না হয়ে এর আসল অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং আল্লাহর আদেশ অনুসারে জিহাদের ক্ষেত্রে অকৃত্রিম থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এ দেশ ভিতর ও বাইরের সর্বশ্রেণীর দুশমনের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। দেশের মাটিতে মুজাহিদরা আর আকাশে ফিরিশতারা দেশ রক্ষার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত থাকবে। তখন ইনশাআল্লাহ এ দেশ তার সেই হৃত অংশও ফিরে পাবে, যা বর্তমানে দেশের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত নেই।

কিন্তু সরকার ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এবং ধমক ও বিস্ফোরণে ভীত হয়ে শত্রুর ইঙ্গিতে আপনদের হত্যা করতে এবং বন্দী করতে আরম্ভ করলে নিঃসন্দেহে তা তাদের দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের কারণ হবে। ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে বোমার ভয়ে ঈমান বিক্রেতা ভীরু কাপুরুষ বলে চিহ্নিত করবে। ইতিহাস তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে এবং তাদের পরবর্তী-প্রজন্ম তাদের নাম উচ্চারণ করতেও ঘৃণা করবে।

তবে জিহাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, তা সবসময় অব্যাহত থাকবে। আরব দেশসমূহে আনোয়ার সাদাত, হাফিজ আল আসাদ ও বাথ পার্টির গুণ্ডারা জিহাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনি। অবশ্য তাদের একাল পরকাল সবই ধ্বংস হয়েছে। প্রায় দশ বছর যাবত বিশ্বের বড় বড় দেশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং তাদের বিশাল অংকের বাজেট জিহাদকে প্রতিহত করতে পারেনি। বরং প্রত্যেক দিন জিহাদ পূর্বাধিক শক্তিশালী, সুদৃঢ় ও সুসংহত হচ্ছে।

যে কোন বিশ্লেষক এখন এ বিষয় সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, যখন থেকে আমেরিকা জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বিশ্বের অনেকগুলো জাতিকেও এ কাজে সঙ্গে নিয়েছে, তখন থেকে জিহাদের বজ্র হুংকার আরও অধিক উচ্চকিত হয়েছে এবং মুজাহিদদের সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এ পাগলদের গুণেও শেষ করা যাবে না। তবে এটাও সত্য যে, কোন দেশে যদি শয়তানের পূজারী কোন সরকার জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়, তখন জিহাদ কিছুদিনের জন্য

অন্তরালে চলে যায় ঠিকই কিন্তু কিছুদিন পর যখন তা পুনরায় আবির্ভূত হয়, তখন পৃথিবীর বুকে জিহাদের বিরোধী শক্তিসমূহের এবং ইসলামের দুশমনদের কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়।

তালিবে ইলম ভাইদের নামে

বিগত বছরগুলোর মত এ বছরও দ্বীনী মাদরাসাসমূহ হতে শত শত তালিবে ইলম শিক্ষা সমাপন করছেন। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ নিজেদের অধ্যয়নের কাজ অব্যাহত রাখবেন। অপরদিকে কেউ কেউ কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত হবেন। আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি কার দ্বারা কি কাজ নিবেন। কবি বলেন—

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس کام کے قابل نظر آیا

"ভাগ্যের বন্টনকারী মহান আল্লাহ্ যার যার যোগ্যতা অনুসারে ভাগ্য বন্টন করেছেন।"

বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা বলে যে, দুনিয়ার পদ ও সম্পদ যাদের লক্ষ্য, তারা সর্বদা কাজের সন্ধানে থাকে। আর যারা আখেরাতকে লক্ষ্যে পরিণত করে, কাজ তাদের সন্ধান করে ফিরে। ভাগ্যের লিখন এমন যে, কিছু লোক তো কাজের সন্ধান করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর কিছুলোক কাজ করে করে কর্মক্লান্তির স্বাদ উপভোগ করে। কবির ভাষায়—

من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب

"যে ব্যক্তি অর্থহীন কাজে নিজ অশ্বকে ক্লান্ত করে, সে ঐ ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে না, যার অশ্ব জিহাদের ময়দানে ক্লান্ত হয়।"

ক্লান্তিও বড় অদ্ভুত জিনিস। যদি তা আল্লাহর রাস্তায় হয়, তাহলে তার স্বাদই আলাদা। পাঠক! ভেবে দেখুন, মুজাহিদের ক্লান্তির কথা আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। তার বিনিময়ে

পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পথে পরিশ্রান্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, তাদের এ নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। অন্যথায় পথে পথে ভিক্ষুকরাও তো ক্লান্ত হয়। ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে তাদের দিনরাত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলার শোকর যে, তিনি এধরনের ক্লান্তি থেকে রক্ষা করে স্বীয় ভালবাসাপূর্ণ ক্লান্তি দান করেছেন।

এ বছর শিক্ষা সমাপনকারী সৌভাগ্যবান তালিবে ইলমদের নিজেদের চতুর্পাশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তারা যে কুরআন মজীদ বারবার তেলাওয়াত করেছেন, তার দাওয়াত সম্পর্কে ভাবা উচিত। আরো ভেবে দেখা উচিত যে, বর্তমান যুগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের ওয়ারিশদের উপর কি কি দায়িত্ব বর্তায়।

আমার তালিবে ইলম ভাইয়েরা! মুসলিম উম্মাহ আপনাদের নিকট থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে থাকে। আপনাদেরই তালিবে ইলম ভাই হযরত আমীরুল মুমিনীন মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর নিজে কাজ করে আপনাদের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আপনারা যা কিছু কিতাবে পাঠ করেন, তিনি তা বাস্তবায়ন করেন। তিনি ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সর্বদা প্রাণ বাজি রাখেন। আপনারা কি মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হতে পারেন না? অবশ্যই পারেন, কিন্তু সেজন্য আপনাদেরকে দৃষ্টি উঁচু করতে হবে। প্রথমে নিজের অন্তরে পবিত্র কুরআনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার পাকাপোক্ত ওয়াদা রয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে কামেল ঈমান এবং মুকাম্মাল নেক আমলের অধিকারী ব্যক্তি থাকলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জমিনের খেলাফত দান করবেন। তাদের দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ও শক্তিশালী করবেন। তাদের ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন। হযরত আমিরুল মুমিনীনের ঈমান ছিল কামিল এবং আমল ছিল মোকাম্মাল। তাঁর সাথীরাও তাঁর আনুগত্যের বরকতে এসব গুণাবলী অর্জন করেন। ফলে আফগান ভূমিতে আল্লাহর হুকুম সমুন্নত হয় এবং কুরআন ও সুন্নাতের নির্মল ও সজীব হাওয়া মৃত হৃদয়কে জীবন্ত করতে থাকে। এগুলো আমাদের জন্য কি জরুরী নয়?

আমরা কতদিন আর কাফেরদের বস্তাপঁচা ব্যবস্থাপনায় লাঞ্ছিত হতে থাকব? আমরা কতদিন আর পরস্পরের বিরুদ্ধে জিন্দাবাদ ও মোর্দাবাদের শ্লোগান দিতে থাকব? আমরা কতদিন পর্যন্ত শরিয়তের পূতপবিত্র শাসন থেকে বঞ্চিত থাকব? আমরা কতদিন পর্যন্ত কথা ও কাজের বৈপরিত্বের শিকার থাকব? আমরা জানি, জিহাদ ও সশস্ত্র লড়াই ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা ছাড়া আমলও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই যতদিন পর্যন্ত উলামায়ে কেরাম জিহাদের বাস্তব আমল শুরু না করবেন, ততদিন পর্যন্ত এ পৃথিবী আল্লাহর ব্যবস্থাপনার জন্য ছটফট করতে থাকবে।

আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাইয়েরা! এমন এক সময় আপনাদের ইমতিহান আসন্ন, যখন কিনা মসজিদে আকসা রক্তে রঞ্জিত। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে বার্ষিক পরীক্ষায় বড় সাফল্য দান করুন। ইমতিহানের পর আপনারা ইহুদীদেরকে নিশ্চিত বুঝিয়ে দিন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাবাহিনী আজও জীবিত রয়েছে। নবীর ওয়ারিশদের বাহুতে আজও প্রাণ রয়েছে।

আমার তালিবে ইলম বন্ধুরা! আপনারা যে কুরআন পাঠ করেছেন, তার মধ্যে জিহাদ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের হুকুম রয়েছে। সাধারণ লোকদের জন্য শুধু লড়াইয়ের নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে আপনাদের জন্য নিজেরা লড়ার ও মুসলমানদেরকে এর আহবান জানানোর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আপনারা কুরআনের এ নির্দেশ পালনে তৈরী কি?

আপনারা যে মহান নবীর সিরাত পাঠ করেছেন, তাতেও আপনাদের জন্য এ পয়গামই রয়েছে যে, নবীপ্রেমের আসল পরীক্ষা রণাঙ্গনে হয়ে থাকে। সে পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য আপনারা প্রস্তুত আছেন কি?

প্রিয় তালিব ইলম বন্ধুরা! আপনাদের ইলমের সঙ্গে যোগসূত্র লাভ হয়েছে। এখন জিহাদের সঙ্গে যোগসূত্র লাভ করে আপন সত্তার পূর্ণতা সাধনে বিলম্ব করবেন না। আল্লাহর পথে জান দেওয়ার জযবা যে আলিমের রয়েছে, তাকে বলে আলিমে রব্বানী। আর মৃত্যুর ভয়ে ভীত ও কাপুরুষ ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ কিতাব পড়লেও ইসলাম তাকে 'আলিমে দুনিয়া' বলে। গাধার সঙ্গে যার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা

আমাদের প্রত্যেক তালিবে ইলমকে 'আলিমে রাব্বানী' করুন এবং আমাদেরকে ইলম ও জিহাদের নিয়ামত দান করে ইসলামের খাঁটি খাদেম হওয়ার তাওফীক দান করুন।

শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ)এর দুআ

হুররিয়াত কনফারেন্সের প্রধান পুনরায় একবার শ্রদ্ধেয় ভাই শহীদ কমাণ্ডার সাজ্জাদ (রহঃ)এর স্মৃতির সুবাস ছড়িয়ে দেন। জাইশে মুহাম্মাদের কর্মীরা টুবাটেকশিং নামক জায়গায় এ কনফারেন্সের ব্যবস্থা করে। আমি শোরকোর্টের জামিয়া উসমানিয়ার বার্ষিক জলসা থেকে ফারেগ হয়ে টোবার পথ ধরি। পথিমধ্যে সফরসঙ্গীরা বললেন যে, শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ)এর নামে টোবার কনফারেন্সের নামকরণ করা হয়েছে। টোবায় প্রবেশ করার পূর্বেই জায়গায় জায়গায় কনফারেন্সের পোষ্টার দেখতে পাই। পোষ্টারে শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর নাম এমনভাবে জ্বলজ্বল করছিল যেমন তিনি তার সাথীদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পোষ্টার পাঠ করে আমার হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ) এক বছর চার মাস হল আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তার স্মৃতি ও আলোচনা আমাদের মনে ও মুখে সর্বদা জীবন্ত রয়েছে। জিহাদী জীবনের প্রত্যেক কঠিন মুহূর্তে তার অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভব হয়।

তিনি ছিলেন রণাঙ্গনের সিংহ। তার শাহাদাত জাইশে মুহাম্মাদের অস্তিত্ব লাভ করার ক্ষেত্রে বড় একটি কারণ। আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, জাইশে মুহাম্মাদের অস্তিত্ব লাভের পিছনে শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর দুআ, আহাজারী ও ফিকির শামিল রয়েছে। শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করা এবং তার ঐ সমস্ত প্রত্যাশাকে পূর্ণ করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা জাইশে মুহাম্মাদের সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীর কর্তব্য, যেগুলো তিনি বার বার রক্তাক্ত হতে দেখেছেন এবং অবশেষে বন্দী জীবনে তারই খুন প্রবাহিত হয়েছে। সে রাতে আমি সম্মেলনস্থলে পৌছার পূর্বে শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর কথা স্মরণ করতে থাকি। তার স্মরণে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে যাই। সম্মেলন স্থলে পৌছার পর

স্নেহের ইসমাতউল্লাহ মাবিয়া আমাকে বক্তব্য দানের জন্য আহবান করার পূর্বে শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর আলোচনা পেশ করেন। সে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গীন আলোচনা আমার স্মৃতির সাগরে ঢেউ তোলে। ফলে আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর স্মৃতির বিক্ষিপ্ত মুক্তারাজি আহরণে পার হয়ে যায়।

ما و مجنون هم سبق بودیم در دیوان عشق
او بصحرا رفت وما در کوچه ها رسوا شدیم

"আমি ও মজনু প্রেমের পাঠশালায় সহপাঠী ছিলাম, সে প্রেমের বিয়াবানে হারিয়ে গেছে, আর আমি প্রেমপথের গলিতে লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে আছি।"

নিঃসন্দেহে আমরা সেখানে একই পথের পথিক ছিলাম। তিনি সফলতার উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করে গেছেন। আর আমি এখনো সে পথেই দৌড়-ঝাঁপ করছি। আমার খুব ভালভাবে স্মরণ আছে যে, আমি যখনই তাঁকে বলতাম যে, ইনশাআল্লাহ আমরা মুক্তি লাভ করব এবং ফিরে যাবো, তখন তিনি স্মিত হাসতেন এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তিনি পাকিস্তান থেকে আসার সময় দুআ করেছিলেন—হে আল্লাহ! আমাকে এখানে আর ফিরিয়ে এনো না। তিনি বলতেন, আমি খুব বুঝেশুনে এবং মনোযোগ সহকারে এ দুআ করেছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ আমার এ দুআ কবুল করেছেন। আমি আর কখনোই ফিরে যাব না। তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করতেন। তবে শর্ত লাগাতেন যে, আমি মুক্তিলাভের পর কাশ্মীর রণাঙ্গনে লড়তে থাকব। পাকিস্তান ফিরে যাব না।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী যারা পাঠ করেছেন তারা জানেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হযরত আমর বিন জামুহ (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে এ দুআই করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুলও করেছিলেন। ঠিক একইভাবে শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর দুআও কবুল হয়েছে। তিনি

পাকিস্তানকে ভালবাসতেন কিন্তু তার অভিযোগ ছিল যে, এখানকার মুজাহিদরা চিন্তার সাথে জিহাদের কাজ ও পরিশ্রম করে না। তারা রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের মত যথাযথ মেহনত করে না।

তিনি পাকিস্তানে বসে থাকা মুজাহিদদের ব্যাপারে অভিযোগ করতেন যে, তারা রণাঙ্গনকে শক্তিশালী করার জন্য পরিপূর্ণভাবে পরিশ্রম করছে না। বার বার এ অভিযোগ করতে করতে অবশেষে তিনি ফিরে না আসার জন্য দুআ করে কাশ্মীর রণাঙ্গনের দিকে দ্বিতীয়বার যাত্রা করেন। এখন তিনি জম্মুর একটি কবরস্থানে আলো বিকিরণ করছেন। ইনশাআল্লাহ, তিনি শহীদী জীবনের স্বাদ পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করছেন। কিন্তু তার দুআ এবং তার শাহাদাত আমাদের জন্য বড় একটি শিক্ষা। হায়! আমরা যদি তা অনুধাবন করতাম, তা না হলে নাজানি কত জানবাজ গাজী আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহীদ হওয়ার দুআ করে আমাদের অলসতা, অমনোযোগিতা ও ভীরুতার জন্য অশ্রু বিসর্জন করবে।

জাইশের জানবাজ মুজাহিদগণ! শহীদ সাজ্জাদ খান (রহঃ)এর নামে অবশ্যই সভা-সম্মেলন করুন। তার স্মরণে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করুন। কিন্তু একথা ভুলবেন না যে, এতটুকু করাই যথেষ্ট নয়, আপনাদেরকে অভিশপ্ত দুনিয়ার ভালবাসা এবং বড় বড় পদকে পদাঘাত করে জিহাদের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হতে হবে। অলসতা ও কর্মবিমুখতা পরিহার করে রণাঙ্গনকে শক্তিশালী করতে হবে। তবেই আপনারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহকে মুখ দেখাতে পারবেন।

হে পাকিস্তানের অধিবাসীরা! আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের পবিত্র মাতৃভূমির পরিবেশকে মুজাহিদদের জন্য অনুকূল করুন এবং এখানে জিহাদের সাহায্যের এমন ধারা প্রতিষ্ঠা করুন, যার দ্বারা মুজাহিদরা আপনাদের থেকে শক্তি ও শান্তি লাভ করবে। আর বিনিময়ে আপনরা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং কিয়ামত দিবসে সম্মানিত শহীদদের সঙ্গে হাশর করার নেয়ামতে ভূষিত হবেন।

আহ্! ইসলামের এ সকল জানবাজ মুজাহিদ

দৃশ্যটি আমার আজো স্মরণ আছে। আমার সম্মুখে তাঁবুর বিছানায় তিন তরুণ উপবিষ্ট। ইসলাহী এবং জিহাদী বায়আতের জন্য তারা ছিল বেকারার। এরা তিনজন সঙ্গীই অতিসত্বর অধিকৃত কাশ্মীর রণাঙ্গনে গমন করবে। যাওয়ার পূর্বে শেষবারের মত আমার সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছে। রণাঙ্গনে যাওয়ার কথা শুনতেই আমার অন্তর তাদের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমি তাদেরকে বললাম, নিঃসন্দেহে আপনারা সৌভাগ্যবান। আমি আপনাদের মুবারকবাদ দিচ্ছি। আপনাদের উপর আমার ঈর্ষা হচ্ছে। হায়! আমিও যদি আপনাদের স্থলে হতে পারতাম।

তারপর আমি তাদেরকে সংগঠনের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করি। অধিকৃত কাশ্মীরে কাজ করার ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা দান করি। তারা আমার কথাবার্তা নেহায়েত মনোযোগ এবং একান্ত একাগ্রতার সাথে শ্রবণ করে। তারপর বায়আতের জন্য মুসাফা করে। আমি তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাই। তারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে উষ্ণতাভরে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। আমি তাঁবুর বাইরে তাদের সঙ্গে যাই। আমার সে স্মরণীয় সাক্ষাত আজ অতীত হয়ে গেছে।

তিনদিন পূর্বে তাফসীর করার উদ্দেশ্যে আমি যখন করাচী যাই, তখন জিহাদের পথের বেশ কিছু বিস্ময়কর বাধা এবং অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা খুনে ভেজা কিছু সংবাদ আমাকে স্বাগত জানায়। পুঁছ নামক স্থানে জাইশে মুহাম্মাদের জেলা কমাণ্ডার ভাই উমায়ের শহীদ হওয়ার সংবাদ করাচী পৌঁছার পূর্বেই পেয়েছিলাম। উপরন্তু করাচী পৌঁছতেই বারামুলা জেলার জাইশে মুহাম্মাদের কমাণ্ডার ভাই আনসার (ডেরা ইসমাইল খান নামক জায়গার বাসিন্দা)এর শাহাদাতের সংবাদ হৃদয়-মনকে চুরমার করে দেয়। এ সংবাদের পরপরই বডগাম থেকে আরো পাঁচজন সাথী ভাই বাবর (এবেট আবাদ), ভাই আবদুল্লাহ (সওয়াবী), হাফেজ তারেক (অটক), ভাই খালেদ (ছোয়াত), ভাই হারেছ (করাচী) এবং ভাই জুবায়ের (সপুর)এর শাহাদাতের সংবাদ আসে। এমনিভাবে কাশ্মীরের আরও দু'জন স্থানীয় মুজাহিদ শহীদ হওয়ার সংবাদ পাই। মর্মন্তুদ

সংবাদের এ ধারা গতরাতেও অব্যাহত ছিল। আমাকে জানানো হয় যে, তাঁবুর মধ্যে যে তিনজন জানবাজ মুজাহিদ আমার সঙ্গে শেষ মোলাকাত করে যায়, তাদের মধ্য থেকে ভাই কালিমুল্লাহ এবং ভাই নূরুল হকও শাহাদাত মদীরা পান করেছেন।

শাহাদাত বরণকারী উৎসর্গপ্রাণ এ বীর মুজাহিদগণ জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত অবিচল থেকে দুশমনের মোকাবেলা করেছেন। ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার সহ অনেকগুলো সৈন্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তারা অমর জীবন লাভ করেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে ইসলামের গৌরবময় এই সুপুত্রগণ কোনরূপ ভীরুতা প্রদর্শন করেননি বা শত্রুর সম্মুখে আত্মসমর্পণও করেননি। বরং রক্তের শেষ বিন্দু থাকা পর্যন্ত তারা ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। স্বীয় প্রাণ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে তারা কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি। নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, বাহাদুর ও প্রিয়তম এ সকল বন্ধুর বিচ্ছেদ আমাদের জন্য অপরিসীম বেদনার্হ। তারা কাঙ্খিত সেই শাহাদাত লাভ করতে সফল হয়েছেন, যা প্রতিটি খাঁটি ঈমানদারের হৃদয়বাসনা। তবে আমরা তাদের হারানোর বেদনা তীব্রভাবে উপলব্ধি করছি।

শাহাদাতের পথে কাফেলার পর কাফেলা প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে আমাদেরকে এ কথাই বলছে যে, ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে, শীতের পর বসন্তের আগমন দ্বারপ্রান্তে। সকল মুসলমান এক উম্মাহর যে অসাধারণ আত্মীয়তার বন্ধনে একসূত্রে গাঁথা, তার অবশ্যম্ভাবী আবেদন এই যে, তারা শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এবং তাদের মিশনকে অব্যাহত রাখার কাজে ধন–প্রাণ কোরবানী করাকে সৌভাগ্য মনে করবে। মনে রাখবেন, এ দেহ যদি ইসলামের জন্য কুরবান না হয়, তবুও মাটির গ্রাস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না। তেমনিভাবে আমার আপনার সম্পদ যদি দ্বীনের জন্য বিলিয়ে না দেই, তাহলে তা ভয়ঙ্কর সরীসৃপ হয়ে হাশর মাঠে কণ্ঠ পেঁচিয়ে ধরে দংশন করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। শহীদদের নূরানী চেহারা এবং তাদের সুগন্ধময় রক্ত আমাদেরকে এমন এক পথ দেখিয়েছে, যে পথে সফলতা, কল্যাণ ও সৌভাগ্যের অপরূপ মুকুট সেসব

মস্তিষ্কের প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেসব মস্তিষ্ক একমাত্র আল্লাহর সামনে নত হয় এবং তাঁরই পথে কুরবান হয়।

খাদেমের পত্র

আমার মুহতারাম ও প্রিয় ভাইয়েরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আমরা একমাত্র আল্লাহরই শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে জাইশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিপাহী বানিয়েছেন। একজন মুজাহিদের জন্য যেসব গুণাবলী থাকা একান্তই আবশ্যক, তা আমাদের মধ্যে পয়দা করা অত্যন্ত জরুরী। এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যা দেখতে ক্ষুদ্র হলেও বাস্তবে তার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের বিধান অনুপাতে আমল করা, শৃংখলা ও সংহতি রক্ষা করা এবং লক্ষ্যপানে অবিচল থাকা আমাদের জিহাদকে ফলপ্রসূ করবে। জাইশের প্রত্যেক কর্মী নিম্নেবর্ণিত আবেদনসমূহকে নিজের জন্য মারকাযের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক পথনির্দেশ মনে করে সে অনুপাতে আমল করবে। আজকের এ কলামে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে—

১. মুজাহিদগণ মুসলিম উম্মাহর খাদেম তথা সেবক। তাই আমাদের প্রত্যেক কাজ থেকে একথা প্রমাণিত হওয়া চাই যে, আমরা মুসলমানদের পক্ষে বিনম্র আর ইসলামের দুশমনদের ব্যাপারে কঠোর। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে যে, জাইশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোন শহরে আগমন ঘটলে কিছু কিছু বন্ধু মোটর সাইকেলে আরোহণ করে সম্মুখ থেকে পথচারী ও যানবাহনকে ডানে বামে সরিয়ে দিয়ে পথ করে দেয়। অধমের মতে এ কাজটি মুসলমানদের জন্য নিতান্ত অবিচারমূলক ও কষ্টদায়ক। প্রত্যেকের পথচলার সমান অধিকার রয়েছে। আমরা তো ক্ষমতাসীনদের এমন পন্থার বিরুদ্ধে অনুযোগকারী ছিলাম। সেখানে উম্মাহর সহমর্মী ও খাদেম মুজাহিদগণ এমন কাজ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। অপারগ অবস্থায় শরীয়ত হয়ত বা একে জায়েয বলবে, কিন্তু বর্তমানের সাধারণ অবস্থায় এমনটি করা মুজাহিদদের মর্যাদার পরিপন্থী।

জাইশের সকল নেতৃবর্গ কর্মীদের দ্বারা গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়টি

বাস্তবায়ন করাবেন।

২. কিছু কিছু দায়িত্বহীন ব্যক্তিকে দেখা গেছে যে, তারা বিভিন্ন সমাবেশে (লাইসেন্সধারী) অস্ত্র প্রদর্শন করে থাকে এবং সেজন্য বিশেষভাবে আনন্দিত হয়। এমনটিও হয় যে, ছোট একটি পিস্তল কয়েকজন মিলে উল্লাসভরে হাতে নিয়ে নাড়াতে থাকে। জিহাদের সঙ্গে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দুশমনরা এ পিস্তল থেকে অধিকতর বিপদজনক অস্ত্র তৈরী করেছে। তাই একটি পিস্তল নেড়ে দেখানোর দ্বারা কোন উপকার নেই। বরং এমন কাজ দ্বারা কর্মীদের মধ্যে প্রদর্শন, লৌকিকতা এবং নিজের মুসলমান ভাইদের উপর ভীতি সঞ্চারের ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাধি জন্ম নিয়ে থাকে। অস্ত্র দেখানোর জিনিস নয়, চালানোর জিনিস। অস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার বস্তু। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও গভীরতা সৃষ্টি করুন। আমাদের দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে চিন্তাশীল, অথচ আমরা বালকসুলভ কাজের মধ্যে আনন্দ লাভ করে থাকি, যা আমাদেরকে আমলের ময়দান থেকে বহু ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করে। জাইশের সভা–সম্মেলনে অস্ত্রের প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আপনারা গুরুত্ব সহকারে তা মেনে চলবেন। জিহাদ ও অস্ত্রের ভালবাসার দাবী এটিই। ইনশাআল্লাহ এতে করে জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী হবে।

৩. বর্তমানে অনেক রাত পর্যন্ত ধর্মীয় সভা করার এক রেওয়াজ শুরু হয়েছে। সভার ব্যবস্থাপকগণের চিন্তায় এর কোন হিকমত অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু জাইশে মুহাম্মাদ তার নিজস্ব সভা সম্মেলন সর্বাধিক রাত ১১টার মধ্যে শেষ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে চায়। যেন অসুস্থ ও দুর্বল লোকেরাও এসব সম্মেলনে অংশ নিতে পারে, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের ফজর নামায কাযা না হয় এবং যেসব সম্মেলনে মহিলারা অংশগ্রহণ করে, তারা সহজে বাড়ী ফিরে যেতে পারে। এ ঘোষণার পর জাইশের সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ সভা সম্মেলন যথাসময়ে সমাপ্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করবেন। বিষয়টি কষ্টসাধ্য বিধায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত আমলের জন্য আজ থেকে দু'

মাস সময় দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি নসীব করুন।

চোখে দেখা আল্লাহর নুসরাত

আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট 'নুসরাত' তথা সাহায্য প্রত্যক্ষ করা একটি বিরাট নেয়ামত। এর বদৌলতে সুস্থ হৃদয় অধিক শক্তিশালী হয় এবং অসুস্থ হৃদয় নিরাময় লাভ করে। হীনমন্যতা, দুর্বলতা ও নৈরাশ্যের মত ব্যাধিসমূহের চিকিৎসাও আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করার মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষ যখন স্বচক্ষে অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে, তখন তার সাহস আকাশের উচ্চতাকেও হার মানায়। যেখানে বাহ্যিক উপকরণ নিস্ফল হয়ে যায়, সেখান থেকেই আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য শক্তির কাজ আরম্ভ হয়। আর তাকেই বলে আল্লাহর 'নুসরাত'। একবার মাত্র পবিত্র কুরআনে আলোচিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিন। আল্লাহর নুসরাতের বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী আপনাকে নৈরাশ্যের খাদ থেকে উঠিয়ে এনে কর্মের মাঠে দাঁড় করাবে।

সাওর পাহাড়ের গুহার ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন। কি ঘটল সেখানে? যুক্তি বুদ্ধি কি একে সম্ভবপর বলে? মোটেও নয়। কেননা আরবের বেদুঈনরা বিশ্বের নামকরা সুদক্ষ রহস্য উদঘাটক ছিল। কিন্তু সেদিন তাদের দৃষ্টিকে কে অন্ধ করে দিয়েছিল? কে তাদের বুদ্ধিকে বিকল করে দিয়েছিল? তারা গর্তের মুখে অস্থির ও দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তাদের দৃষ্টি নিজের পায়ের তলে দেখতে অক্ষম হল। গর্তের চতুর্দিকে মারাত্মক অবরোধ আর তার পূর্বে স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গৃহের চতুর্দিকে শক্তিশালী অবরোধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নুসরাতই কার্যকর হয়। ফলে কাফেরদেরকেও স্বীকার করতে হয় যে, বাস্তবিকই আল্লাহর শক্তি অপরাজেয়।

এখন কেউ যদি পরিহাস করে বলে যে, এসব কিছু তারা সলাপরামর্শ করে করেছে। এটি আসলে মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র ছিল। অন্যথায় ছোট একটি বাড়ীর চতুর্দিকে ১০০ জন বাহাদুর, অভিজ্ঞ ও রক্তপায়ী যোদ্ধা বর্তমান থাকতে এমনভাবে বের হয়ে আসা যে, তারা

জানতেও পারল না—এও কি সম্ভব? তাছাড়া মক্কার লোকদের রেকর্ড ভঙ্গ করে সাওর পাহাড়ের গুহা থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পৌঁছাও সন্দেহের উদ্রেক করে।

এ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত পরিহাসকারীদেরকে এ কথাই বলা হবে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের মুখ সামলাও। যে প্রভু এক ফোটা পানি থেকে তোমাদেরকে এত সুন্দর মানবরূপে তৈরী করেছেন, তিনি হীন ও অপদস্ত মুশরিকদের মধ্য থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে নিরাপদে বের করে আনার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। যে আল্লাহ গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে শুভ্র ও স্বচ্ছ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দুধ বের করতে পারেন, তিনি দুশমনের ঘেরাও–এর মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নিরাপদে বের করে আনার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন।

মহিমান্বিত এ ঘটনা ছাড়াও পবিত্র কুরআন এমন আরও অনেক ঘটনা তুলে ধরেছে, যেগুলোতে নিজেদেরকে অপরাজেয় জ্ঞানকারী কুফরী শক্তিকে দুর্বল, নিঃসম্বল ও নিরস্ত্র ঈমানদারদের মাধ্যমে আল্লাহর নুসরাতের বদৌলতে লাঞ্ছিত হতে দেখা গেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর নমরুদ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হতে বের হয়ে আসা, জালুতের ন্যায় শক্তির নেশায় মদমত্ত শাসকগোষ্ঠীর পর্যুদস্ত হওয়া, ফেরআউন নিমজ্জিত হওয়া, বদর প্রান্তরে কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে কাফেরদের সেনাপ্লাবনের ধ্বংস হওয়া, পবিত্র মদীনার শক্তিশালী ইহুদীরা দুর্বল লোকদের হাতে নিহত ও দেশান্তর হওয়ার ঘটনা, এমনিভাবে পবিত্র কুরআন এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনাবলীর চিত্র অঙ্কন করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, আল্লাহর দুশমন অপরাজেয় শক্তি নয়। বরং মুসলমানগণ দৃঢ় সংকল্প হলে ইসলামের প্রত্যেক শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারে। তাদের সব ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনার মূলোৎপাটন করতে পারে। বরং পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এ কথাও শিক্ষা দেয় যে, যেসব মুসলমান কাফেরদের শক্তিকে অপরাজেয় মনে করে, তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের এ ভ্রান্তি তাদেরকে গোমরাহী ও মুনাফেকীর লজ্জাজনক গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। অতএব মুসলমানের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও শক্তির উপর থাকা চাই, যেন তারা উচ্চ সাহসিকতা,

নির্ভেজাল নিয়্যত ও নিস্কলঙ্ক আমল দ্বারা আল্লাহর নুসরাতকে স্বপক্ষে এনে বিশ্বের সমস্ত কুফরী শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে, ইসলামের দুশমনদের আরোপ করা সকল প্রতিবন্ধকতাকে খণ্ডন করতে পারে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা সমস্ত শক্তিকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়টি বোধগম্য করানোর উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক পারায় পারায় আমাদের জন্য আল্লাহর নুসরাতের বিরল, বিস্ময়কর ও ঈমানদীপ্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনা কুফরী শক্তির সম্মুখে আত্মসমর্পণ না করার, কখনো তাদের মোকাবেলা থেকে পলায়ন না করার এবং তাদের শক্তি দেখে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের প্রাধান্য ও শাসন মেনে না নেওয়ার শিক্ষা দান করে। বরং এসব ঘটনা আমাদেরকে সর্বদা কুফরী শক্তির মোকাবিলা করার এবং তাদের সবধরনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার শিক্ষা দান করে। যাই হোক, যেসব মুসলমান কুরআনের এ পয়গাম অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা কখনই কুফরী শক্তির সম্মুখে মাথা নত করে না। তারা নিঃসঙ্গ হোক বা সদলবলে, সশস্ত্র হোক বা নিরস্ত্র—সর্বাবস্থায় কুফরী শক্তিকে চূর্ণ করে ফেলার জন্য দেহ ও প্রাণকে বাজি রাখে। কোন পরিস্থিতিতেই তারা এ অনাকাংখিত কথা প্রকাশ পেতে দেয় না যে, কুফরী শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত করেছে।

আজ থেকে প্রায় সাত বছর পূর্বে আমি যখন ভারতের মুশরিকদের হাতে বন্দী ছিলাম, সে সময় যন্ত্রণাদায়ক বন্দী অবস্থাতেও যে জিনিসটি আমার জন্য সর্বপ্রধান অবলম্বনের কাজ দেয়, তা হলো পবিত্র কুরআন। বিশেষত পবিত্র কুরআনের নূরানী ভাষায় বর্ণিত আল্লাহর নূসরাতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে আমার ক্ষতস্থানের মলমের এবং আমার দৃঢ় সংকল্প অটুট থাকার জন্য অক্সিজেনের কাজ দেয়। বন্দীকালীন সময় দেহ ও মস্তিস্কের উপর দিয়ে যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়, সেসবের আলোচনা তো অর্থহীন। তবে বন্দীকালীন সময় দ্বীনের খেদমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার তীব্র অনুভূতি সত্যিই মনে রাখার মত। সত্য কথা এই যে, দ্বীনের খেদমতশূন্য মানবজীবন পৃথিবীর জন্য একটি বোঝা। সুস্থ প্রকৃতির

অধিকারী মানুষের এমন সময় নিজের ব্যাপারে তীব্র অনিহা এসে যায়, নিজের প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয়, যখন সে দ্বীনের খেদমত এবং জিহাদের মেহনত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বন্দী হওয়ার কিছুদিন পর আমার উপর এমনই এক অনুভূতি বিরাজ করে। আমাকে জিহাদের কাজ ও দ্বীনের মেহনত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে, এ চিন্তায় আমি সবসময় ছটফট করতে থাকি। টর্চারিং সেন্টারের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ আমার দেহকে আর বঞ্চনার অনুভূতি আমার হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখে।

বন্দী হওয়ার পূর্বে যদিও কুরআন মাজীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, তবে কুরআন মাজীদের নৈকট্য ও তার বিশেষ সংস্পর্শ লাভ করি কারাগারেই। টর্চারিং সেন্টারে আমার কোন কাজ ছিল না এবং মুজাহিদ সাথীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও নিষিদ্ধ ছিল, ফলে আমার রাতদিন কুরআন মাজীদকে নিয়েই অতিবাহিত হতে থাকে। পরিণতিতে দেহ-মনের অন্ধকার ও নৈরাশ্যের জাল নিজে নিজেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন আমাকে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি ছিন্ন করার ও প্রতিকূল পরিস্থিতির বীরবিক্রমে মোকাবেলা করার জন্য বারবার উৎসাহিত করে। আমাকে অসংখ্য নতুন নতুন বিষয়ের জ্ঞান দান করে।

কাগজ ও কলমের মূল্য কত অধিক, তা সেসময় তীব্রভাবে উপলব্ধি করি। আমার মস্তিষ্কে কয়েকটি কিতাবের অবকাঠামো ভেসে উঠছিল। আমার অন্তরে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বারি বর্ষণ হচ্ছিল। কিন্তু আমার হাতে কাগজ কলম ছিল না। ছোট্ট একটি কাগজ—যার মধ্যে আমি এ বিষয়গুলো ইঙ্গিতে লিখে নেব এবং আল্লাহ তাআলা সুযোগ দান করলে পরে সেগুলোকে ফুটিয়ে তুলবো, এ রকম একটি কাগজ প্রাপ্তিই ছিল আমার সে সময়ের একমাত্র বাসনা। কিন্তু সে সময় কাগজের ছোট একটি টুকরোও হাতে পাইনি। পরিস্থিতি দিনে দিনে আরো অবনতি হচ্ছিল। ওদিকে পবিত্র কুরআন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে, দুশমন যত কঠিন অবরোধই করুক না কেন, তুমি ঈমানের উপর অবিচল থাকলে তাদের অবরোধ ছিন্ন হবে। বারবার ছিন্ন হবে। মুশরিকরা অনুতাপ ও পস্তানো ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারবে না।

টর্চারিং সেন্টারে অতিবাহিত সে সাত মাসে কল্পনার জগতে

অনেকগুলো কবিতা, ছড়া এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ জেগে ওঠে আবার হারিয়ে যায়। দুই চারটি মাত্র পত্র ছাড়া আর কিছু লেখার সুযোগ আমার হয়নি। তবে মুজাহিদদের নামে লিখিত সে দুই চারটি গুরুত্বপূর্ণ ও পথপ্রদর্শক পত্র নিরাপদে বাইরে পৌঁছার মাধ্যমে আল্লাহর নুসরাত কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করতে আরম্ভ করি। আল্লাহ তাআলার জন্য এ সাত মাসেও আমাকে বিভিন্ন কিতাব ও প্রবন্ধ লেখার এবং তা বাইরে পাঠানোর সুযোগ করে দেওয়া জটিল ছিল না। কিন্তু তিনি বড় বিজ্ঞ, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারেই কাজ করে থাকেন। তিনি আমাকে এ সাত মাস সময়ে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে অধিক থেকে অধিকতর সময় অতিবাহিত করে প্রশান্তি লাভ করার এবং কয়েক বছর ধরে পবিত্র কুরআনের সাথে যে দূরত্ব ও উদাসীনতার আচরণ চলে আসছিল, তারও ক্ষতিপূরণ করার সুযোগ করে দেন।

টর্চারিং সেন্টারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যদিও অধিক কিছু লেখার ও বাইরে প্রেরণ করার সুবিধা আমি লাভ করতে পারিনি, কিন্তু বিভিন্নভাবে সেখানে আমি আল্লাহর নুসরাত প্রত্যক্ষ করি। সত্যি কথা এই যে, সে অন্ধকার প্রকোষ্ঠসমূহে যে বস্তুটি আমার সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্য। এছাড়া অন্যসব বস্তু ছায়ার মত অর্থহীন ও গুরুত্বহীন দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আল্লাহর নুসরাতের এসব ঘটনাবলীর আলোচনা আরম্ভ হলে আমরা মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যাব, তাই এ বিষয়কে অন্য কোন সুযোগে লেখার বাসনা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি।

ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ), বটগ্রাম এবং শ্রীনগরের সেনাবাহিনীর টর্চারিং সেন্টারে সাত মাস কাল অতিবাহিত করার পর আমাদেরকে জম্মুর উপকণ্ঠে অবস্থিত কোট ভলওয়াল কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। কারাগারের পরিবেশ টর্চারিং সেন্টারের পরিবেশ থেকে ভিন্নতর ছিল। আমরা এখানে শিক্ষাদান ও গ্রহণের সুবিধা এবং কাগজ ও কলমের মত বিভিন্ন নেয়ামত লাভ করি। কিন্তু সেখানে যেতেই শিক্ষাদান ও গ্রহণের মজলিস এমন জমজমাট হল যে, কাগজ কলম হাতের নাগালে থাকলেও লেখালেখি সম্ভব হয়নি। কারাগারে প্রচুর মুজাহিদ বন্দী ছিল।

এক সহস্রাধিক মুজাহিদকে পাঠদান করা ছাড়াও তাদের ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমনকি পানাহার ও ঘুমানোর সময় পর্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করে লেখালেখির জন্য অল্প কিছু সময় বের করি। ইতিমধ্যে কারাগারের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। সেখানকার রণাঙ্গণের মত পরিস্থিতি আমাদেরকে সুড়ঙ্গ খনন করতে, পাহারা বসাতে এবং দিবস রজনী চৌকস থাকতে বাধ্য করে। এক মাসের অধিক সময় এসব ঈমানী মেহনতের মধ্যে তীব্র সংকটময় সময় অতিবাহিত হয়।

নভেম্বর মাসের হীমশীতল এক ভোর আমাদের জন্য নতুন এক 'প্রেম পরীক্ষার' পয়গাম বয়ে আনে। কারাকর্তৃপক্ষ সি.আর.পি.এফ–এর সাতটি কোম্পানী এবং তাদের নিজস্ব আর্মড ফোর্সের সহযোগিতায় কারাগারে আক্রমণ করে। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ার কারণে সত্যের পথের বন্দীরা আক্রমণ সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হতে পারেনি। তারপরও যারা সামলে উঠতে পেরেছে, তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত কারাগারের ব্যারাক ও গলিসমূহে ফিলিস্তীনের রণক্ষেত্রের দৃশ্য বিরাজ করতে থাকে।

আমি আল্লাহর নুসরাত প্রত্যক্ষ করেছি

কিছুক্ষণ পর কারাগারের দৃশ্য পাল্টে যায়। চতুর্দিক থেকে মুজাহিদদের উপর গুলিবর্ষণ হচ্ছে। প্রাচীরের উপর নির্মিত বাংকারসমূহ থেকেও গুলি বর্ষণ হচ্ছে। অপরদিকে বেপরোয়াভাবে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমাদের মুজাহিদ বন্ধু ভাই নাবীদ আনজুম হাকীম (রহঃ) গুলির মোকাবিলা পাথর দিয়ে করতে করতে শহীদ হন। সকল পাকিস্তানী মুজাহিদ এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কাশ্মীরী মুজাহিদকে কারাভ্যন্তরে পুনর্বার গ্রেফতার করা হয়।

কারাকর্তৃপক্ষ একদিকে ছিল আহত, অপরদিকে রাগে দুঃখে জ্বলছিল। তারা একমাস পর্যন্ত অসহায় বন্দীদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে নিজেদের স্বভাবজাত কাপুরুষতা খুব করে প্রদর্শন করে। মুশরিকরা যুদ্ধের ময়দানে নিতান্ত দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু নিরস্ত্র ও নিঃস্ব কোন ব্যক্তির উপর নির্যাতনের সুযোগ পেলে, তখন আর নিজেকে কোনভাবেই

সামলাতে পারে না। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। ভারতের কারাগারে আমরা বারবার চূড়ান্তভাবে তা প্রত্যক্ষ করেছি। এ ঘটনার পর পুনরায় সকল বন্দীকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ও কাগজ কলম থেকে মাহরুম করা হয়। তাছাড়া সে সময় কাগজ কলম পেলেও আমাদের হাতে কলম ধরার মত এবং আঘাতে জর্জরিত মাথার ব্যথায় কাগজের দিকে তাকিয়ে দেখার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সে সময় কল্পনার পাতায় নতুন একটি কবিতা ভেসে ওঠে, যার কয়েক লাইন এখনও আমার স্মরণ আছে—

غم دل کو چھپانا آگیا ہے
ہمیں جو مسکرانا آگیا ہے
بدن زخمی، کڑی ہاتھوں میں ہر دم
محبت کا زمانہ آگیا ہے
مرے دشمن کے ہاتھوں میں اچانک
خوشی کا اک بہانہ آگیا ہے

"হৃদয়বেদনা লুকিয়ে রাখতে আমি অভ্যস্ত হয়েছি।
ব্যথিত হৃদয় নিয়েও আমি হাসতে শিখেছি।
দেহ ক্ষত-বিক্ষত আর হাতে হাতকড়া—
যা আমার জন্য ভালবাসার যুগ বয়ে এনেছে।
অরাতীর হাতে হঠাৎই আনন্দের এক বাহানা এসেছে।"

আল্লাহর শাশ্বত বাণী—সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। ভারত সরকার আমাদের নিয়ে বিপাকে ছিল যে, এদেরকে কোথায় রাখা যায়? কোট ভলওয়ালের মত বিশাল কারাগারও আল্লাহর পথের নিঃস্ব কয়েকজন মুজাহিদকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কারাকর্তৃপক্ষ এবং ভারতের সমর বিশারদরা ষাট ফুট দীর্ঘ এ সুড়ঙ্গ দেখে বিমূঢ়, বিহ্বল ও হতভম্ব হয়ে যায়, যা আমাদের মুজাহিদ সাথীরা চরম দক্ষতা ও অতুলনীয় কায়ক্লেশে করে খনন করেছিল। তারা আমাদেরকে নির্যাতন করার সময় বলত যে, আমরা কয়েকশ' লোক লাগিয়ে তাদেরকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার

করতে দিলেও রাতদিন কাজ করে এমন পাথুরে জমিতে এত চমৎকার সুড়ঙ্গ খনন করতে সক্ষম হবে না। বেদিশা ও বিহ্বল অবস্থায় ভারত সরকার (তাদের ধারণায়) আমাদের জন্য অতি মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা আমাদেরকে যুগের কলঙ্ক, দিল্লীর তিহার কারাগারে স্থানান্তর করে।

পাঠক ! বিশ্বাস করুন, আমরা এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে চরম অস্থির হয়ে পড়ি। তিহার কারাগারের নির্যাতন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই শুনেছিলাম। সুতরাং যে রাতে আমরা জানতে পারলাম যে, সকালে আমাদেরকে দিল্লী পাঠানো হবে, সে রাত আমাদের সীমাহীন দুশ্চিন্তার ছিল। আমার খুব ভালভাবে স্মরণ আছে যে, অর্ধেক রাত অতিবাহিত করার পরও আমার ঘুম আসছিল না। আমার বারবার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে তিহার কারাগারে স্থানান্তর হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তার বিনিময়ে আমাদেরকে জম্মুর এই টর্চারিং সেন্টারে আরো দু' বছর অবস্থান করতে হলেও। কিন্তু অনেক কষ্টে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি এবং একথা ভেবে এমন দুআ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি যে, আল্লাহ তাআলা নিজে থেকেই আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা করবেন।

সকালবেলা আমাদের সবাইকে দিল্লী অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহর নুসরাত আমরা পৌছার পূর্বেই সেখানে পৌছে হকের পথে মার খাওয়া মুসাফিরদের প্রতীক্ষা করতে থাকে। তিহার কারাগারে পৌছে জানতে পারি যে, বাস্তবিকই তা বড় কঠিন জায়গা। কিন্তু সেখানে দীর্ঘ দু' বছর অবস্থানকালে আল্লাহর নুসরাত যেভাবে প্রত্যক্ষ করি, তা আল্লাহ তাআলার জাতের উপর আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি করে। যেদিন সকালে আমরা তিহার কারাগারের কালো দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি, সেদিন থেকে নিয়ে মুক্তির দিন পর্যন্ত হাতে গোনা কিছুদিন ছাড়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে সবসময় কোন না কোন ভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ হয়। বেশীর ভাগ সময় লিখিত প্রবন্ধ ও রচনাসমূহ বাইরে প্রেরণের সুযোগও হতে থাকে।

হাদীস ও বর্ণনাসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার পথের ভয়-ভীতিও বড় একটি নেয়ামত। যে নেয়ামতের পর প্রায়ই নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ হয়ে থাকে। তিহার কারাগারে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বের রাত ছিল চরম অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতির। সে রাতে জীবনের চেয়ে মৃত্যু অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তবে সব সাথী চরম ধৈর্য ও সহ্য সহকারে রাতের ভয়-ভীতিকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। যাই হোক, মহান আল্লাহর রহমত আমাদের উপর বর্ষিত হয়। ফলে তিহার কারাগারে পৌঁছতেই বন্দী জীবনের দুঃখ কষ্ট কিছুটা হ্রাস পায়। তিহার কারাগারে দু' বছর অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি কিতাব এবং প্রায় ৭০টি প্রবন্ধ লেখার তাওফীক দান করেন। দুই শতাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি কিতাব কারাকর্তৃপক্ষের কড়াকড়ির ফলে বিনষ্ট হয়। বাকী সব কিতাব ও প্রবন্ধ নিরাপদে পাকিস্তান পৌঁছে যায়।

এখানে এ বিষয়টি আলোকপাত করা জরুরী যে, অধম কারাভ্যন্তরে যা কিছু লিখেছে, তা বাইরে পাঠাতে অবশ্যই কষ্ট ও মুজাহাদা করতে হয়েছে। তবে আল্লাহ তাআলার নুসরাত সঙ্গে ছিল। প্রত্যেকবার নতুনভাবে আমি সে নুসরাত প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেকটি কিতাব কারাগারের ভিতর থেকে বাইরে পাঠাবার এবং তা পাকিস্তানে পৌঁছানোর বিস্ময়কর উপাখ্যান রয়েছে। যে উপাখ্যান ঈমান ও সাহস বৃদ্ধি করে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে বিধায় সব উপাখ্যান উল্লেখ করা মুনাসিব নয়। সারকথা এই যে, কারাভ্যন্তরে এসব প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখতে পারা এবং নিরাপদে তা পাকিস্তানে পৌঁছাতে পারা জিহাদের জীবন্ত কারামত এবং আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নুসরাত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতের মুশরিকরা শেষ দিন পর্যন্তও অবগত হতে পারেনি যে, কারাভ্যন্তরে এত অধিক পরিমাণ কাজ হচ্ছে এবং বিভিন্ন পন্থায় তা বাইরেও যাচ্ছে।

প্রবন্ধ ও কিতাবসমূহ বাইরে পাঠাতে যে পরিমাণ কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হত, তার অনুমান এ ঘটনা থেকে করতে পারবেন যে, অধম কয়েক কিস্তিতে 'ফাযায়েলে জিহাদ' কিতাবটি অন্য একটি দেশ দিয়ে ডাকযোগে পাকিস্তান পাঠাই। কিন্তু কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও কিতাবটি

পাকিস্তান পৌঁছার সংবাদ পাই না। প্রতীক্ষার এ দিনগুলো চরম অস্থিরতায় কাটে এবং পরিস্থিতি অনিশ্চিত হওয়ার ফলে অধিক কিছু লেখার মত আর সাহসও হয় না। যার মধ্যস্থতায় কিতাবটি বাইরে পাঠাই, সে ছিল খুব নির্ভরযোগ্য। কিন্তু কয়েক মাসেও কিতাব পৌঁছার সংবাদ না পাওয়ার ফলে সে পথটিও সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে সাবধানতাবশত আমরা এ পথের ব্যবহার সংকুচিত করি।

ইতিমধ্যে নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান সে মাধ্যমটি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এমন সময় একদিন আছর নামাযান্তে টহল দিতে দিতে দু'জন সাথীকে সবক পড়ানোর সময় আমার নিকট একটি কাগজ আসে। আমি হাঁটতে হাঁটতে কাগজটি পড়ছিলাম। আমার দৃষ্টি যখন এ সংবাদের উপর নিবদ্ধ হয় যে, 'ফাযায়েলে জিহাদ' কিতাবের পাণ্ডুলিপি নিরাপদে পৌঁছেছে। তখন আমি আনন্দাতিশয্যে চিৎকার করে অনিচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে পড়ে যাই। আমার সাথীরা আমাকে ধরে উঠায়। তারা যখন এ সংবাদ শুনে, তখন আমাদের সবার চোখ কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। আজ যখন প্রবন্ধ লিখে সাথে সাথে প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তা পৌঁছার সংবাদ লাভের সুযোগ পেয়েছি, তখন আমার সেই দিনের কথা স্মরণ হয়, যখন একেকটি প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য চরম কষ্ট করতে হয়েছে এবং স্বভাববিরুদ্ধ অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। আমি অতীতের সে অবস্থার জন্যও আল্লাহর শোকর আদায় করছি এবং বর্তমান অবস্থার জন্যও আল্লাহর শোকর আদায় করছি।

ওদিকে তিহার কারাগারে পৌঁছার পর লেখার সুযোগ লাভ করি, আর এদিকে পাকিস্তানে সাপ্তাহিক 'যরবে মুমিন' প্রকাশ হতে আরম্ভ করে। এভাবে আমার লেখা প্রকাশের জন্য উত্তম জায়গা বিনা পরিশ্রমে শুধুমাত্র আল্লাহর নুসরাতে লাভ করি। কারাগারে লিখিত আমার বেশীর ভাগ প্রবন্ধ 'যরবে মুমিন' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা আমাকে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখার এভাবে সুযোগ করে দেন। তিহার কারাগারে অবস্থানের শেষ সময় থেকে আরম্ভ হওয়া এ ধারা আমার মুক্তির দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমি সময় পেলেই প্রবন্ধ

লিখে পাঠাতে থাকি, আর যরবে মুমিনের ব্যবস্থাপকগণ নেহায়েত গুরুত্ব সহকারে সেগুলো প্রকাশ করতে থাকেন। পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনা, পবিত্র কুরআন হিফজ করা এবং পাঠদানের কাজে অধিক লিপ্ততা হেতু প্রবন্ধ পাঠানোর ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হলে নতুন রচিত সেসব কিতাবের নির্বাচিত অংশ কিংবা অধমের কোন পত্র প্রকাশ করে পত্রিকার শূন্যস্থান পূর্ণ করা হত। এভাবে আমার বন্দী জীবনে 'যরবে মুমিন' আমার অসম্পূর্ণ চিন্তা-চেতনার ভাষ্যকাররূপে কাজ করে। মুক্তিলাভের পর 'মা'রেকা' নামীয় কলামের মাধ্যমে 'যরবে মুমিনের'র সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রয়েছে। আল্লাহ পাক এ সম্পর্ককে কবুল করুন এবং একে আমার জন্য আখেরাতের পুঁজি এবং মাগফিরাতের উসীলা করুন।

কিছুদিন পূর্বে জানতে পারলাম যে, শ্রদ্ধেয় ভাই মুফতী আবু লুবাবা সাহেব (দাঃ বাঃ) অধমের সেই প্রবন্ধসমূহকে একটি কিতাব আকারে সংকলন করছেন, যেগুলো আমি বন্দীকালীন সময়ে লিখেছিলাম এবং যরবে মুমিনে প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত মুফতী সাহেব রুচিশীল সাহিত্যিক এবং মুসলিম উম্মাহর সমস্যাবলী সম্পর্কে আন্তরিক এবং বিদগ্ধ চিন্তানায়ক। তিনি যরবে মুমিনের মতাদর্শ ও সাংবাদিকতার প্রাসাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী স্তম্ভরূপে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম উম্মাহর দিশারীর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর মত ব্যক্তি আমার মত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ব্যক্তির প্রবন্ধসমূহ সংকলন করা এক অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। তবে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আমার নামের সাথে সম্পৃক্ত এসব প্রবন্ধ শুধুমাত্র আল্লাহর নুসরাতকে অবলম্বন করে মুসলিম উম্মাহ পর্যন্ত পৌছেছে। সুতরাং মুফতী সাহেবের এগুলো সংকলনের কাজে হাত দেওয়াও আমার জন্য আল্লাহর নুসরাতের এক ঈমানবর্ধক প্রত্যক্ষ।

সুধী পাঠক! আপনাদের হাতের এ বই 'খাঁচার ফাঁক গলিয়ে' শিরোনামের প্রবন্ধসমূহের সংকলন গ্রন্থ। এটি সেসব মুসলমানের জন্য আল্লাহর নুসরাতের সুস্পষ্ট নিদর্শন, যারা কুফরী শক্তির ভয়ে ভীত। সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, এসব প্রবন্ধ দুশমনের বেষ্টনি ভেদ করে পাকিস্তান কিভাবে পৌছল? এসব কিছু নিশ্চয়ই আল্লাহর নুসরাতেই সম্ভব হয়েছে।

প্রবন্ধসমূহ লিপিবদ্ধ করা, দুশমনের হাত থেকে সেগুলো সামলিয়ে রাখা, উপরন্তু সেগুলোকে দুশমনের মধ্যে অবস্থান করে পাকিস্তান পাঠানো এ সব কিছুই আল্লাহ তাআলার নুসরাতের সুস্পষ্ট কারিশমা। পাঠক, কিতাবটি পাঠ করুন, আর অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় করুন যে, আল্লাহ তাআলা সত্যই ঈমানদারদের সঙ্গে রয়েছেন। বড় থেকে বড় কুফরী শক্তিও আল্লাহর নুসরাত তাঁর বান্দাদের পর্যন্ত পৌছতে বাধা দিতে পারে না। আল্লাহর নুসরাত যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজে পৌছে। শত্রুর বেষ্টনি ভেঙ্গে দেয়। মোট কথা, এ কিতাব নিজেই মুসলমানদের জন্য আল্লাহর নুসরাতের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ পাক এ নিদর্শনকে সমস্ত মুসলমানের জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী বানিয়ে দিন। যাতে করে তাদের চোখে আল্লাহর বড়ত্ব এমন দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার ফলে, কুফরী শক্তিসমূহ তাদের চোখে মাকড়সার জালের মতই দুর্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সমীপে সবিনয় নিবেদন এই যে, অধম নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা ও অজ্ঞানতা অকপটে স্বীকার করছে। বিধায় এ বইয়ের কোন ভুল-ত্রুটি আপনাদের চোখে পড়লে একজন হিতার্থীরূপে তা আমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করবেন। এ কিতাব দ্বারা আপনারা বিন্দুমাত্র উপকার পেলে অধমের ক্ষমার জন্য এবং আখেরাতের সফলতার জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এর প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

মুক্তিলাভের পর প্রথম রমাযান

১৪১৪ হিজরীর ২৮শে শাবান আল্লাহ তাআলার বরকতপূর্ণ পথ অর্থাৎ জিহাদের পথে আমি বন্দী হই। ফলে বন্দী হওয়ার দু'দিন পরেই রমাযান মাস আরম্ভ হয়। কারাগারের বিরল ও বিস্ময়কর জীবনে আমি পূর্ণ ছয়টি রমাযান এবং সপ্তম রমাযানের সাড়ে ২১ দিন অতিবাহিত করি। আলহামদুলিল্লাহ, ১৪২০ হিজরীর পবিত্র রমাযানের ২২ তারিখে আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা আমাকে মুক্তভাবে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরে পৌছিয়ে দেন। কারা জীবনের রমাযান ছিল অপূর্ব। শেষ তিন রমাযান তো তারাবীহ নামাযে কুরআন শরীফ

শোনানোর কাজে পরিশ্রম করে অতিবাহিত হয়। এখনও আমার অনেক প্রিয় সঙ্গী কারাগারে বন্দী রয়েছেন। ফলে আমার কারা জীবনের রমাযানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ হতে থাকে। পবিত্র রমাযানে আমরা বন্দীরা পরামর্শক্রমে বিশেষ প্রোগ্রাম তৈরী করে নিতাম, যেন আমাদের প্রত্যেকের সময় মূল্যবান কাজে ব্যয় হয়।

পবিত্র রমাযান আগমন করার কিছুদিন পূর্বে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈঠক হত। এক বৈঠকে পবিত্র রমাযানের গুরুত্ব, মর্যাদা ও আদব ইত্যাদি বয়ান করার পর ইবাদতের কর্মসূচী তৈরী করা হত। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত যে, ব্যক্তিগতভাবে কে কাকে কুরআন মজীদ শোনাবে। সম্মিলিতভাবে তারাবীর নামায কে পড়াবে? প্রতিদিন কি পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা হবে? যবানের হেফাযত ও অন্যান্য গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য কিভাবে যত্ন নেওয়া হবে। সে বৈঠকে তাহাজ্জুদের পাবন্দী, অধিক কুরআন তেলাওয়াত, দুআর ইহতিমাম ও যবানের হেফাযত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাথীদেরকে উপদেশ দান করা হত। আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক হত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। যেমন সাহরীর খানা কে পাকাবে? ইফতারের সময় খাবার তৈরী করা কার দায়িত্বে থাকবে? বাসনপত্র ধোয়া ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ কে করবে? সাথীদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কে পালন করবে?

কারাগারের সীমিত জীবনে আমাদের পারস্পরিক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত বড় কোন সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের ন্যায় গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হত। তা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালানো হত। যেমন ঃ আমরা নিজেদের মধ্যে আইন করে নিতাম যে, কোন সাথী খাবার নষ্ট করবে না। ভাত–তরকারী, চা, রুটি মোটকথা যে কোন জিনিস নষ্ট না করার প্রতি আমরা যত্ন নেব। প্রথম পর্যায়ে সাথীদের জন্য এ কাজটি ছিল খুব কঠিন। কারণ, অতীতে তাদেরকে এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত রাখা হয়। সুতরাং এ বিষয়ে কারাভ্যন্তরে বেশী বেশী বয়ান হতে থাকে। প্রতিদিনের উৎসাহদান ও তাকীদের ফলে সাথীদের স্বভাবে বেশ ভাল পরিবর্তন এসে যায়। কিন্তু কিছু সাথী তারপরও এ ব্যাপারে যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করার জন্য এ বিভাগে একজন

তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে কেউ অসতর্ক থাকলে তাকে সামান্য শাস্তিদানের ব্যবস্থাও আরম্ভ করা হয়। এভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অনেক উপকারিতাই আমরা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। বিশেষভাবে খাদ্যে খুব বরকত দেখা দেয় এবং কারাগারের ভিতর আমরা এমন সব নেয়ামত লাভ করতে থাকি, যা সেখানে লাভ করা দুরুহ ব্যাপার ছিল।

পবিত্র রমাযানে ইবাদত ও কাজের ব্যবস্থাপনার প্রোগ্রাম তৈরী করে তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোরভাবে নেগরানী করা হত। পবিত্র রমাযানে গল্পের আসর ও ঝগড়া–বিবাদ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুৎসাহিত করা হত। যার পরিনতিতে আমাদের এককে ওয়ার্ডে প্রতিদিন ডজন ডজন কুরআন খতম হত। অনেক সাথী প্রতিদিন দশ পারার অধিক কুরআন তেলাওয়াত করার প্রতি যত্ন নিত। প্রথম দিকে কিছু সাথী তারাবীহ আদায় করার ব্যাপারে অলসতা করে। তবে যথাযথ ব্যবস্থাপনার কারণে তাদের অলসতা দূর হয়ে যায়। অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সাথীরা তারাবীহ পড়তে আরম্ভ করে। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে তারাবীহ নামাযান্তে তাফসীরের সারসংক্ষেপ আলোচনা করার ধারবাহিকতাও আরম্ভ করা হয়। তাতে নামাযে পঠিত অংশের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সারাংশ বয়ান করা হত। তারাবীহ ছাড়াও সাথীরা দু'জন চারজন করে পরস্পরকে কুরআন শোনাতে থাকে। এতে করে রমাযানের রাতসমূহে কুরআন তেলাওয়াতের নূরে পরিবেশ নূরানী হত। শেষ দশদিনে নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরও বেড়ে যেত। সাথীরা তারাবীহের সম্মিলিত নামায থেকে কয়েক রাকাত বাদ রাখত। তারপর নিজেরা সেই রাকাতসমূহে অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াত করে নিজেদের রাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করত। পবিত্র রমাযানের ফজর নামাযে গুরুত্ব সহকারে 'কুনুতে নাযেলা' পাঠ করা হত। অনেক সময় আধা ঘন্টা–পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত দুআ করা হত। দুআর মধ্যে সাথীরা উচ্ছসিতভাবে কান্নাকাটি করত। অনেক সময় তাদের আহাজারিতে কারা প্রাচীরকেও প্রকম্পিত মনে হত।

পবিত্র রমাযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল ছিল ইফতারের বিশ মিনিট পূর্বের তা'লীম। তা'লীমের মধ্যে 'ফাযায়েলে জিহাদ' কিতাবের পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হওয়ার পূর্বেই পাঠ করা হয়। এটি নিশ্চয়ই এ

কিতাবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তা প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর পথের বন্দীদের মাঝে তার তা'লীম হয়েছে। কমাণ্ডার শহীদ সাজ্জাদ আফগানী (রহঃ)এর মত সত্যিকারের মুজাহিদ নেহায়েত উৎসাহভরে ও গুরুত্ব সহকারে তা'লীমে অংশগ্রহণ করতেন। সে বৈঠকে ফাযায়েলে জিহাদ ছাড়া আরো কয়েকটি কিতাবের তা'লীম করা হত। যার মধ্যে ফাযায়েলে আ'মাল, আনোয়ারুর রশীদ, ফাযায়েলে সাদাকাত এবং হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহঃ)এর আপবীতী (আত্মজীবনী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন কোনদিন তা'লীমের পরিবর্তে সম্মিলিতভাবে দুআ করা হত। দুআর মধ্যে অনেক সময় সম্মানিত মুজাহিদগণের অবস্থা কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে যেত।

পবিত্র রমাযানে আরবী কিতাবের সবকও চালু থাকত। শেষ রমাযানে যেসব কিতাবের সবক পড়ানো হচ্ছিল, তার মধ্যে বুখারী শরীফ, উসূলুশ শাশী, হিদায়াতুন নাহু ও কুদুরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র রমাযানে মুজাহিদগণ একে অপরকে ইফতারীর দাওয়াতও দিত। কিছু পারদর্শী মুজাহিদ সাথী পাকুরা, সমুচা, জিলাপী ও অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরী করার চেষ্টা করত। বড় বড় কারাগারে মুজাহিদরা এ ধরনের কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের টর্চারিং সেন্টারসমূহ এবং ছোট ছোট কারাগারে অতি কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মুজাহিদদের রমাযান অতিবাহিত হয়। আমরা নিজেরাও প্রথম রমাযান পৃথক দুটি টর্চারিং সেন্টারে অতিবাহিত করি। পবিত্র রমাযান মাসে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দাতা মুশরিকরা রমাযান মাসেও বন্দীদের উপর পাশবিক নির্যাতন ও অমানবিক বর্বরতা অব্যাহত রাখত। আমাদের কয়েকজন মুজাহিদ সাথী এ রমাযানটিও টর্চারিং সেন্টার ও কারাগারে অতিবাহিত করছেন। সে বীর ভাইদেরকে দুআর মধ্যে স্মরণ রাখা এবং তাদের মুক্তির জন্য সর্বোতভাবে জানমালের কুরবানী করাকে সৌভাগ্য মনে করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে দীর্ঘ সাত বছর অন্তে মুক্ত অবস্থায় আমি রমাযানের চাঁদ দেখি। এ নেয়ামত পেয়ে আমি আল্লাহর যতই শোকর আদায় করি না কেন, তা কমই বটে। পবিত্র রমাযান মাসে পবিত্র

মক্কা–মদীনা যেয়ারত করার সীমাহীন বাসনা ছিল এবং কয়েকজন বন্ধুর পক্ষ থেকে এর বাহ্যিক ব্যবস্থাপনাও পেশ করা হয়। এমনিভাবে বিশেষ কোন জায়গায় বসে রমাযানের আধ্যাত্মিক স্বাদ লুটে নেওয়ার চিন্তাও অন্তরে জাগে। কিন্তু যে আমলের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাকে রেহাই দান করেছেন এবং যে আমলের (অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ করা) প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক নির্যাতিত ও প্রত্যেক নিরাপদ মুসলমানের জন্য শ্বাসগ্রহণ অপেক্ষা অধিক জরুরী, সে আমল আমার নিকট এবং আমার সাথীদের নিকট রমাযান মাসে জিহাদের কাজে খুব বেশী করে পরিশ্রম করার আবেদন করছে। যাতে করে আগামী মাসগুলোতে জিহাদের এ কাজকে অধিক সুসংহত, সুশৃঙ্খল, সুদৃঢ় ও প্রভাবশালী করা যায়। জিহাদের সে আবেদনে লাব্বাইক বলে জাইশে মুহাম্মাদের সমস্ত দায়িত্বশীল সারাদেশে জিহাদের দাওয়াত ও জিহাদের উপকরণ সংগ্রহের কাজে গলিতে গলিতে ঘোরাফেরা করছে। তারা পবিত্র রমাযানের শ্রেষ্ঠতম মাসে জিহাদের মত শ্রেষ্ঠতম কাজে নিজেদেরকে অক্লান্তভাবে কাজে লাগাতে পেরে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছে। এখন প্রয়োজন হল, যারা ইসলামকে ভালবাসে তাদের প্রত্যেকে জিহাদের জন্য পাগলপারা এ লোকদেরকে সর্বোতভাবে সাহায্য করা, যারা নিজেদের স্বার্থকে বিস্মৃত হয়ে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে হাজির হচ্ছে।

আইন যেখানে বিকল

আধুনিক যুগের মানুষের স্বরচিত আইনের জন্য বড় অহংকার। তারা নিজেদের নতুন নতুন আবিস্কারের অহংকারে ফুলছে। মাটিতে যেন পা পড়ছে না। মানুষ যেন এখন ফুলে বেলুনে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান যুগের আবিস্কারসমূহের স্বরূপ সম্পর্কে পরবর্তী কোন বৈঠকে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। আজকের বৈঠকে সুধী পাঠকদেরকে একটি সত্য ঘটনা শোনানো আমার উদ্দেশ্য। যে ঘটনায় বিশ্বের অসংখ্য আইন চরমভাবে পর্যদুস্ত হয়।

সুধী পাঠক! আপনারা অবগত আছেন যে, এ যুগের জালেমরা মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানাধরনের বাজে আইন তৈরী

করেছে। এসব আইনের কারণে এক দেশের অধিবাসীকে অন্য দেশে যেতে হলে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়। যেমন সর্বপ্রথম তাকে নিজ দেশের পাসপোর্ট তৈরী করতে হয়। (এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় খুলে বলা জরুরী মনে করছি যে, কোন কোন পাঠক আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, পাসপোর্ট ইত্যাদি তৈরী করা ও ভিসা গ্রহণ করার মত আইনসমূহ তো খুবই জরুরী ও উপকারী। এ ধরনের জরুরী আইনকে বাজে বলার কি কারণ থাকতে পারে? এ ব্যাপারে নিবেদন করছি যে, আপনি গভীরভাবে ভেবে দেখলে এবং বিশ্বের প্রচলিত আইন-কানুনকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবেন যে, এসব আইনের মূল উদ্দেশ্য মুসলমানদের সংহতিতে ফাটল সৃষ্টি করা এবং তাদের সম্মিলিত দায়িত্বসমূহ যেমন জিহাদ করা, পরস্পরের সহযোগিতা করা, খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। সুধী পাঠক! বেদনাবিধূর এ দাস্তান রেখে মূল আলোচনায় ফিরে আসুন) পাসপোর্ট তৈরী করার পর গন্তব্য দেশের ভিসা নিতে হয়। তারপর কোন আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানী থেকে টিকিট খরিদ করতে হয়। বিমান বন্দরে পৌছে আরো অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। কয়েকটি ফরম পূরণ করতে হয়। তাতে সীলমোহর লাগাতে হয়। তারপর গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরেও বহু আইনের জাল বিস্তৃত থাকে। সেসব আইনের দাবী পুরা করতে করতে মানুষের পা ক্লান্ত হয়ে যায়। পাসপোর্টের কয়েক পৃষ্ঠা কালো হয়ে যায়। নোট খরচ করতে করতে পকেট হালকা হয়ে যায়। কেউই এসব আইনের বাইরে থাকে না। এমনকি কোন দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী সফর করলে তাকেও এসব আইনের অধিকাংশকে অতিক্রম করতে হয়। তবে তাদেরকে নিজেদের কোন পরিশ্রম করতে হয় না। সে এক ভিন্ন কথা।

তবে গত বছরের পবিত্র রমাযান মাসের ২২ তারিখে আল্লাহ তাআলা এ অধমকে যে সফরের তাওফীক দান করেন, সেখানে আইন প্রণেতারা অসহায় হয়ে নিজেরাই সব আইন ভেঙ্গে দেয়। আমার নিকট পাসপোর্ট ছিল না এবং ভিসাও ছিল না। আমাকে টিকিটও খরিদ করতে হয়নি এবং ইমিগ্রেশনের ধাপসমূহও পার হতে হয়নি। উপরন্তু যে দেশের

মাটিতে আমি বিমানে আরোহণ করি, আমি ছিলাম সে দেশের একজন বন্দী। যে দেশে আমি অবতরণ করি, সে দেশে আন্তর্জাতিক বিমান অবতরণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে আমার সফর ছিল অসম্ভব। কমপক্ষে বিশটি আন্তর্জাতিক আইন এমন ছিল, যার ভিত্তিতে আমার ভারত থেকে কান্দাহার পৌঁছা অসম্ভব ছিল। কিন্তু পবিত্র রমাযানের ২২ তারিখ জুমুআর দিন এ ধরনের সমস্ত আইন মুখ থুবড়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলার নুসরাতের আইন আত্মপ্রকাশ করে।

সুবহানাল্লাহ! জুমুআর দিন এগারোটার সময় আদালতের রায় ছাড়াই কারাগারের দরজা খুলে যায়। তারপর জম্মু বিমানবন্দর থেকে ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক বিমান একজন শত্রুকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার জন্য আকাশে উড়তে বাধ্য হয়। দিল্লী বিমান বন্দরে পাসপোর্ট, ভিসা, ইমিগ্রেশন, বোডিং কার্ড ও সফরের অন্যান্য কাগজপত্র ছাড়াই বড় একটি বিমানে সিট পেয়ে যাই। বিরাট এ বিমান আল্লাহর পথের বন্দী কয়েকজন ফকীরকে কান্দাহার পৌঁছানোর জন্যই আকাশে ওড়ে। তারপর বিমানটি কান্দাহারে এমন সময় অবতরণ করে, যখন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ঠিকাদারেরা সেখানে ভীনদেশী বিমানের অবতরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তারপর সফরের কাগজপত্র ছাড়াই কান্দাহারে প্রবেশ করি। অবশেষে এমন এক ফকীর ব্যক্তি, যার পকেটে একটি টাকা পর্যন্ত ছিল না, দুটি দেশ অতিক্রম করে স্বদেশে প্রবেশ করে।

হে বিশ্বের মুসলমানরা! তোমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত হওয়ার জন্য এ ঘটনা কি যথেষ্ট নয়? এ ঘটনা কি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুসলমানদের সঙ্গে আছেন। এ ঘটনা কি আমাদেরকে দুনিয়ার শক্তিশালী আইনসমূহ মূল্যহীন ও দুর্বল হওয়ার কথা বুঝিয়ে দেয় না? এ ঘটনা কি আমাদের বলে দেয় না যে, যদি আমরা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে জিহাদের পথ অবলম্বন করি তাহলে বিশ্বের কুফরী ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে?

ঈদের শ্লোগান

মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে, তাদেরকে পরস্পরে মারমুখী করে এবং তাদেরকে পরস্পরের শত্রু বানিয়ে কাফেররা আনন্দবোধ করে

থাকে। তারা এসব কাজকে জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মিশন মনে করে। কিন্তু ইসলাম সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে ঐক্যসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করে। জামাতের নামায, পবিত্র রমাযানের সম্মিলিত ইবাদতসমূহ, জিহাদের ময়দানে এক আমীরের অধীনে কার্য সম্পাদন এবং ইসলামের অন্যান্য বিধানসমূহ মুসলমানদেরকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বানায়। পরস্পরকে পরস্পরের অঙ্গে পরিণত করে। উপরন্তু ঈদের আনন্দ মুসলমানদেরকে পরস্পরের প্রতি সদয় আচরণে ও মধুর সম্পর্কে একাকার করে দেয়। মুসলমানদের সম্মুখে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেকটি ঈদ আগত প্রায়, কিন্তু ঈদের এ আনন্দঘন মুহূর্তে কাফেররা মুসলমানদের সম্পর্ককে তিক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যথা ঃ

১. আমেরিকার ভৃত্য জাতিসংঘ ইসলামী দেশ আফগানিস্তানের উপর বেশ কয়েকটি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জাতিসংঘ তালেবান কর্তৃপক্ষের মুসলমান মেহমান শায়েখ উসামা বিন লাদেনকে কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করার দাবী করেছে। এ দাবীর পিছনে মুসলমানদের মাঝে ভাঙন সৃষ্টি করা এবং একটি নিখাঁদ ইসলামী দেশকে দুর্বল করার যে দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে, তা কারো অজানা নয়।

২. ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ছলচাতুরী নির্ভর যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ আরো একমাস বৃদ্ধি করেছে, যেন হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতারা পরস্পরে কলহে লিপ্ত হয়, মুজাহিদদের মধ্যে মতবিরোধের প্রাচীর প্রতিবন্ধক হয় এবং মুজাহিদদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সম্পর্ক তিক্ততার শিকার হয়।

৩. মধ্যপ্রাচ্যে পুনরায় তথাকথিত শান্তি আলোচনার ঘোষণা করা হয়েছে, যেন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্যের খাদ আরো অধিক গভীর করা যেতে পারে এবং ইসরাঈলের কট্টরপন্থীরা আগামী নির্বাচনে এর ফায়দা লুটতে পারে।

কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টির এ অশুভ তৎপরতা দেখে আমার কারাগারে অতিবাহিত একটি ঈদের সেই শ্লোগান স্মরণ হচ্ছে, যা কুফরী শক্তির ষড়যন্ত্রসমূহকে মাকড়সার জালের মত

ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোট ভলওয়াল কারাগার কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজাকিস্তান ও লেবাননের মুজাহিদদেরকে কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে রেখেছিল। এমনকি হাসপাতালে যাতায়াতের পথেও কড়া দৃষ্টি রাখা হত, যেন আমাদের মধ্য থেকে কেউ কোন কাশ্মীরী মুজাহিদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে না পারে। উপরন্তু পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টাও অব্যাহত রাখ হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের মধ্যে ইসলামের ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তারা বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে পরস্পরে দেখা সাক্ষাতের গোপন পথও আবিস্কার করে।

পবিত্র রমাযানের শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর পথের সকল (স্থানীয় ও বহিরাগত) বন্দী কারাকর্তৃপক্ষের নিকট ঈদের দিন তাদের পরস্পরে দেখা–সাক্ষাতের সুযোগ দানের দাবী জানায়। দাবীর তীব্রতা দেখে কারা কর্তৃপক্ষ সম্মতি প্রদান করে। কিন্তু ঈদের দিন এলে তারা দেখা সাক্ষাত করতে দিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। ঈদের দিন সকালবেলা কারা কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করানো হলে, তারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বলে যে, আমরা তো আপনাদেরকে সাক্ষাত করাতে চাই ঠিকই, কিন্তু কাশ্মীরীরাই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে রাজি নয়। কারা কর্তৃপক্ষের এমনতর আচরণ দেখে আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ বৈঠক করি। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ইনশাআল্লাহ, যে কোন মূল্যে আজকে আমরা কাশ্মীরী মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাত করব। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে সকল মুজাহিদ ছাদে আরোহণ করে হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টিকারী বজ্র শ্লোগান শুরু করে। কাশ্মীরী মুজাহিদরা মেহমান মুজাহিদদেরকে শ্লোগান দিতে দেখে নিজেরাও তাদের ব্যারাকের ছাদে আরোহণ করে বজ্র শ্লোগান আরম্ভ করে। মুজাহিদরা অপূর্ব আঙ্গিকে আবেগ ও মত্ততা ভরে শ্লোগান দিতে থাকে। কারাগারের লোহার দরজা ও টাঙ্কিসমূহে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের এ প্রতিবাদ তীব্রতর হতে আরম্ভ করে। মুজাহিদরা কম্বল ও অন্যান্য জিনিসে আগুন ধরাতে থাকে এবং শ্লোগান দিতে দিতে জানায় যে, কিছুক্ষণ পর আমরা

চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করব। এ অবস্থা দেখে কারা কর্তৃপক্ষের হাত, পা, কাঁপতে আরম্ভ করে। কিছু সময় আলোচনার পর তারা সাক্ষাতের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। তখন আকাশ মুজাহিদদেরকে কান্নারত অবস্থায় পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া ও পরস্পরের মুখে মিষ্টি তুলে দেওয়ার অপূর্ব সেই দৃশ্য অবলোকন করে।

নিঃসম্বল কয়েদীদের এ ঘটনা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা মুসলমানরা পরস্পরে মিলিত হওয়ার সংকল্প করলে আমাদেরকে কেউই ভাঙতে পারবে না।

যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি

ক্ষমতাবলে মুসলমানদের শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না, তেমনিভাবে যুদ্ধের ময়দানেও মুজাহিদদেরকে পরাস্ত করা যে সম্ভবপর নয়, তা ভারতের মুশরিদের খুব ভাল করেই বুঝে এসেছে। ফলে শক্তির মদে মত্ত মুশরিকরা এখন বারবার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে চলছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গা বাঁচিয়ে আলোচনার টেবিলে যাচ্ছে। আমাদের সচেতন পাঠকগণ অবগত আছেন যে, রমাযানের প্রারম্ভে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী একতরফাভাবে 'রমাযানের সম্মানের' প্রতারণা দিয়ে একমাসের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছিল। রণাঙ্গনে তৎপর মুজাহিদরা প্রহসনমূলক এ প্রস্তাবকে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সমর তৎপরতা তীব্রতর করেছে। কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হুররিয়াত কনফারেন্সে বাজপেয়ীর এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ভাঙ্গনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিশ্রান্ত কিছু রাজনীতিক বাজপেয়ীর প্রস্তাবকে মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করেছে। পরাজিত ভারত সরকারের জন্য এ অবস্থা ছিল কিছুটা সান্ত্বনাদায়ক। সুতরাং তারা কাশ্মীরীদের মধ্যে মতানৈক্যের খাদকে অধিক গভীর করার উদ্দেশ্যে আরও একমাস যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে। এখন এ বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট যে, তথাকথিত প্রহসনমূলক এ যুদ্ধবিরতির তিনটি লক্ষ্য রয়েছে—

১. কাশ্মীরের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করা।

২. কাশ্মীরে যুদ্ধরত মুজাহিদ সংগঠনসমূহের মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত নামে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা।

৩. আন্তঃজাতীয় গুণ্ডাদের আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের শান্তিপ্রিয়তার ঢোল পিটিয়ে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

এ পর্যায়ে এ বিষয়টিও আর রহস্যাবৃত নয় যে, উপমহাদেশে মুজাহিদদের তৎপরতা দেখে আমেরিকা ও তার মিত্রদের দিশাহারা হওয়ার অবস্থা। তাই তারা টোপ দিয়ে কাশ্মীরের জিহাদকে তার কাংখিত ফলাফল লাভ হওয়ার পূর্বেই অতিসত্বর বন্ধ করাতে চায়। সুতরাং হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতাদেরকে পাকিস্তান সফর করার জন্য পাসপোর্টও দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের কাশ্মীরী মুসলমান ভাইদেরকে পাকিস্তান আগমনের জন্য স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করছি যে, কাশ্মীরের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এক টেবিলে বসে ঘাতক বেনিয়া আর ডাকাত ক্রুশধারীদের ইঙ্গিতে যে চক্রান্তের খেল খেলা হচ্ছে, তার মূলোৎপাটন করবেন। কিন্তু ভারতের প্রত্যাশা অনুপাতে হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতাগণ এবং কাশ্মীরের সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, কিংবা হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতারা কাশ্মীরের ভেতরের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে দৃষ্টি হটিয়ে সামরিক সংগঠনসমূহের মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত বিভেদের আগুনে হাওয়া দেয়, তা হলেও ভারত ক্ষণস্থায়ী আনন্দের অধিক কিছু লাভ করতে পারবে না।

যেসব মুসলমান জিহাদকে ভালবাসে ও জিহাদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তারা খুব ভালভাবেই অবগত আছে যে, জিহাদের ময়দানে বিভিন্ন পরিস্থিতি সামনে আসে। আফগানিস্তানের বরকতপূর্ণ আন্দোলন চলাকালে যে উত্থান পতন ঘটে, তা সব মুসলমানেরই জানা। কিন্তু পরিশেষে শহীদদের খুন তার কারিশমা দেখিয়েছে। আর তা সকল ষড়যন্ত্রকারীরই মৃত্যুর পরওয়ানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক একইভাবে কাশ্মীরের আন্দোলনেও নতুন এক পরিস্থিতি অল্প কয় দিনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। তাতে কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক

সংগঠনসমূহের মধ্যে মতানৈক্যের বাতাস বইবে। যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনা চলবে। কিছু মুখোশধারী তাদের মুখোশ খুলে ফেলবে। মুসলমানদের জন্য বিচলিতকর কিছু সংবাদ পত্রিকার হেড লাইন হবে। আমাদের কিছু অপরিণত বুদ্ধিজীবি তাদের কলম দ্বারা মুজাহিদদের উপর তীর বর্ষণ করবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের মধ্যেই মুজাহিদদের আক্রমণ আর শহীদদের সুরভিত খুন সমস্ত ধূলোঝড়কে দাবিয়ে দেবে।

তাই অধম সমস্ত মুসলমানের নিকট আবেদন করছে যে, আপনারা পত্রিকার শিরোনাম আর কিছু লোকের দৌড়ঝাঁপ দেখে বিচলিত হবেন না। কাশ্মীরের রণাঙ্গন থেকে দূরে উপবিষ্ট দুই নেতার সন্তানের আনন্দ কাশ্মীরের অবস্থার উপর অতটুকু প্রভাব ফেলে না, আত্মমর্যাদাশালী মাতাদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সন্তানদের শাহাদাত যতটুকু প্রভাব ফেলে।

শ্রীনগরের সামরিক হেডকোয়ার্টারে শহীদ বেলাল (রহঃ) অতুলনীয় কুরবানী পেশ করে বাজপেয়ীর যুদ্ধবিরতিকে আড়াই মণ বারুদের আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছে। পত্রিকায় হাজার বিবৃতি আসুক আর নেতারা পরস্পরে লক্ষ বিতর্ক করুক, কপঅড়া থেকে নিয়ে হিন্দুওয়াড়া পর্যন্ত পাহাড়-পর্বতে মোর্চা গেড়ে বসা মুজাহিদদের উপর এর কোনই প্রভাব পড়বে না। খোদার সিংহরা আযাদীর জন্য লড়ছে, যুদ্ধবিরতির জন্য নয়। গন্তব্যে পৌঁছার আগ পর্যন্ত পিছু হটার বা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রশ্নই আসে না।

যে প্রেমিক পানপাত্রের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না

মানুষ যা পাওয়ার জন্য পরিশ্রান্ত হয়, বাহ্যত তিনি তার সবই হারিয়েছেন। বিনিময়ে মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার আকাংখা করেছিলেন তাই তিনি লাভ করেছেন। সুধী পাঠক! আমি শহীদ বেলাল (রহঃ)এর কথাই বলছি। তার অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আর উজ্জ্বল কৃতিত্ব এখন আমার চোখের সামনে ভাসছে। শান্তিপ্রিয়, সুদর্শন, সুন্নাতের অনুসারী, কিছুটা কৃশ কিন্তু সুদৃঢ়, সুদর্শন চেহারায় ঘন কৃষ্ণ দাড়ি, গভীর দৃষ্টিতে নিষ্পাপের ছায়া, সংকল্পপূর্ণ হৃদয়, বাসনাপূরণে আপোষহীন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপ-গঠন, কিন্তু সহজ সরল জীবনের অধিকারী, কষ্টসহিষ্ণু, বিশ্বস্ত, শরীয়তের বিধিমালার পূর্ণ

অনুসারী, বন্ধুদের হৃদয়ের মানুষ, আল্লাহর হুকুমের ক্ষেত্রে পূর্ণ ওফাদার, ব্যক্তিত্বের অধিকারী সেই শহীদ বেলাল। তিনি বৃটেনের বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করেন। উন্মাদনাপূর্ণ বন্ধুত্ব, ইউরোপের বিস্বাদপূর্ণ সৌন্দর্য, জগতের অন্তঃসারশূন্য হৈহুল্লোড় আর কৃত্রিমতা ও কপটতার সোনালী শিকল বেশী দিন তার গলার বেড়ি হতে পারেনি।

বৃটেনের লাল পাসপোর্ট, যার জন্য মানুষের লালা ঝরে, যা লাভ করার জন্য মানুষ নিজের জমিজমা এমনকি আত্মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে। যে পাসপোর্টের জন্য কিছু কিছু মানুষ জান্নাতের পথ পর্যন্ত পরিহার করে। যা লাভ করার জন্য নকল বিবাহ ও এমন জাল কাগজের আশ্রয় নেওয়া হয়, যা ইংরেজ উপনিবেশবাদকে অব্যাহত রাখার নতুন ও কার্যকরী পন্থা—যা দাসত্বের সোনালী শিকল। সেই পাসপোর্ট, যা লাভ করে অনেক মানুষ নিজের সুন্দর অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আদর্শের দুশমন হয়ে যায়, নিজের কাছে নিজের ভাষা ও রূপ খারাপ মনে হয়। সেই পাসপোর্ট, যা লাভ করে অনেক মানুষ মাটির বুকে চলার পন্থা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং কৃত্রিমতার এমন খাদে নিপতিত হয়, যেখানে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় এবং আত্মবিস্মৃতির সেই পদস্খলন তাকে আল্লাহ বিস্মৃতির গহীন খাদে নিক্ষেপ করে। সেই পাসপোর্ট, যার মূল্য ও মর্যাদাদাতা তা লাভ করার জন্য নিজে জায়গায় জায়গায় অপদস্ত হয়। কিন্তু শহীদ বেলাল, সে পাসপোর্টের আলোহীন রঙ্গের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। তিনি তাকে ব্যবহারযোগ্য মূল্যহীন পুঁজি মনে করেছেন। তিনি জিহাদের ময়দানের স্বাদ আস্বাদন করে নিজের কাছে পাসপোর্ট থাকল কি থাকল না, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। তার ঘটনা থেকে বিশ্ববাসী শিক্ষা লাভ করেছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি খাঁটি উম্মতের পরিচয় প্রথমে সে মুসলমান, তার পরে অন্যকিছু।

শহীদ বেলাল সাংগঠনিক দায়িত্ব ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের অভিজ্ঞতাও লাভ করেন। কিন্তু তিনি তার কাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য সবকিছুকে বিলিয়ে দেওয়ার মত উচ্চ সাহস ও আবেগ অন্তরে পোষণ

করতেন। সুতরাং আদেশ দানের মত্ততা আর মোহ সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যা তার বেড়ি হতে পারেনি। উপরন্তু তিনি জিহাদের ময়দানে প্রধান কমাণ্ডের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু তার অবস্থান তো আরো উর্ধ্বজগতে। জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত দিবস রজনী ও তার ঈমানী স্বাদ তাকে সেই উচ্চতায় আরোহণ করতে বাধ সাধতে পারেনি, যেখানে আরোহণের জন্য তার ডানা ঝাপ্টাচ্ছিল। আত্মদানের নেশা তাকে অনুরক্ত বানিয়ে দেয়। জ্বি হ্যাঁ, সেই আত্মদান, যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা উৎসর্গ ও কুরবান হয়ে যায়।

পবিত্র রমাযানের অপার্থিব ভাবময় ও চিত্তহারী রজনীসমূহে তিনি সে বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, যা সকলে করতে পারে না। জানিনা, কত অশ্রু, কত দুআ, কত মুনাজাত আর কি পরিমাণ মাথাকোটার পর সেই শুভদিনের আগমন ঘটে, যেদিন শ্রীনগরের সেনা সদর দফতরে প্রেমমত্ত এ তরুণ প্রেম ও ভালবাসার এমন খেল দেখিয়েছেন যে, মুহূর্তের মধ্যে তিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হন। এক মুহূর্তে তিনি ইল্লিয়্যীনের অধিবাসী এবং ইসলামের ইতিহাস গগনের নক্ষত্র হয়ে যান। সব কিছুকে হারিয়ে তিনি প্রেমিকদের সেই নীড় লাভ করেন, যারকথা মুখে অনেকেই বলে, কিন্তু লাভ করে অল্প সংখ্যকই। শহীদ বেলালের একজন ব্যথিত-হৃদয় বন্ধু আমাকে নিম্নের কবিতাটি শোনান। তার কবিতা শুনে বেলালের অস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, চোখকে অশ্রুসিক্ত করে।

مقام کرگس و شاہیں ہے اپنے ظرف کی بازی
جو ٹھکرادے صراحی کو اسے پیمانہ ملتا ہے

শকুন আর ঈগল একই আকাশে বাস করলেও
তাদের মনোবল ও উচ্চ সাহসিকতার কত তফাৎ!
যে প্রেমিক সুরাহির পানে ভ্রূক্ষেপ করে না, সেই তো
প্রেমমদিরায় কানায় কানায় পূর্ণতা লাভ করেন।

হে আল্লাহ! রহম কর!

দুনিয়ার হুকুমাত যখন জালেমদের হাতে থাকবে,তখন স্বভাবতই জুলমের বিস্তার ঘটবে। তমাসার বণিকরা কিরূপে আলো বিতরণ করবে? তথাকথিত উন্নতি ও প্রগতির চোখ ঝলসানো পরিস্থিতিতেও মানুষ অনাহারে মরছে। কেউ মৃত ও অপবিত্র খাদ্য গলধঃকরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে দেহের রক্ত ও অঙ্গ বিক্রি করে পেট পালছে। এতদসত্ত্বেও সর্বত্র একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে, আমরা এখন উন্নতির যুগে এসেছি। আমাদের মধ্যে প্রগতি এসেছে। কত মানুষকে উন্নতি আর প্রগতির শ্লোগান শুনিয়ে আত্মহত্যার মত ভয়ংকর পাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। জালেম এ সমাজের আবেদন পূরণ করতে উপমহাদেশের অনেকে আপন সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করছে।

দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী। শান্তি আজ সোনার হরিণ। মানব প্রেম দুষ্প্রাপ্য। বিশ্বস্ততা ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সংগুণ প্রায় নিঃশেষ। নতুন ও জটিল ব্যাধিসমূহের প্রাদুর্ভাব সর্বত্র। নোংরামী ও অপবিত্রতার স্তূপ–আবর্জনারূপে, কোথাও শরাবখানা, নাইটক্লাব আর কোথাও পতিতালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। হে আল্লাহ! মানুষ এখন কোথায় যাবে? কোনদিকে আশ্রয় নিবে? পান করার মত স্বচ্ছ পানি আর শ্বাস গ্রহণের মত সতেজ বাতাসেরও অভাব। টাকা পয়সার লোভে সর্বত্র নোংরামী ও অপবিত্রতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। আগের মানুষ শক্তিশালী ছিল, অথচ আজ মানুষ কাগজের মত দুর্বল। পূর্বে রোগব্যাধি ছিল বিস্ময়ের ব্যাপার। আজ সুস্থতা অপরিচিত ও বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি যেমন পেট্রোল ছাড়া এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না, তেমনিভাবে ঔষধ ছাড়া মানুষ সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না। অসুস্থ মস্তিষ্কের ডাক্তার ক্ষতিকর ঔষধ দ্বারা অধিক ব্যাধির বিস্তার ঘটাচ্ছে। পূর্বে শান্তি মানুষকে তালাশ করত। আর এখন মানুষ শান্তিকে তালাশ করে ফিরছে?

বর্তমান বিশ্ব অদ্ভুত বৈপরিত্ত্বের শিকার। কিছু মানুষ অতি ভোজনের কারণে পেট ফেটে মরছে, আর কেউ উপবাসের কারণে। কারো নিজের সম্পদের পরিমাণও জানা নেই, আর কারো নিজের অভুক্ত রজনীর

সংখ্যা গুণে শেষ করা জটিল। একদিকে মেকাপ ও প্রসাধনীর পরতে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত মুখমণ্ডলসমূহ, আর অপরদিকে নিস্প্রভ চোখ, মলিন চেহারা, শীতল হাত। একদিকে চর্বির স্তূপ আর ওজন কমানোর চিন্তা, অপরদিকে পাঁজরের দুর্বল হাড্ডি হাতে গণা যায়। এতসব বৈপরিত্য সত্ত্বেও অট্টালিকা আর ঝুপড়ী সর্বত্রই অশান্তি, অস্থিরতা, ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা ব্যাপক। কুফর ও আত্মপূজার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা মানবতাকে এছাড়া আর কি দিতে পারে? ইসলাম ধনীদেরকে বদান্যতা আর দরিদ্রদেরকে অল্পে তুষ্টি শিক্ষা দিয়ে পৃথিবীর পরিবেশকে শান্তিময় করেছিল। কিন্তু পবিত্র সেই ব্যবস্থাকে মুসলমানদের হাত ধরে রাখতে পারেনি। তবে সমস্যার সমাধান এখনও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন না করা হলে অত্যাচার, অবিচার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অন্ধকারের বিস্তার হতে থাকবে। মুসলিম উম্মাহর উপর বঞ্চনার ভয়ংকর ছায়া প্রলম্বিত হতে থাকবে। জালেমরা পাপ ও অপকর্ম দ্বারা রোগব্যাধির বিস্তার ঘটিয়েছে। ডাক্তারের ফিস ও ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

এমত পরিস্থিতিতে দরিদ্র লোকেরা কোন দিকে যাবে? ধুঁকে ধুঁকে মরবে? নাকি অপরাধের পথ বেছে নেবে। এদেরকে নিয়ে কে ভাববে? এদের দুঃখ-কষ্ট কে উপলব্ধি করবে? জালেমরা গোনাহ সস্তা করেছে। বিবাহশাদীকে দুর্মূল্য করেছে। আত্মমর্যাদাশালী নারীরা কোথায় যাবে? যৌতুক ও সামাজিক প্রথার নাগিনী তাদের জীবনকে বিষাক্ত করেছে। মাতাপিতা ও বংশের তথাকথিত মর্যাদা অজগররূপে যুবকদেরকে দংশন করছে। বিধ্বস্ত করছে। জালেমরা মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অসহায় মানবতাকে স্বর্ণচাঁদির নিঃশর্ত দাস বানিয়েছে। লাইট, পাখা, গ্যাস, গাড়ী, এয়ারকণ্ডিশন, কাপড়ের স্তূপ, শ্যাম্পু, ক্রিম, মর্মর পাথর নির্মিত গৃহ, নরম বিছানা, নানারকম ঔষধ, হাসপাতাল, চেকাপ আরো নাজানি কত কিছুর দাস মানুষ হয়েছে। সারাদিন উপার্জন করে। রাতদিন দৌড়ঝাঁপ করে, কিন্তু অভাব মোচন হয় না। পূর্বে অল্প কয় টাকা ব্যয়েই সন্তান প্রসব হত। এখন সন্তান হতে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়, তবুও সুস্থ সন্তান জন্মে না।

জালেমরা জমিনকে সারের আর পশুকে ইনজেকশনের নেশাগ্রস্ত বানিয়েছে। জালিমরা উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পাহাড়ের নৈসর্গিক রূপ–লীলা ও জলপ্রপাতের সৌন্দর্য ছিনিয়ে নিচ্ছে। জালেমদের বৈষয়িক লালসা গাছপালা, লতাপাতা, নদীনালা ও ঝর্ণাসমূহ উজাড় করে দিয়েছে। এ কেমনতর উন্নতি যে, মানুষ শ্বাস গ্রহণের জন্য তাজা বাতাস আর পরিস্কার পানিও লাভ করতে পারছে না?

এতসব প্রকট ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সবাই অগ্নির দিকে, ধ্বংসের দিকে বুঝে না বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি টাকার পাগল। অধিক জমিন ও আসবাবের জন্য লালায়িত। যে রোগী জঠরে দু' গ্রাস রুটিও সহ্য করতে পারে না, সেও টাকার স্তূপ গড়ার স্বপ্নে বিভোর। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বৈষয়িক বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীন ও ইনসানিয়াতকে পদে পদে বলি দেওয়া হচ্ছে। হত্যা করা হচ্ছে। আরও করা হবে। মানুষ দেহের গুর্দা আর কবরস্থানের মুর্দা বিক্রি করে করে উন্নতির স্বাদ লুটে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকবে, যতক্ষণ না সৎ ও সাধু লোকদের হাতে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা আসবে। আর এ মহান মার্গে আরোহণের জন্য জিহাদই একমাত্র পন্থা। শরীয়তের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জিহাদ তথা স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও সর্বব্যাপী জিহাদের আন্দোলনই এর পথ করে দিতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, ঐ বৃক্ষই ছায়া দান করতে পারে, যে নিজে তপ্ত রোদে দগ্ধ হতে থাকে।

একথা সত্য যে, মুসলিম উম্মাহর দরিদ্র শ্রেণী আজ জিহাদের দিকে অধিক অগ্রসর হচ্ছে। এ শ্রেণী দুনিয়া পূজার বিষাক্ত সাপ থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করে চলেছে। বিধায় আল্লাহ তাআলা তাদের কাঁচা গৃহে দ্বীন ও জিহাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। যেন দরিদ্র মুসলমান অনুধাবন করতে পারে যে, দারিদ্র্য লজ্জার কারণ নয়, বরং সৌভাগ্য ও গর্বের বস্তু। ক্ষণস্থায়ী এ বিষয়–আশয় আর ধ্বংসশীল এ পূঁজি যার কাছে কম থাকে, সেই সৌভাগ্যবান। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা, পরিবারের মানবতা বিধ্বংসী প্রথা ও দুনিয়াদারীর অপবিত্র বায়ূ কিছু কিছু মুজাহিদকে ধরে ফেলে। তখন সে আর মুজাহিদ থাকে না। বরং জিহাদের মত মহান আমলের নামকে পঁচা ও নাপাক দুনিয়া লাভের জন্য ব্যবহার করে। শাহাদাতের

মহান অবস্থান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দুনিয়ার বাড়ী ও গাড়ীর খাদে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য শরীয়তসিদ্ধ কার্যকলাপে অপচয় করে। এরা এমন লোক, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রি করার ধারা আরম্ভ করে নিজেদেরকে ক্ষতির মুখে ফেলে।

অথচ জান ও মাল উভয়টি কুরবানী করার নামই জিহাদ। এটি এমন আমল নয়,দুনিয়া লাভের বিনিময়ে যা করা হয়। জিহাদের আহবানকারী ও সংগঠন পরিচালকগণ সতর্কভাবে কাজ করুন। ভুল কর্মপন্থার কারণে বর্তমানে কিছু কিছু মুজাহিদ দুনিয়ার সাজসজ্জাকে নিজের অধিকার মনে করছে। তাদের চিন্তা-চেতনা খুবই সংকীর্ণ। আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি এবং সংগঠন পরিচালনার ভাবধারা পরিবর্তন করুন। অন্যথায় জিহাদের মত পবিত্র আমলের বদনাম হবে এবং মুসলমানদের গন্তব্য সুদূর পরাহত হবে। এমনিভাবে জিহাদে আগমনকারী সমস্ত মুসলমান দৃঢ় সংকল্প রাখবে যে, আমরা জিহাদের বিনিময়ে নোংরা দুনিয়া প্রত্যাশা করব না, বরং ইট-পাথর বহন করে হলেও নিজেরা উপার্জন করে স্বীয় জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করব, যেন আমার রব আমার উপর রাজি হন। যেন দুনিয়ার জালেম শাহীর পরিবর্তন ঘটে। মনে রাখবেন, পৃথিবীর বুকে এমন বিশাল ও মহান বিপ্লব তারাই ঘটাতে পারে, যারা খাঁটি, নির্ভেজাল, ঐকান্তিক ও সাধু। যাদের অন্তর অভিশপ্ত দুনিয়ার ভালবাসা মুক্ত।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! দুনিয়াকে অন্তর থেকে বের করে দাও। দুনিয়ার জন্য কারো সামনে হস্ত প্রসারিত করো না। অন্তরে তার লালসা রেখ না। পার্থিব সম্পদ নিজেই তোমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। পরমুখাপেক্ষিতা, অবমূল্যায়ন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাথর দ্বারা এ ফল মাটিতে ফেলতে হয়। তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার বাড়ী-গাড়ীর মূল্যায়ন থাকলে এসব তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবে। পক্ষান্তরে এসবকে তোমরা অন্তর থেকে বের করে দিলে এসব তোমাদের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। তখন তোমরা এদের লাঞ্ছনা উপভোগ করবে। মুজাহিদ বন্ধুরা আমার! এতে সন্দেহ নেই যে, জালেম পরিবেশের পাঞ্জায়, সরল, অমুখাপেক্ষী ও আত্মমর্যাদাশীল জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে সাহস

করে, তার জন্য এ সকল বিষয় কিছুই কঠিন নয়। বিত্তশালী মুসলমানদের নিকট আমার আন্তরিক আবেদন এই যে, আপনারা নিজেদের জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করুন। যাতে করে গরীব লোকেরা পৃথিবীর বুকে সসম্মানে জীবন ধারণ করতে পারে।

দুনিয়ার আসবাব–পত্রের অধিক প্রদর্শন দরিদ্রদেরকে অপরাধী বানায়। মনে রাখবেন! আপনার কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) থেকে অধিক আদরের নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে অনাড়ম্বর বিবাহের ব্যবস্থা করুন। শরীয়ত সম্মতভাবে জীবনযাপন করুন। খাবারের যেসব গ্রাস আপনি ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেন, এগুলোও সংরক্ষণ করা হলে বহু পরিবার ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তি পাবে। আপনি কি কিছু মুজাহিদ পরিবার ও কয়েকজন শহীদের সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম নন?

হায়! আপনারা যদি এমনটি করতেন! বিশ্বাস করুন, দরিদ্র কোন মুজাহিদ যখন আর্থিক সংকটে পড়ে জিহাদ ছেড়ে দেয়, তখন কতজন যে অশ্রু বিসর্জন দেয়, ছটফট করে, আপনি কি তা অবগত আছেন?

হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহর গরীব ও ধনী শ্রেণীর উপর দয়া করুন। ইয়া আরহামার রাহিমীন! মুসলিম উম্মাহর বিত্তশালীদেরকে বদান্যতা ও মানবতার মহৎ গুণ দান করুন। উম্মাহর দরিদ্র শ্রেণীকে অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদা দান করুন। ইয়া আল্লাহ! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উম্মতকে আর্থিক সংকটে লিপ্ত করবেন না। ইয়া আল্লাহ! প্রত্যেক মুজাহিদের ব্যয়ভারের ব্যবস্থা করুন। জিহাদের পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের উপর থেকে আর্থিক সংকট চিরতরে বিদূরিত করুন। ইয়া আল্লাহ! তোমার কিছু গরীব বান্দা দরিদ্রতার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের এ অবস্থা দেখে আমাদের হৃদয় অস্থির ও বিষাদগ্রস্ত। হে আসমান ও জমিনের ধনভাণ্ডারের মালিক! মুসলিম উম্মাহকে সচ্ছলতা দান করুন। বিশেষতঃ মুজাহিদদের উপর রহম করুন! রহম করুন!! রহম করুন!!!

ভাওয়ালপুরের দুর্ঘটনা

সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, দুশমনের অর্থের বিনিময়ে খরিদকৃত বিশেষ এক লবি জাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে খুব তৎপরতার সঙ্গে কর্মরত রয়েছে। বিগত এক বছরের পরিশ্রমের ফলে অভিশপ্ত এই লবির হাত এখন অনেক উপরে উঠে গেছে। সে প্রেক্ষাপটে জাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দায়িত্বশীল, কর্মী ও হিতাকাংখীগণ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ মেনে চলবে—

১. কুফর ও নেফাকের পূজারীরা সর্বদাই মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এসব চক্রান্ত নতুন কিছু নয়। বরং এটিও ইতিহাস পরম্পরায় চলে আসছে। তাই ভীত–সন্ত্রস্ত কিংবা হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং এতে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বিষয় এই যে, আমাদের মেহনত ইসলামের দুশমনদেরকে মারাত্মক ক্ষতি করছে। আলহামদুলিল্লাহ! আর এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের তীর লক্ষ্য ভেদ করছে। আমাদের দুশমন রণক্ষেত্রে আমাদের মোকাবেলা করতে নিজেদেরকে অসহায় মনে করছে। তবে শাহাদাত, জখম, কারাগার, থানা ও হাতকড়া জিহাদের পথের প্রতিবন্ধক নয়। বরং উৎসাহব্যঞ্জক। এতে করে জিহাদ অধিক শক্তি ও উন্নতি লাভ করে। বিধায় জাইশের সদস্যরা! অন্তরকে সুদৃঢ় রাখুন।

২. এমত পরিস্থিতিতে আমাদের সবার আল্লাহ তাআলার দিকে নিবিষ্ট হওয়া এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। কেননা তিনিই আমাদের বন্ধু আর তিনিই আমাদের সাহায্যকারী। আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে দুশমন আমাদের কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ না করুন আমরা যদি তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে উঠে পড়ে লাগি, তাহলে মুনাফিকদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী হতে কেউই ঠেকাতে পারবে না। তাই সকল সাথী সালাতুল হাজাত, সালাতুল ইস্তিগফার এবং আত্মসমালোচনায় তৎপর হই। দু' রাকাত তাওবার নামায পড়ে গোনাহ

থেকে তাওবা করি। আর দু' রাকাত সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য ও শক্তি কামনা করি। আর আত্মসমালোচনা করে লক্ষ্য করি যে, আমার মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপ আছে কিনা।

৩. এমন কঠিন সময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ আমাদেরকে আল্লাহর নুসরাতের যোগ্য বানাবে। সকল সাথী মিছওয়াক থেকে আরম্ভ করে পোশাক ও অন্যান্য সব সুন্নাতের ব্যাপারে অধিকতর যত্নবান হই। পাগড়ী পরিধান করার চেষ্টা করি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি সুন্নাত জিন্দা করার চেষ্টা করি।

৪. সাধারণত এমন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা মুজাহিদদের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। তারা এজন্য দু' রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। প্রথমত, যারা অধিকতর শান্তিপ্রিয় তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয় যে, জাইশের লোকেরা বন্দী হচ্ছে। অল্প দিনের মধ্যে সরকার তাদেরকে নিঃশেষ করে ছাড়বে। এর নেতারা সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করে। ইত্যাদি ইত্যাদি ভীতি সৃষ্টিকারী কথা শুনিয়ে, শান্তিপ্রিয় লোকদেরকে সংগঠন সম্পর্কে বিরূপ ধারণায় আক্রান্ত করার চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে আবেগপ্রবন সদস্যদেরকে বলা হবে যে, জাইশের লোকেরা ভীরু। সরকারের চাপে দমে গেছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়ে পিছু হটেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। জাইশের কর্মীদের প্রতি নিবেদন এই যে, এমত পরিস্থিতিতে এসব দুষ্ট লোকদের কথায় কান দিবেন না। বরং কেন্দ্রের পলিসির উপর আশ্বস্ত থাকবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে হতাশও করা হবে না এবং অপাত্রেও ব্যবহার করা হবে না।

৫. ভাওয়ালপুরের ঘটনাবলীকে সামনে রেখে সর্বশেষ ও জরুরী নিবেদন এই যে, জাইশের সমস্ত কর্মী সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করবেন। নিজেদের আবেগতাড়িত পদক্ষেপ দ্বারা দুষ্ট লোকদেরকে নিজেদের বিপক্ষে শক্তিশালী কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ দিবেন না। আজ সমগ্র পাকিস্তান জুলুম, অত্যাচার, ফিৎনা–ফাসাদ ও পাপ–পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। জিহাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও অর্জিত শক্তিই

অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বিধায় নিজেদেরকে জিহাদের কাজে নিমগ্ন রাখুন। আবেগতাড়িত পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করুন, যা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে আসবে। অবশ্যই আসবে।

আল্লাহু আকবার

ঘটনা অতি পুরাতন। তবে বারবার দেখা দেয়। মুসলমানদের মত নাম রেখে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণকারী, সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল শক্তির মদমত্ততায় ইসলামের সুদৃঢ় বিধানকে হেয় প্রতিপন্নকারী এবং অন্যের চালে চলতে গিয়ে নিজের চাল বিস্মৃতকারী অনেক লোকই ধরার বুকে এসেছে। আবার ধরা ছেড়ে চলে গেছে। তারা আকাশে থুথু নিক্ষেপ করার দুঃসাহস করে নিজেদের মুখমণ্ডলে কালিমা লেপন করে দুনিয়াও হারিয়েছে দ্বীনও হারিয়েছে। হায়! তারা যদি ভেবে দেখত যে, তারা কি পেল আর কি খোয়াল!

এক সময় সর্দার আসিফ আলীর ডংকা চলছিল। সূদের ব্যাপার নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে, উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে, দ্বীনী মাদরাসাসমূহের বিরুদ্ধে তার জোরালো বক্তব্য পত্রপত্রিকার কলংক হতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে ইসলামও রয়েছে, দ্বীনী মাদরাসাসমূহও রয়েছে, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গদিতে সর্দার সাহেবকে আর দেখা যায় না। আহা! কত বিশ্বাসঘাতক এ গদি, যে ব্যক্তি তার খাতিরে ঈমান পর্যন্ত নষ্ট করল। কিন্তু তারপরও সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ছাড়ল না।

জাবেদ জব্বার সাহেবও ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধে মন খুলে বিষ উদগীরণ করেছে। বেচারা করবেই বা কি? অন্যের থেকে আহার লাভ করার জন্য এমনটি করতেই হয়। কিন্তু তখনও ইসলামের কিছু বিগড়ে যায়নি।

বেনজির ভুট্টো তো এদের থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে। মন ভরে দ্বীনের বিরুদ্ধে রসনা ব্যবহার করেছে। আইন পাশ করেছে। সাদা রঙ্গের কাফেরদের কাছ থেকে অনেক বাহবা কুড়িয়েছে। কিন্তু গদি তাকেও নীচে নিক্ষেপ করেছে। তাও একবার নয়, দুইবার। আর যাদের সন্তুষ্টি লাভের

জন্য কুরআনের বিধিবিধানকে উপহাস করেছিল, তারা তাকে আশ্রয় ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি।

শুনেছি যে, স্বদেশের স্মরণ তাকে অস্থির করে। সে দেশে ফিরতে চায়। এজন্য সে শ্বেতাঙ্গ কাফেরদেরকে নিজের কীর্তি গাঁথা শোনায় যে, আমি হরকাতুল আনসারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। জিহাদের কেন্দ্রসমূহ বন্ধ করিয়েছি। আমি আল্লাহর আহকামকে হেয় প্রতিপন্ন করেছি। এসব সোনালী কীর্তি (?)এর বিনিময়ে আমাকে পাকিস্তানের গদি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। জানি না গদি সে ফিরে পাবে কি পাবে না, তবে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসব ঘটনাই যথেষ্ট।

এবার সেই পরিবারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, যে কর্মকার থেকে শিল্পপতি হয়েছে। দ্বীনদারদের কাঁধে ভর করে ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু গদির মোহ তাকেও খোদাদ্রোহী ও জিহাদের দুশমন বানায়। দুর্গন্ধময় আলোচনার টেবিলে বসে কয়েক মিনিটের মধ্যে কারগিলের প্রাপ্তিকে বিলুপ্ত করে দেয়। মাদরাসাসমূহের চতুর্দিকে চর এবং মুজাহিদদের চতুর্দিকে এজেন্টদের জাল বিছিয়ে দেয়। কাফেরদেরকে স্বদেশে ডেকে এনে প্রতিবেশী দেশে গিয়ে মুসলমানদেরকে শিকার করার এবং তালেবানের সামনে চোখ রাঙানোর এবং সবাইকে জনসাধারণের ম্যানডেট দেখিয়ে ধমকানোর অনুমতি দেয়। ইসলামের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে লড়াইকারী এ খান্দান কওমী এসেম্বলীতে অপরাজেয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা, আদালতসমূহকে পদতলে পিষ্ট করা, দেশের সমস্ত সংস্থাকে বন্ধক রাখা সত্ত্বেও তারা গদির এমন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয় যে, এখন তাদের স্বদেশে পা রাখার মত জায়গাও নেই। হ্যাঁ, যার খাতিরে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় যাত্রী চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হত। যেখানে তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। শুনেছি লোহায় লোহা কাটে—কিন্তু এখানে শরীফ মোশাররফের হাতে কাটা পড়ল।

আল্লাহু আকবার। কাঁচা মসজিদসমূহ, ভাঙ্গাচোরা মাদরাসাসমূহ, দরিদ্র মুজাহিদ আর দুর্বল মৌলভীরা আজও দেশে রয়েছে। কিন্তু যারা তাদেরকে লোহার শিকলে আবদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল, উঁচু ও পাকা অট্টালিকার মালিক, পুলিশের লৌহ পাহারায় ঘোরাফেরাকারী সে

শাসকরাই আজ দেশে নেই। বাহ! আমার মালিক, বাহ! তোমার কাজ কত উঁচু, আহা! মানুষ যদি তা বুঝত। কিন্তু মানুষ তো বড় জালিম, জাহিল। সামান্য ক্ষমতা আর তুচ্ছ অধিকার লাভ করে তোমার ক্ষমতা ও শক্তির সামনে চোখ রাঙায়। অতীতে ও বর্তমানে বিরাট বিরাট ঝড় ঝাপ্টা এসেছে। রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটেছে। ক্ষমতার মদে মত্ত ও নেশাগ্রস্ত কত হাতি এসেছে। কিন্তু তোমার কুরআন আজও সংরক্ষিত রয়েছে। তোমার মসজিদ আজও আবাদ রয়েছে। আজও তোমার নামের মহত্ব ঘোষিত হচ্ছে। তোমার আশেকগণ আজও জীবিত আছে। তারা তোমাকে পরিত্যাগ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

বর্তমানে আবারও কিছুলোক ক্ষমতার নেশায় তোমার দ্বীনের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ছে। জিহাদের মত ফরয কাজকে বন্ধ করার কথা বলছে। তারা ইসলামের সঙ্গে বিশ্বস্ত জীবনকে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বলে খতম করতে চায়। এসব লোক মিসরের ঈমান বিক্রেতাদের থেকে পাঠ গ্রহণ করে এসেছে। তারা ভিনদেশী সাদা চামড়া ওয়ালাদেরকে তোমার চেয়ে অধিক ভয় পায়। এরা তাদের সামনে তোমার নাম উচ্চারণ করাকে অশোভন মনে করে। এরা তাদের আইন-কানুনকে তোমার প্রিয় ও পবিত্র আইনের চেয়ে অধিক শালীন মনে করে। এরা এখন মুখ খুলে তোমার পথের নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদেরকে গুলি করে উড়িয়ে দেওয়ার ধমকি দিচ্ছে। এরা শহীদদের খুনের উপর মাটি চাপা দিতে চায়। এরা নাপাক কাফিরদের সামনে নিজেদেরকে সভ্য প্রমাণ করার জন্য তোমার কুরআনকে গোপন করতে চায় এবং মিটিয়ে দিতে চায়। তারা পবিত্র এ ভূমিকে শত্রুদের শিকারক্ষেত্র বানাতে চায়। হে আল্লাহ! তারা এদেশের অলিতে গলিতে খোলামেলা শরাবখানার কারণে ব্যথিত হয় না, এরা অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্লাবন দেখে বিচলিত হয় না। তারা ঘুষ ও দুর্নীতির ভয়ঙ্কর অজগর দেখতে পায় না। তারা পথের মোড়ে মোড়ে ও হাটেবাজারে বিক্রিত সতীত্বের জন্য অশ্রু বিসর্জন করতে পারে না। দারিদ্র্যের তোড়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণকারী বৃদ্ধদের জন্য তাদের মায়া হয় না।

নিজ দেশে ভীনদেশীদের নাক গলানোতে তাদের অস্থিরতা নেই। মুসলমান নারীদের দেহে ক্রুশের খঞ্জর বিদ্ধকারী এনজিওসমূহ তাদের

দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘরে ঘরে বিস্তৃত অমানবিক প্রথার আগুন তাদেরকে অস্থির করে না। নর্তকী, গান–বাদ্যে লিপ্ত ও খোদাদ্রোহীরা তাদের দৃষ্টিতে খারাপ লাগে না। সর্বত্র বিস্তৃত চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ ও খুন ছিনতাই তাদের চোখে পড়ে না। তাদের কাছে নাইটক্লাব, পতিতালয় ও মাদক ব্যবসায়ীদেরকে খারাপ লাগে না। তাদের কাছে শুধু আযানের ধ্বনি, জিহাদের শ্লোগান আর কুরআনের বিধিবিধান তীব্রভাবে বিঁধে থাকে। তাদের প্রত্যেক বিবৃতি দ্বীন ও জিহাদের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। তাদের চোখে তোমার দ্বীনের দিকে আহবানকারীরা খারাপ লাগে। তোমার পথে প্রাণ উৎসর্গকারীদের প্রতি তাদের যত ঘৃণা। তোমার নবীর সীরাত অনুপাতে জীবনযাপনকারীদের সঙ্গে তাদের যত দ্বন্দ্ব। যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সঙ্গে এদের বিরোধ। এখন তারা তোমার বান্দাদেরকে নির্যাতন করা, তোমার অলীদের অন্তরকে বেদনাহত করা, তোমার পথে মস্তক উৎসর্গকারী মুজাহিদদেরকে কষ্ট দেওয়া আরম্ভ করেছে।

হে আল্লাহ! তুমিই সর্বাধিক উত্তম ও অধিক অবগত। তুমি ভালভাবেই জানো, তোমার প্রেমিকদের হৃদয় আজ কি পরিমাণ বিষাদগ্রস্ত। হে আল্লাহ! তুমি যে ফয়সালা করবে তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমাকে দেওয়ার মত আমাদের একটি মাত্র প্রাণ আর একটি মাত্র মস্তক রয়েছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে অবিচলতা দান করো। আমাদের মস্তক যেন তুমি ছাড়া অন্য কারো সামনে অবনত না হয়।

হে আল্লাহ! কুফরের প্রতি তারা এত বিশ্বস্ত, অথচ কুফরী তাদেরকে কিছু দিতে পারেনি, দিতে পারবেও না। তাহলে হে আল্লাহ! আমরাও তোমার বিশ্বস্ত। আমাদের সবকিছু তো তোমারই দেওয়া। তারা কুফরের তিরস্কারকে ভয় করলে আমরাও তোমার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি ও আযাবকে ভয় করি। হে আল্লাহ! তারা গদির সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে গিয়ে তোমার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমরাও তোমার মুহাব্বতে তোমার সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষার ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার শরীয়তের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অলসতা ও অমনোযোগিতার অপরাধ করেছি। যার শাস্তি আজ আমরা ভোগ করছি।

আজ আমাদের সম্মুখে তোমার বিধানকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করুন। আমরা আপনার সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষার অঙ্গিকার করছি। তুমি এ অঙ্গিকার পূরণে আমাদের সাহায্য কর। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই, আর তোমারই থাকতে চাই। হে আল্লাহ! আমরা প্রগতিশীল, আধুনিকমনা ও সুসভ্য হওয়ার পদক চাই না। আমরা একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি কামনা করি। তাতে বিশ্ববাসী আমাদেরকে পাগল বলুক, সেকেলে বলুক, আরো কিছু বলুক না কেন। হে আল্লাহ! তোমার খাতিরে আমরা সব গালি সইতে রাজি আছি।

হে আল্লাহ! চতুর্দিক থেকে আমাদের উপর জাল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তোমার থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য গালি ও গুলিসহ সর্বপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে লাঞ্ছিত হতে চাই না। আমরা দুনিয়ার ঐ ঔজ্জ্বল্যের প্রতি অভিশম্পাত করি, যা আমাদেরকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হে আল্লাহ! আমরা ঐ অর্থনৈতিক উন্নতির উপর অভিশম্পাত করি, যা আমাদের থেকে আত্মমর্যাদা ও ঈমান ছিনিয়ে নেয়। হে আল্লাহ! এরা আমাদের প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করে না। আল্লাহ না করুন, আমরাও যদি আমাদের গৃহে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পথ খুলে দেই, আমরাও যদি ঈমান ও গায়রতকে বিক্রি করতে তৈরী হই, আমরাও যদি তুমি ভিন্ন অন্যদের সামনে মাথা নত করতে আরম্ভ করি, তাহলে এরা আমাদেরকে আলিঙ্গন করবে। কিন্তু আমরা তো একমাত্র আর কেবলমাত্র তোমার ভালবাসাকেই আলিঙ্গন করতে চাই। তোমার সঙ্গে কৃত অঙ্গিকারকে পুরা করতে চাই।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সাহস দান কর, অবিচলতা দান কর এবং আমাদেরকে সামলিয়ে নাও। আমরা সংকল্প করছি যে, শক্তিধর এ লোকেরা যদি সমগ্র বিশ্বের কুফরী শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের তাবৎ শক্তিও প্রয়োগ করে, তবুও কাঁচা মসজিদের মিনারসমূহ থেকে তোমারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হবে এবং আমাদের খণ্ড খণ্ড দেহ থেকেও একই ধ্বনি উচ্চারিত হবে......

আল্লাহু আকবার ..... আল্লাহু আকবার ..... আল্লাহু আকবার .....

বুদ্ধিজীবিরা উত্তর দাও !

সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে ভাল ভাল খবর আসছে। অকুতোভয় তালেবানের ট্যাঙ্ক বামিয়ানে মূর্তি ধ্বংস করছে। এমনিভাবে কাবুল ও অন্যান্য অঞ্চলেও মূর্তি সংহারের পুলকোদ্দীপক আমল শুরু হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের অনেকগুলো বৃহৎ রাষ্ট্র মন খুলে তালেবানকে ভর্ৎসনা করছে। বিশেষত ভারতের মূতিপূজারীরা তাদের দেবতাদের অসহায়ত্ব দেখে মুষ্টিবদ্ধ করছে। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের সামনে কিছুই টিকছে না। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। পত্র-পত্রিকার হৈচৈ, প্রচার মাধ্যমসমূহের গালমন্দ ও তিরস্কার এবং বড় বড় দেশের দুর্নাম রটনা তালেবানের সংকল্পের সম্মুখে খড়কুটোর মতই অসহায় ও তুচ্ছ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘ যখন আফগানিস্তানের উপর অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তখন মুসলমানগণ বেদনায় আর্তনাদ করছিল, আর মানবতার দুশমন জালিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণ আনন্দ উদযাপন করছিল। কিছুদিন পর আফগান শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে করতে মরণের কোলে ঢলে পড়বে, আর তালেবান সরকার ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে মাথা নত করতে বাধ্য হবে—একথা কল্পনা করে তারা পুলক অনুভব করছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত আমীরুল মুমিনীন ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গীদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যাঁরা ইসলামের একটি মহান হুকুমকে বাস্তবায়ন করে চিত্রই পাল্টে দিয়েছেন। ফলে এখন তালেবানের অকুতোভয় সৈনিকদেরকে হাসতে, পুলকিত হতে, 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিতে এবং আনন্দ উদযাপন করতে দেখা যাচ্ছে। কারণ, হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ও পরবর্তীকালের উম্মতের মহান সন্তানরা যে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁরাও সে সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তালেবানের আনন্দ উদযাপন করার যথার্থই অধিকার রয়েছে। কারণ তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর আদর্শমত মূতিসমূহের মূলোৎপাটন করছে।

তালেবান যথার্থই মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য, কারণ তাঁরা তাঁদের প্রেমাস্পদ ও প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক মূর্তি সংহার করার সৌভাগ্য লাভ

করেছেন। যখন ট্যাংকের গোলার আঘাতে মূর্তির অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল, সে দৃশ্য কতই না ভাবপূর্ণ ছিল। আহা! আমাদের দৃষ্টিও যদি এমন আনন্দের দৃশ্য দেখতে পেত। সুবহানাল্লাহ! যখন ইসলামের আত্মমর্যাদাশালী সৈনিক মূর্তির ঠ্যাঙ ধরে মাটিতে ছুড়ে মারছিল, তখন সে কতই না পুলক অনুভব করছিল। এসব মূর্তি ও প্রতিমার পরিণতি এমনটিই হওয়া দরকার। কারণ, এদেরই পদতলে মানবতাকে বলি দেওয়া হচ্ছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই দরিদ্র মানবতার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। এসব মূর্তির চৌকাঠে মানবতাকে হত্যা করা হচ্ছে। নানা রঙ্গের এসব মূর্তি মানুষকে পশুতে পরিণত করার মাধ্যম।

এসব মূর্তি নাপাক আর এদের সম্মুখে মস্তক নতকারীরাও নাপাক, তাতে সন্দেহ নেই। যে কারণে ফেরেশতাগণ ও ফেরেশতা চরিত্রের মানবগণ এসব মূর্তিকে ঘৃণা করে। মূর্তিপূজা মানবতাকে তার প্রকৃত মালিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মূর্তিকে মর্যাদা দেওয়া মানবতাকে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনায় নিক্ষেপ করে। সেসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শয়তানদের উপর বিস্ময় জাগে, যারা মূর্তিকে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার আখ্যা দেয়। কিন্তু তারা অনাহারে ও শীতে ছটফটকারী মানবতাকে দেখতে পায় না। আফগানিস্তানের হাজার হাজার শিশু রাশিয়ান ও ভারতীয় স্থল মাইনের শিকার হয়েছে। এজন্য কোন বুদ্ধিজীবীর ব্যথার উদ্রেক হয়নি। আফগানিস্তানের লাখ লাখ লোক পঙ্গু হয়েছে, তাদের জন্য কারো মানব–দরদ জেগে ওঠেনি। আফগানিস্তানের উপর একপক্ষীয় অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে শিশুদেরকে দরিদ্রতার কষাঘাতে হত্যা করা হয়, সেজন্য কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু সে আফগানিস্তানেই যখন কিছু নিষ্প্রাণ, অথর্ব, মূল্যহীন ও মর্যাদাহীন প্রতিমাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়, তখন সারা বিশ্ব চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে এবং এসব প্রতিমা রক্ষার্থে আফগানিস্তানের উপর অধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। যেন পাথরের সম্মুখে মানুষ বলি দেওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা বুদ্ধের মূর্তি ভাঙ্গার কারণে হৈচৈ করছে। অথচ মূর্তি ও প্রতিমা তৈরী করা তাদের ধর্মেও বৈধ

নয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের কাফেররা তালেবানকে বিলুপ্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাই মূর্তির জন্য প্রতিবাদের এ আওয়াজে প্রত্যেকে নিজের সুর মিলানো জরুরী মনে করছে।

এ পর্যায়ে আমরা তালেবানকে ব্যাপকভাবে এবং তাদের গৌরব ও ঈর্ষার ধন আমীরুল মুমিনীনকে বিশেষভাবে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আমরা তাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সমস্ত ঈমানদার তাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা আপনাদের এ সিদ্ধান্ত ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলামের বিধানকে জীবন দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ, আপনারা এর বিশেষ বরকত লাভ করবেন। আফগানিস্তান যখন মূর্তির অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবে, তখন আসমান থেকে আল্লাহ পাকের খাস রহমত ও সাহায্য অবতীর্ণ হবে। আপনারা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এ বিধান বাস্তবায়ন করে জমিনকে পবিত্র করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই ইনশাআল্লাহ জমিনও তার ভাণ্ডারসমূহ আপনাদের জন্য উদারভাবে উদগীরণ করবে। আর আপনাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারীরা একদিন আপনাদের সম্মুখে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে ধর্ণা দিবে।

আপনারা আপনাদের এ মুবারক পদক্ষেপ গ্রহণকালে কারো ভর্ৎসনা বা প্রতিবাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। কারো সম্মুখে নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে যাবেন। কারণ, আল্লাহ তাআলার হুকুম বাস্তবায়ন করার মত মহান এক সৌভাগ্য আপনারা লাভ করেছেন। সেজন্য আপনারা যত বেশীই শুকরিয়া আদায় করুন না কেন, তা কমই হবে। আপনারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। কিংবা কোন ধর্মানুসারীদেরকে কষ্টও দেননি। মসজিদ থেকে অপবিত্র বস্তু উঠিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা যেমন এক নৈতিক অধিকার, এমনিভাবে মসজিদের মত পবিত্র ভূমি থেকে অপবিত্র মূর্তি উঠিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করাও একটি নৈতিক অধিকার। বিশ্বের অন্যান্য ধর্মানুসারীরা তাদের গীর্জা, মন্দির ও মঠে যা কিছু করে, সেজন্য আমরা তাদেরকে কিছু বলি না। বরং তাদেরকে অধিকার দিয়ে থাকি যে, তারা তাদের উপাসনালয়ে যা কিছু রাখতে চায় রাখুক, আর যা সেখান থেকে বের করতে চায় বের করুক। আমরা যখন তাদের আভ্যন্ত ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ করি না তাহলে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ করার কি অধিকার রয়েছে? হে তালেবান! আপনাদের এ মহাসৌভাগ্য মুবারক হোক! শতবার মুবারক হোক! আমরা দুআ করছি, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে হেফাজত করুন এবং আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকত আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিন।

এ পর্যায়ে আমরা বিশ্বের ন্যায়পন্থী লোকদেরকে প্রশ্ন করছি যে, তালেবানের মূর্তি ভাঙ্গার উপর আপত্তি উত্থাপনের ও প্রতিবাদ করার তাদের নিকট কোন্ নৈতিক বৈধতা রয়েছে?—'তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।' (আল কুরআন)

ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বলে চিৎকারকারীরা স্পেনের ধ্বংস যজ্ঞের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না কেন? সেখানকার ইসলামী নিদর্শনাবলীকে যে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তা কোন সভ্য জাতির নিকট থেকে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এজন্য কোন চিৎকারকারী আছে কি? বাদ দিন, স্পেনের ক্ষত তো অনেক পুরাতন, নিকট অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্বরতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। মা–ওরাউন্ নাহারের ঐতিহাসিক ইসলামী উত্তরাধিকারের পরিণতি কি হয়েছে? পাঁচ কোটি মুসলমানের শাহাদাত আর লক্ষ কোটি নিদর্শন ধ্বংস করার কারণে তো কেউ কোন হৈ চৈ করেনি। আরো সম্মুখে তাকিয়ে দেখুন ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় কেমন জুলুম করে বাবরী মসজিদকে শহীদ করা হয়? কিন্তু ভারতের উপর তো কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। তারপর 'হযরতবাল' ও 'চারার শরীফের' মত শত শত বৎসরের পুরাতন ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের উপর যে নির্যাতন হয়েছে, তাও কারো অজানা নয়। এসবই এমন স্থান, যা মুসলমানদের ছিল এবং মুসলমানরাই সেগুলো আবাদ করেছিল। পক্ষান্তরে আফগানিস্তানের মূতিসমূহের কোন পূজারী বা ভক্ত সেখানে নেই।

ওহে বুদ্ধির অপবাদ মস্তকে ধারণকারী বুদ্ধিজীবীরা! হায়! তোমরা যদি আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ বেদনা বুঝতে! যেখানে মানবতাকে ধুকে ধুকে প্রাণ ত্যাগ করার জন্য ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট কি আর অনুযোগ করব। যে মস্তক ও বক্ষে মগজ ও

হৃদয়ের স্থলে পাথর ভরা, তাদের মানবতা নিয়ে কিসের চিন্তা? তারা তো নিজেরাই মূর্তি। বিধায় মূর্তি ধ্বংসের কারণেই তারা বেদনা উপলব্ধি করছে।

পুরাতন পথ নতুন পুলক

আজ থেকে প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে একটি পথের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। সেটি আমার প্রিয়তমের গৃহে যাতায়াতের পথ। তাই স্বভাবতই তার প্রতিটি মোড় ও পাথরের সঙ্গে আমার ভালবাসা ছিল। করাচী থেকে মুলতান, মুলতান থেকে ডেরা ইসমাইল খান, ডেরা ইসমাইল খান থেকে বন্নু, আর বন্নু থেকে 'মিরাণ শাহ' হয়ে সে পথ। বন্নু পর্যন্ত আমাদের ভ্রমণ ভাবাবেগ ও পুলকশূন্য হত। বাহ্যত করাচী থেকে বন্নু পর্যন্ত বিশেষ কোন ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয় না। একই রকম পরিবেশ ও একই রকম পথঘাট। একই নিয়ম কানুন, বাধা বিপত্তি ও নানারকম মানুষের সমাগম। কিন্তু বন্নু ছেড়ে বিমানবন্দরের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যখন আযাদ কবায়েলী (গোত্র শাসিত) অঞ্চল আরম্ভ হয়, তখন মনের জগতটাই পাল্টে যায়। কাঁধে অস্ত্র ঝোলানো নির্ভীক লোক। বিশেষ এক জীবন পদ্ধতি ও বিশেষ ধরনের আযাদীর উপলব্ধি সর্বত্র সুস্পষ্টরূপে গোচরীভূত হয়। জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত নতুন লোকদের জন্য গোত্রশাসিত এলাকার পরিবেশই জিহাদী প্রশিক্ষণের সূচনা করে। তারা অভিভূত হয়ে চোখ বিস্ফারিত করে সেখানকার খোদাপাগল লোকদেরকে দেখতে থাকে। অস্ত্র দ্বারা পরিপূর্ণ দোকানসমূহ দেখে এবং অঢেল অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এমন শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে তারা বিস্মিত হয়।

আমিও পাঁচজন বন্ধুসহ এ পথ অতিক্রম করে জিহাদের ময়দানে প্রবেশ করি। পরবর্তীতে এ পথ জীবনের অংশে পরিণত হয়। অনেক বছর পর্যন্ত পথটি শাহাদাতের অতিক্রমস্থল ছিল। অনেক অকুতোভয় ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ এ পথ অতিক্রম করেই তাদের প্রিয়তম শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেন। এমনও অনেকে ছিলেন, যারা এ পথ অতিক্রমকালে স্বীয় দেহে জাগতিক দুর্বল ও তুচ্ছ জীবন বহন করে

গিয়েছিলেন। কিন্তু এ পথ ধরেই তারা যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন শাহাদাতের সুমহান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নূরানী চাদর পরিধান করে প্রশান্তিতে শায়িত ছিলেন। গোত্র শাসিত এসব অঞ্চলের জীবন পদ্ধতির অভ্যন্তরে দৃষ্টিদানের সুযোগ আমাদের কমই হয়েছে। আমরা এসব অঞ্চল দিয়ে পথ চলতাম। এখানকার মসজিদে নামায আদায় করতাম। স্থানীয় দোকানদারদের থেকে প্রয়োজনীয় রসদ গ্রহণ করতাম। এ পর্যন্তই ছিল এদের সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা। তবে এখানকার কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারী তালীবে ইলমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। আমরা এসব অঞ্চলে অস্ত্র হাতে চলাফেরা করতে পুলক অনুভব করতাম। এ অঞ্চলে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করা জরুরীও বটে। এখানকার রাজনৈতিক নেতারা এজন্য তাকীদও করেন। এসব অঞ্চলে অস্ত্র ছাড়া চলাফেরা করা বিপদজনক এবং লজ্জাজনক।

এমনিতেও গোত্র শাসিত অঞ্চলে প্রবেশ করতেই মন ও মগজকে একথার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখে যে, একজন মুসলমানের জন্য অস্ত্র সঙ্গে রাখা জরুরী, নিতান্ত জরুরী। জাতির লোকদের মধ্যে ঈমান, গায়রত, ব্যক্তিত্ব ও শালীনতা বিদ্যমান থাকলে, অস্ত্র সে জাতির অধ্যুষিত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করে। তখন তাদের কেউ আর অসহায় ও নিরুপায় হয়ে মৃত্যুবরণ করে না। বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক কলহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও জাতির মধ্যে দ্বীনী ইলমের ধারকদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থাকলে তাদের কলহ সীমালংঘন করতে পারে না। নিশ্চিন্তমনে মানুষ রাতে ঘুমাতে পারে। প্রত্যেকের জীবন সমৃদ্ধ হয়। বন্নু থেকে মীরানশাহ যাওয়ার পথে. পথের ধারে 'দারুল উলূম নিযামিয়া' নামে বিশাল এক মাদরাসা বহুবার দেখেছি। কিন্তু ভিতরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। মাদরাসার দীর্ঘ ও প্রশস্ত ভবন, তাতে উড়তে থাকা বিরাট পতাকা, তালীবে ইলমদের ভীড় এবং মাদরাসা প্রাচীরে অঙ্কিত লেখাসমূহ হৃদয়–মনে আনন্দের দোলা দিত। পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় গোত্র শাসিত অঞ্চলে দ্বীনী ইলমের প্রতি অনুরাগ অধিক লক্ষ্য করা যায়।

শাসকগোষ্ঠী গোত্র শাসিত অঞ্চলে দ্বীনী মাদরাসার প্রভাব ও বর্ধন

হ্রাস করতে বহু চেষ্টাই করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তারা সফল হতে পারেনি। স্কুল ও আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরেও সেখানকার দ্বীনী মাদরাসাসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ এবং সেখানকার উলামায়ে কেরাম প্রাণবন্ত। এসব অঞ্চলে দ্বীনী মাদরাসাসমূহের তালীবে ইলমদের চরিত্র মাধুর্য এবং উলামায়ে কেরামের দরিদ্রতা সত্ত্বেও আত্মনির্ভরতা ও অমুখাপেক্ষিতা আজও অটুট ও অপরাজেয়। বিভিন্ন গোত্র পরস্পরের মোকাবেলায় নিজেদের দ্বীনী মাদরাসাসমূহের উন্নতি সাধনে দৃঢ় সংকল্প। বিভিন্ন রকম মারাত্মক আগ্রাসন সত্ত্বেও এসব অঞ্চলের ইসলামী গোত্রীয় স্বকীয়তা ও ধর্মীয় ভাবমূর্তি সংরক্ষিত। বড় বড় সুদৃশ্য পাগড়ী, অধিকাংশের মুখমণ্ডলে ঘন কৃষ্ণ দাড়ি, বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে সভ্য শালীন মুসলমান গৃহিনী এদের ঐতিহ্য। উলামায়ে কেরামের অঘোষিত শাসন ও পারস্পরিক বিবাদ নিরসনে শরীয়তসম্মত বিধানের প্রাধান্যে এসব অঞ্চল আজও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে বহির্দেশে যাওয়ার প্রবল ঝোঁক হেতু কিছু কিছু স্থান ও কিছু মানুষের মুখমণ্ডলে দুনিয়াপূজার লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হতে আরম্ভ করেছে। মালের ফিতনা এসব অঞ্চলেও ঘুনপোকার মত ভিতরে ভিতরে কেটে যাচ্ছে। এসব ফিতনার অশুভ প্রভাব থেকে হেফাযতের জন্য এখন থেকেই শক্তভাবে প্রতিরোধ জরুরী। আশা করি উলামায়ে কেরাম এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিদান করবেন।

এসব অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত অতীতের জিহাদ সংক্রান্ত অপূর্ব স্মৃতিসমূহের অস্পষ্ট চিত্র তখনও মন মগজে বিরাজ করছিল। এমতাবস্থায় আমি দারুল উলূম নিযামিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণের দাওয়াত পাই। কিন্তু অন্যান্য সফরের ব্যস্ততার কারণে তাদের কাঙ্খিত তারিখে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। পরে দারুল উলূমের মুহতামিম, পূর্ব যুগের বুযুর্গদের যথার্থ উত্তরসূরী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব (দাঃ বাঃ) স্বয়ং টেলিফোনে কথা বলেন। পরম মহব্বত ও পীড়াপীড়ি করে জলসায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। অধম নিবেদন করি যে, আপনার হুকুম শিরোধার্য, কিন্তু আপনার প্রার্থীত তারিখ আগে থেকেই 'মেলসির'

লোকদেরকে দিয়ে দিয়েছি। আমি তাদের নিকট তারিখ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করব। তারা আবেদন মঞ্জুর করলে আপনার ওখানে যাব, অন্যথা পূর্ব ওয়াদা পুরা করা সর্বাবস্থায় আমার উপর শরীয়তের হুকুম। আল্লাহ তাআলা মেলসির লোকদেরকে জাযায়ে খায়ের দিন। তারা একবার আবেদনেই তারিখ পরিবর্তন করতে সম্মত হয়েছে। ফলে আমার প্রিয় পুরাতন সে পথে আরেকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। ভাওয়ালপুর থেকে রওনা হওয়ার পর ডেরা ইসমাইল খানে প্রথম যাত্রা বিরতি হয়। সেখানকার মুজাহিদ বন্ধুরা উষ্ণতা ভরে স্বাগত জানান।

দারুল উলূম উসমানীয়ার উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মোলাকাত এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সামনে সংক্ষিপ্ত বয়ান করার পর শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইদারাতুল মাআরিফিশ্ শারইয়্যাহতে যাই। সেখানে জমিয়ত প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ)এর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ, বিস্তারিত ও আনন্দঘন সাক্ষাত হয়। তার সঙ্গে সাক্ষাত শেষে আমার অতি পুরাতন বন্ধু প্রিয় সহচর শহীদ কমাণ্ডার আবদুর রশীদের গৃহে যাই। শহীদের শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তার বৃদ্ধা মাতা ও ভাইদের সঙ্গে মোলাকাতের মর্যাদা লাভ করি। মুসলিম উম্মাহর মহান কমাণ্ডারের জীর্ণ গৃহ দেখে হৃদয় বিষাদগ্রস্ত হয়। যিনি মুসলিম উম্মাহর খাতিরে গৃহের ছাদ, মায়ের ক্রোড়, স্ত্রীর সাহচর্য, সন্তানদের আদর ও বন্ধুদের আসরসহ সবকিছু কুরবানী করেছেন, তাঁর গৃহের ছাদের পতনোন্মুখ অবস্থা। অথচ তার অবস্থা জিজ্ঞেস করারও কেউ নেই।

ভাই শহীদ আবদুর রশীদ (রহঃ)এর গৃহের ছাদ তো ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর সংস্কার হবে। জাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি করবে না। তবে এ বিষয়ে মুসলমানদের সচেতন হওয়া দরকার। কারণ, মুজাহিদ ও শহীদদের গৃহ দেখাশোনা করা এমন একটি দায়িত্ব, যা পালন করার মধ্যে মুসলমানদের অসংখ্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। হায়! আমরা যদি আমাদের গাজী ও শহীদদের মূল্য অনুধাবন করতাম! ভাই শহীদ আবদুর রশীদের গৃহ থেকে রাতেই বন্নু অভিমুখে রওয়ানা হই। বন্নুর

উপকণ্ঠে জাইশে মুহাম্মাদের স্থানীয় ব্যবস্থাপকের গৃহে রাত্রি যাপন করি।

দ্বিতীয় দিন বন্নুর বেশ কিছু খ্যাতনামা আলেমের সঙ্গে মোলাকাত এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাদরাসা পরিদর্শনের সৌভাগ্য হয়। একটি মাদরাসায় সংক্ষিপ্ত বয়ানও করি। বেলা ১১টায় আমাদের কাফেলা একটি বড় মিছিলের আকারে 'মীর আলী' অভিমুখে যাত্রা করে। বন্নু বিমান বন্দরের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকালে বিমানবন্দরের সঙ্গে বিজড়িত আমার অতীতের অনেকগুলো ঘটনা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। যুগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন আকাবিরকে এ বিমানবন্দর হয়ে আফগানিস্তান নিয়ে যাওয়ার খেদমত অতীতের মধুময় স্মৃতির অন্যতম। বিমানবন্দর ছেড়ে গোত্র অধ্যুষিত অঞ্চল শুরু হলে স্মৃতির ক্যাসেট দ্রুত পিছন দিকে ঘুরতে থাকে। দৃশ্যের মিছিল একটি আরেকটির চেয়ে বড় হয়ে স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে থাকে। কিন্তু এখানকার আজকের পরিবেশ ছিল ভিন্নরকম। ইতিপূর্বে আমি যখনই এখান দিয়ে অতিক্রম করেছি, এখানকার লোকদেরকে নিজ অবস্থায় মত্ত পেয়েছি। আমাদের অতিক্রম করার বিষয়ে তাদের আর তাদের বর্তমান থাকার বিষয়ে আমাদের তেমন কোন উপলব্ধি হয়নি। কিন্তু আজ এখানে ঈদের পরিবেশ বিরাজ করছিল। এখানকার লোকেরা এ অঞ্চলের পুরাতন এক মুসাফিরের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আর পুরাতন সেই মুসাফির তাদেরকে অতিক্রম করে সম্মুখে যাওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের সঙ্গে মিলিত হতেই আজ এখানে আসছে।

গাড়ীর দীর্ঘ বহর এলাকায় প্রবেশ করতেই স্বাগত জানানোর জন্য আগত কবিলার মুসলমানরা তাদের ক্লাসিনকোভ, মেশিনগান ও অন্যান্য রাইফেলের মুখ উদারমনে খুলে দেয়। পনেরো মিনিটের এ উত্তেজনাপূর্ণ অগ্নি উদগীরণে রকেট লাঞ্চার ও হালকা মেশিনগানের শব্দ ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর অনেকে তাদের থ্রিনট থ্রি বিশেষ আঙ্গিকে চালাচ্ছিল। আমাদের গাড়ী কারো সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতেই তার ক্লাসিনকোভ অগ্নি উদগীরণ করত। অস্ত্রের এ স্তূপের মধ্যে আমাদের সিকিউরিটি অথর্ব ও নিঃপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল।

দারুল উলূম নিযামিয়ার গেট থেকে ষ্টেজ পর্যন্ত পৌঁছা অনেক কষ্টকর

ও দুরূহ ব্যাপার ছিল। অনবরত ফায়ারিং, মুসাফাহার উদ্দেশ্যে উপস্থিত লোকদের উপর্যুপরি ধাক্কা ও বিশৃঙ্খলা চরম রূপ ধারণ করেছিল। অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে ষ্টেজে পৌঁছি। ষ্টেজের পশ্চাতের একটি কক্ষে বিভিন্ন কবিলার বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মোলাকাত হয়। উত্তর উজিরিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল আলেম ও আকাবির সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অল্প কিছু সময় কক্ষে অতিবাহিত করতেই ষ্টেজে যাওয়ার জন্য জোরালো আবেদন করা হয়। এ সময় আরো একবার ভালবাসাপূর্ণ ধাক্কা সয়ে ষ্টেজে একটি আসনে উপবেশন করি। সীমান্ত প্রদেশের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের আমীর হযরত মাওলানা আমানুল্লাহ সাহেব তখন বয়ান করছিলেন। তার বয়ানের পর স্থানীয় প্রখ্যাত আলেম আল মারুফ সদর সাহেব উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে অধমকে বয়ান করার জন্য আহবান করেন। বয়ানের সময় পুনরায় একবার কবিলার মুসলমানরা তীব্র তোপধ্বনি ও শ্লোগান করে তাদের ঈমানী সজীবতার সাক্ষর পেশ করেন।

ষ্টেজে ডজন ডজন উলামায়ে কেরাম ছাড়াও আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের তালেবান গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন। বয়ান চলাকালে উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের আবেগ ও উন্মত্ততা দেখে আমার অনুমান হয় যে, এ অঞ্চল এখনও প্রাণবন্ত রয়েছে। এখানে ঈমানের মূল্য সর্বোচ্চে। আল্লাহ পাক এসব অঞ্চলের ঈমানী সজীবতা অধিক শক্তিশালী করুন। যেন এদের উসীলায় সমগ্র পাকিস্তান ঈমানের স্বাদ লুটে নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। হাজার হাজার কবিলার মুসলমানদের ভীড়ের মাঝে চলন্ত গাড়ীর বহর বন্নুর ফিরতি পথ অন্বেষণ করছিল। আর আমি এ পুরাতন পথে নতুন এক পুলক উপলব্ধি করছিলাম, আর তা ছিল জীবন্ত ও প্রাণবন্ত এসব অঞ্চলের জিহাদী আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করার অপার্থিব, ঈমান উদ্দীপক ও আনন্দঘন পুলক।

দেওবন্দ থেকে কান্দাহার

উপমহাদেশের ঘরে ঘরে যখন ইংরেজের জুলুম-নির্যাতন প্রবেশ করল, তখন সে সময়ের আহলে হক উলামায়ে কেরাম এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। দীর্ঘ সময় শলাপরামর্শ করেন। রজনীর শেষ প্রহরে আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ সেজদা করেন। আহাজারীর মকবুল চাদরাবৃত দুআ করেন। আল্লাহর দরবারে ইস্তেখারা করেন। তাঁরা আরও অনেক কিছুই করেন। কওমের ঈমান বিপদসংকুল। পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকার। হিন্দুস্তানের মুকুটধারী মুসলমানরা তাদের মুকুট তো হারিয়েছেই, এখন তারা জান বাঁচানোর ফিকিরে ব্যস্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবকে নিষ্পেষিত করার পর ইংরেজদের সাহস আরও বেড়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। হিন্দুস্তানকে যেন স্পেনে পরিণত করা হচ্ছিল। তাদের সফলতা দ্বারপ্রান্তে এসেছিল। কেননা তারা খোদ মুসলমানদের মধ্যেই ইসলামের দুশমন তৈরী করে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিক হিন্দুরা পূর্ব থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছিল।

ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ব্যাপক আকারে হত্যা করলে বিষয়টি এত জটিল হত না। জান তো যাবেই। প্রাণতো দেহ থেকে এক সময় বিচ্ছিন্ন হবেই। আজ, না হয় কাল, না হয় পরশু। তবে ব্যাপক হারে হত্যার বাজার গরম হলে হিজরত ও জিহাদের পথ উন্মুক্ত হয়। যা কখনো কামিয়াব হয়, আর কখনো বাহ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু একদিন না একদিন হিজরত তার কারিশমা দেখিয়ে দেয়। জিহাদের অগ্নিশিখা তার অন্তর্নিহিত আধার থেকে বাইরে বের হয়ে এসে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

কিন্তু ইংরেজরা ছিল মারাত্মক প্রতারক, ধোকাবাজ, ঠগ, চতুর ও চরম চক্রান্তকারী। তারা উপমহাদেশে রাজত্ব করার অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক কিছুই শিখেছিল। তারা হিজরত ও জিহাদের শক্তি সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত ছিল। এ ব্যাপারে তারা এত অধিক অবগত ছিল যে, বর্তমানের অনেক মুসলমানও অত অবগত নয়। বিধায় তারা জানের চেয়ে অধিক ঈমানের উপর আঘাত হানে। ইংরেজরা শুধু তাদের প্রাণ

হরণ করে—যাদের অস্তিত্ব থেকে ঈমানের নূর বিকশিত হয়। যারা তমাশা নিমজ্জিত মানবতাকে পথ দেখায়। ইংরেজ মুসলমানদের মধ্যে জিহাদ অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারী মুরতাদদেরকে খাড়া করে দেয়। তারা আধুনিকতার বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে কিছু মুসলমানের পথ পরিবর্তন করে দেয়। তারা এ ভ্রষ্ট লোকদেরকে জাতির হিরো বানানোর চেষ্টা করে। তারা দলাদলিকে দান ভিক্ষা দেওয়ার মাধ্যম বানায়। বরং একে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা কর, তাহলে নিজের প্রাণ বাঁচবে, সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং জায়গীর পাবে। ইংরেজের ধারালো এ খঞ্জর খুব দ্রুত কাজ করতে থাকে। হিন্দুরা ছিল তাদের সহযোগী। ফলে সত্যপন্থী মুসলমানদের প্রাণ যেতে থাকে।

ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, চক্রান্ত, কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার অন্ধকার ঝড়-ঝাপ্টার মাঝে সে যুগের কিছু প্রকৃত ইমাম পৃথিবীর বুকে এমন একটি স্থান তালাশ করছিলেন, যেখানে তাঁরা মুসলমানদের জানমালের হেফাজতের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তাঁদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সিংহাসন ও মুকুট তথা ইসলামের কর্তৃত্ব ও খেলাফত ব্যবস্থা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। কাজটি ছিল বিরাট। যা সে সময় বাহ্যত অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোথায় ইংরেজ সরকারের দাপট ও পরাক্রম, আর কোথায় দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ ও নিঃসম্বল কয়েকজন উলামায়ে কেরাম। কোথায় ইংরেজ সরকারের বিস্তৃতি ও সর্বগ্রাসী ক্ষমতা, আর কোথায় সীমিত কিছু উপকরণের অধিকারী, বরং উপকরণহীন কিছু মৌলভী। কিন্তু তাঁরা জমিনের দিকে না তাকিয়ে আসমানের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁরা জমিনের বুকে জায়গা তালাশ করছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি ছিল জমিন সৃষ্টিকর্তার দিকে। বাহ্যত এঁরা দুর্বল হলেও তাঁদের বক্ষে সাগরের তরঙ্গমালার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ঈমানী উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। তাঁরা বাহ্যত ইংরেজের শ্যেন দৃষ্টির মধ্যে থাকলেও তাঁদের মন-মগজ ইংরেজের দাসত্ব ও তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। সময় তাঁদের অনুকূল ছিল না, কিন্তু তাঁরা সময়ের জটিলতাকে অন্তরে স্থান দিতেন না। তাঁদের প্রত্যেকে নিঃসন্দেহে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নিম্নোক্ত ব্যাপক অর্থবোধক এ বক্তব্যের বাস্তব প্রতীক ছিলেন।

"বড় বড় লোকেরা সময়ের প্রতিকূলতার ও উপায় উপকরণের স্বল্পতার ওজর পেশ করে থাকে। কিন্তু এমতাবস্থায়ও দৃঢ় সংকল্প ও যুগ বিজয়ী ইমাম আত্মপ্রকাশ করেন আর বলেন, সময় অনুকূল না হলে, আমি তাকে অনুকূল করে নেব। উপকরণের অভাব থাকলে, নিজ হাতে উপকরণ তৈরী করে নেব। জমিন সমমনা না হলে, আসমানকে নামিয়ে আনবো। মানুষ সঙ্গ না দিলে ফেরেশতা নিয়ে কাজ করবো। সাথী না থাকলে কারো ধার ধারবো না, বৃক্ষরাজিকে সাথে নিয়ে পথ চলবো। দুশমন অসংখ্য হলে আসমানের বজ্রও অগণিত রয়েছে। বাধা, বিপত্তি ব্যাপক হলে পর্বত ও ঝঞ্ঝাবায়ু পথ পরিস্কার করে দিবে। তাঁরা যুগের চাকর নন যে, যুগের কথা মত চলবেন। তাঁরা যুগ সৃষ্টিকারী ও প্রতিপালনকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা যুগের কথায় চলেন না, বরং যুগ তাঁদের নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে থাকে। তাঁরা দুনিয়ার দিকে এতদুদ্দেশ্যে দৃষ্টি দেন না যে, সেখানে যা আছে তা দিয়ে নিজের আঁচল পূর্ণ করবেন। তাঁরা তো কি নাই তাই দেখতে আসেন এবং তা পূর্ণ করেন।"

আজ থেকে দেড় শো বছর পূর্বে উপমহাদেশের হকপন্থী উলামায়ে কেরাম যুগের প্রয়োজনে ইসলাম ও ঈমানের আলো প্রজ্জ্বল করার সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করা সত্ত্বেও নতুন আঙ্গিকে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার পশ্চাতপদ দেওবন্দ নামক গ্রামটি তাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ গ্রামের চতুর্দিকে জ্ঞানী-গুণী মানব প্রসবার বসতি ছিল। একটি ডালিম গাছের নীচে মাহমূদ নামের ওস্তাদ আর মাহমূদ নামের ছাত্র নিয়ে দারুল উলূমের সূচনা হয়। যার নজরকাড়া সবুজ শ্যামল পত্রপল্লব ভরা ডালপালা আজ আকাশ স্পর্শ করছে। বাহ্যত এটি ছোট একটি মাদরাসা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ওলীউল্লাহ খান্দানের ইলমে হাদীস, সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)এর কাফেলার জিহাদী জযবা ও শাহাদাতের অনুরাগ এবং মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)এর ইলমে মারিফাতের ধারক বাহক ও উত্তরাধিকারী। বাহ্য দৃষ্টিতে নিঃসম্বল এ প্রতিষ্ঠান মূলত উপমহাদেশ ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সমস্ত ঈমানী জরুরত পূরণের দায়িত্ব নিয়েছিল। পরবর্তী

ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, মুসলমানদের যখন যে জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, দারুল উলূম দেওবন্দ সে প্রয়োজনকে এমনভাবে পূর্ণ করেছে যে, নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও মুশরিকরা যে ষড়যন্ত্রই করেছে, দারুল উলূম দেওবন্দ সব ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ইসলামের দিকে লক্ষ্য করে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে যে তীরই ছুটে এসেছে, আহলে ইসলামের পক্ষ থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের বক্ষ ঢাল হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। সত্য কথা এই যে, দারুল উলূম দেওবন্দের বহুমুখী খিদমতের যথাযথ বর্ণনা দিতে কলম অপারগ এবং রসনা নির্বাক হয়ে যায়। দেওবন্দ নিঃসন্দেহে একটি গ্রামের নাম। কিন্তু আহলে হকের কলিজার খুন তাকে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মনোগ্রাম বানিয়েছে। বর্তমানে 'দেওবন্দী' বলতে কাকে বুঝায়? শুধু দেওবন্দের অধিবাসীকে? না শুধু দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে পাঠ গ্রহণকারীকে? না যে দারুল উলূম দেওবন্দকে সচক্ষে দেখেছে তাকে? কক্ষণই না। বরং যে ব্যক্তিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সত্যিকারের আকীদা, ইসলামের সঙ্গে অকপট সম্পর্ক এবং দ্বীনের খাতিরে জান ও মাল কুরবানী করার সত্যিকারের জযবা রাখে, সেই নিজেকে 'দেওবন্দী' বলতে গর্ব অনুভব করে। কেন? তার উত্তর স্পষ্ট।

হায়! গুরুত্বসহ যদি এ বিষয়টি উপলব্ধি করা হত যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের ঈমান ও ভবিষ্যত যখন বিপদের মুখে ছিল, সেখানকার অধিকাংশ মুসলমান যখন আযাদীর উচ্ছাস থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল, কিছু মুসলমান যখন রবকে ছেড়ে কবরের সম্মুখে মস্তক অবনত করছিল, আর কিছু মুসলমান নতুন নতুন ফের্কা তৈরী করছিল, এমন ঘোর অন্ধকারময় যুগে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম হকের প্রদীপ দেওবন্দে প্রজ্জ্বলিত করেন। তারপর সে আলো সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করতে থাকে। দেওবন্দের মাটিতে যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তা ছিল মক্কা ও মদীনার প্রদীপ। তা ছিল মদীনার সম্রাট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য দ্বীনের প্রদীপ।

অবস্থা এমন হলো যে, মৃত্যুমুখে পতিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যে কূপ থেকে

পানি লাভ করে, সে ঐ কূপকে ভালবাসতে থাকে, তবে সে স্বীকার করে যে, পানি আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পিপাসা নিবারণের জন্য যে কূপকে মনোনীত করেছেন, আলোচনার সময় সে কূপের নামটিও এসে যায়। আজ যারা 'দেওবন্দী' শব্দটিকে তিরস্কার করে, তারা ভেবে দেখে না যে, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল নিজেকে 'বুখারী' বলতেন। সমগ্র বিশ্বও তাকে 'বুখারী' বলে থাকে। এমনকি হাদীসের সর্বাধিক প্রামাণ্য সহীহ গ্রন্থটিকেও 'বুখারী' বলা হয়। অথচ কিতাবের বিষয়বস্তু সবই মক্কী ও মাদানী, দ্বীনে মুহাম্মাদী। তবে বুখারার মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ার ছিল। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে।

এমনিভাবে দেওবন্দভূমি হকপন্থী উলামাগণের কেন্দ্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার ছিল। তা সে লাভ করেছে। দেওবন্দের সম্পর্ক সরাসরি হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর সঙ্গে। তাই দেওবন্দীরা হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এরও অনুরক্ত। দেওবন্দীরা জ্ঞানের লাঠি হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে লাভ করেছে। বিধায় যাদেরকে দেওবন্দী বলা হয়, তারা সবাই হানাফী ফেকাহরও অনুরক্ত। দেওবন্দের প্রদীপ থেকে বিস্তৃত আলো নতুন নয়, বরং তা পুরাতন আলো। পবিত্র মদীনার আলো। আর এজন্যই দেওবন্দের আলো থেকে ফয়েয লাভকারীরা মদীনার লোকেদের উস্তাদ হন। মদীনার লোকেরাও তাদেরকে মাথায় তুলে রাখে। বিগত দেড়শ' বছর ধরে হকপন্থীদের নিকট দেওবন্দের নাম সত্যের মাপকাঠির রূপ গ্রহণ করেছে। এটি আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। তাঁরই প্রদত্ত মকবুলিয়াত। কথাটি এভাবে বললেও ভুল হবে না যে, দেওবন্দের সন্তানেরা দ্বীনের উপর আক্রমন ও আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে এবং দ্বীনের খেদমত করতে এ পরিমাণ কুরবানী করেছেন যে, তাঁরা মহান আল্লাহর নজরে মকবুল হয়ে যান।

হিন্দুস্তানে কাদিয়ানী ফিতনার ঝড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তা নিষ্পেষিত করার মর্যাদা উলামায়ে দেওবন্দই লাভ করেন। বর্তমানেও কাদিয়ানী বিষবৃক্ষ একমাত্র উলামায়ে দেওবন্দের কারণেই থরথরিয়ে কাঁপে। উপমহাদেশে বিদআতের ঝঞ্ঝা শুরু হলে তার প্রতিরোধও

উলামায়ে দেওবন্দই করেন। তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা না হলে কুচক্রী হিন্দুরা মুসলমানদেরকেও বুদ্ধদের মত মূর্তিপূজক বানিয়ে ছাড়ত। উপমহাদেশে আধুনিকতার ফিতনার আগমন ঘটলে উলামায়ে দেওবন্দই তার মস্তক চূর্ণ করে। এমনিভাবে ধর্মবিদ্বেষ, ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মবিকৃতির অসংখ্য ফিতনা উলামায়ে দেওবন্দের ঈমানদীপ্ত আক্রমণের মুখে স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

দেওবন্দের এসব বহুবিধ খেদমতের কারণে উপমহাদেশের মুসলমানদের আকীদা, আমল, চেতনা, প্রকৃতি, বুঝ ও কর্মপদ্ধতি নিরাপদ থাকে। ইংরেজ শাসনামলে জিহাদের নাম মুখে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ কুরআন ও সুন্নাতের সহীহ তা'লীমের ব্যবস্থা করে জিহাদের মতাদর্শকে সংরক্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে মুসলমানগণ জিহাদের নাম ও অর্থ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে যেত। দারুল উলূম দেওবন্দ দ্বীন ও জিহাদের হেফাজত করার ফলে আল্লাহ তাআলা তার ফয়েযকে চতুর্দিগন্তে ছড়িয়ে দেন। বর্তমানে বিশ্বের এমন কোন ভূখণ্ড নেই, যেখানে দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েয পৌঁছায়নি বরং সত্য কথা এই যে, আজ দেওবন্দের অধিবাসীদের তুলনায় দেওবন্দ থেকে দূরে অবস্থিত বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েয অধিক লাভ করছে। অর্থাৎ এ ঈমানী নূর যেন স্থান ও কালের সীমানা অতিক্রম করে গেছে।

দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েয একদিকে যুগের মহান মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির ও মুহাক্কিক জন্ম দিয়েছে। অপরদিকে জিহাদের ফয়েযও এ প্রতিষ্ঠানের বিশাল খেদমতসমূহের অন্যতম অবিস্মরণীয় অঙ্গ। বরং দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার একটি বড় লক্ষ্য জিহাদ ও জিহাদী আন্দোলন সংরক্ষণ করা। আকাবির হযরাতদের লেখনী ও কর্মপদ্ধতিও এ কথার সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া এ কথাও সত্য যে, নিজেকে হকপন্থী বলাই যথেষ্ট নয়, বরং সেজন্য নিজের মধ্যে হকপন্থীদের নিদর্শন থাকতে হবে। হকপন্থীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন দুটি—

১. ইলম ও ২. জিহাদ।

অর্থাৎ সঠিক সূত্রে (সনদ) প্রাপ্ত প্রামাণ্য দ্বীনের সহীহ বুঝ আর দ্বীনের

হেফাজতের জন্য কুরবানী পেশ করা। ইলম না থাকলে দ্বীনের সঠিক বুঝ লাভ হতে পারে না। আর দ্বীনের জন্য কুরবানী করা না হলে দ্বীন কিতাবের পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ থাকবে। তা প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। ফলে বাস্তব জীবনে মানুষ দ্বীনকে পরিত্যাগ করবে। দারুল উলূম দেওবন্দ ছিল আহলে হকের মারকায তথা কেন্দ্র। তাই সে যেমন ইলমের হেফাযত করেছে, তেমনি জিহাদেরও হেফাযত করেছে। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং শামেলীর ময়দানে সিপাহসালার ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের রুহানী সিলসিলাও জিহাদী আলোয় আলোকিত ছিল। বরং ইলম ও জিহাদই দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচয়। যে ইলমের সঙ্গে জিহাদের আমল নেই, উলামায়ে দেওবন্দ তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আর যে জিহাদের পেছনে ইলমের শক্তি কার্যকর নয়, তা উলামায়ে দেওবন্দের নিখাঁদ দ্বীনী যওকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের আকাবিরগণ উপমহাদেশের মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে দেওবন্দ থেকে যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তা ইলম ও জিহাদের বিস্তৃতির ফলে দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

পরিতাপের বিষয় যে, দেওবন্দ ভূমি দারুল উলূম ও মাকবারায়ে কাসেমী ছাড়া অধিক কিছু লাভ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে দেওবন্দ থেকে দূরের অনেক অঞ্চল এ প্রদীপের আলোতে চমৎকার আলোকিত হয়েছে। প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু ও মারাত্মক বিপদের মুখে দেওবন্দের আন্দোলন সিনাটান করে পথ চলেছে। সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। ১৯৪৭ এর ঘটনাবলী দেখা দেয়, কিন্তু দেওবন্দের ফয়েয ওপারেও থাকে এবং এপারেও স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ এর দুর্ঘটনা সামনে আসে এবং দেশ বিভক্ত হয়। কিন্তু দেওবন্দের ফয়েয প্রত্যেক অংশের ঈমান হেফাযত করার দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এত সব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেওবন্দী ফয়েযের বাহুতে তরঙ্গায়িত বিদ্যুতের জন্য অন্য একটি ময়দানের জরুরত ছিল। যে ময়দানে কাসেমী শক্তি সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।. কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সে ময়দান? কোথায় পুরা হবে হৃদয়ের সে বাসনা? দারুল উলূম দেওবন্দ ভারতে রয়ে যায়। যেখানে ইংরেজদের যুগের মত হিন্দুদের নিকৃষ্টতম যুগ পায়ের শিকল ও

হাতের বেড়ি হয়ে আছে। সেখানে তো দ্বীন ও দ্বীনী ইলমের সংরক্ষণই বিরাট কৃতিত্ব। দেওবন্দের বিরাট ফয়েয পাকিস্তানে পৌঁছে। কিন্তু এখানেও মুনাফেকীর দুষিত বায়ু পরিবেশকে নোংরা ও সংকীর্ণ করে। এখানে ইলম এবং দ্বীনের হেফাযত কিংবা কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক দৌড়ঝাঁপের অতিরিক্ত আর কি করা সম্ভব? একই অবস্থা বাংলাদেশেরও।

এহেন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান স্বীয় মন ও জমিনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কমিউনিষ্ট শাসকরা ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন আফগানিস্তানের হকপন্থী উলামায়ে কেরাম মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। মোকাবেলা শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিজের জুলুম অত্যাচার রক্ষার্থে আফগানিস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আফগানিস্তানে রাশিয়া পা রাখতেই দেওবন্দের সত্যিকারের ফয়েয উদ্বেলিত সাগরের ন্যায় তরঙ্গায়িত হতে থাকে। ফলে আকাশ এমন দৃশ্যাবলী অবলোকন করে, যা তাকে বদর, হুনাইন, কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অহমিকার সম্মুখে ইসলাম পাগলেরা এমনভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যে, সময় তার পরিক্রমা বিস্মৃত হয়ে যায়। দেওবন্দ জিহাদের যে আদর্শ সংরক্ষণ করেছিল, তা আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে কৃতিত্ব দেখায়। শাহাদাত সেখানে সৌভাগ্যরূপে আবির্ভূত হয়। মৃত্যু তাঁদের চোখে প্রিয়তমার মত আকর্ষণীয় দৃষ্টিগোচর হয়। দুশমনের শক্তি মাকড়সার জালের মত দুর্বল হয়ে দেখা দেয়। তখন এমন লোকও জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যারা সত্যের আলোকের পরিপূর্ণ ফয়েয প্রাপ্ত ছিল না। জিহাদের মুবারক আমল তাদেরকে পর্দাবৃত করে রাখে। তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে দেশ তাদের হাতে চলে আসে, কিন্তু ইলমের স্বল্পতা, তাকওয়ার শূন্যতা এবং মাদরাসার চাটাই থেকে প্রাপ্ত আযাদী থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রতিবন্ধক হয়। তারা নিজেরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়। জিহাদের সূর্য গ্রহণ আক্রান্ত আলোকহীন মলিন বলে দৃষ্টিগোচর হয়। জিহাদ বিরোধীদের মুখ খুলে যায়। আমরা এরূপ বলতাম, আমরা সেরূপ বলতাম, এরকম অশুভ শব্দাবলী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মুখ দিয়ে বের হয়ে হকপন্থীদের অন্তর দগ্ধ করতে থাকে।

এমন জটিল মুহূর্তে ডালিম গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা মুসলিম উম্মাহর কাজে আসে।

একজন দরিদ্র, নিঃসম্বল ও দুর্বল তালিবে ইলম কান্দাহারের একটি মাদরাসার চাটাই থেকে জালিম, অত্যাচারী ও ফেরাউনদেরকে চ্যালেঞ্জ করে পথে নামেন, আর দেখতে দেখতে প্রথমে আফগানিস্তানের উপর তারপর সমগ্র বিশ্বের চেতনার উপর আচ্ছন্ন হয়ে যান। ডালিম গাছের তলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি সত্যিই এত শক্তিশালী? কালিমা তায়্যিবার সবক নিয়ে ইলমের সূচনাকারী দুর্বল, অনাথ ও নিঃসম্বল তালিবে ইলম কি এতই শক্তিশালী? এর বাস্তব উত্তর সম্ভবত মানুষের চেয়ে অধিক পাথর অবগত। বামিয়ানের দৈত্যাকৃতির মূর্তির সেই পাথর, যা একজন মাদরাসার তালীবে ইলমের বরকতে আযাদী লাভ করে। সে পাথর দু' হাজার বছর ধরে মূর্তির দাস ছিল। আজ বিশ্ব বিবেক ভাবছে যে, যে তালিবে ইলম দুই হাজার বছরের অহমিকা চূর্ণ করতে পারে। তার জন্য দুই শতাব্দীর অহমিকা চূর্ণ করা কোন জটিল ব্যাপার কি? এ কথা ভেবে দুই শতাব্দীর প্রতিষ্ঠিত শ্বেত মূর্তি কাঁপছে। দাসত্বের বেড়ী পরা দেওবন্দ ভূমি অশ্রুসিক্ত নয়নে কান্দাহারের আযাদ ভূমিকে মুবারকবাদ দিচ্ছে। ডালিম গাছ পুলকে দোল খাচ্ছে। কুরআন মাজীদের পৃষ্ঠাসমূহ আনন্দে হাসছে। আর কান্দাহারের গরীব তালিবে ইলম, ইলম ও জিহাদ সংরক্ষণের কারণে দেওবন্দ ভূমির শুকরিয়া আদায় করছেন।

এক শতাংশ কারা

আজ 'মা'রেকার' অঙ্গনে পা রাখতে আমার মরহুম জিগার মুরাদাবাদীর কয়েকটি কবিতা স্মরণ হচ্ছে। কবিতা কয়টি নিকট অতীতের জিন্দাদিল মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর পছন্দনীয়। মজার ব্যাপার হল, হযরতের আবেদনে মরহুম জিগার সাহেব নিজ মুখে কবিতাগুলো তাঁকে বারবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। আলী নদভীর খোদাপ্রেমিক হৃদয় আর জিগার সাহেবের অনুতপ্ত হৃদয়ের উষ্ণতা কবিতাকে দুধারী বানিয়েছে। সুধী পাঠক! আপনিও দুধারী এ আনন্দ ও বেদনার অংশীদার হোন।

جب تک غم انسان سے جگر، انسان کا دل معمور نہیں
جنت ہی سہی دُنیا لیکن، جنت سے جہنم دور نہیں
جز ذوق طلب، جز شوق سفر، کچھ اور ہمیں منظور نہیں
اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں
واعظ کا ہر اک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر
آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرہ پہ یقیں کا نور نہیں
میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں
توہین ہے دست و بازو کی، وہ وار کہ جو بھرپور نہیں
اس نفع و ضرر کی دُنیا سے، میں نے یہ لیا ہے درس جنوں
خود اپنا زیاں تسلیم مگر، اوروں کا زیاں منظور نہیں
ارباب ستم کی خدمت میں، اتنی سی گزارش ہے میری
دُنیا سے قیامت دور سہی، دُنیا کی قیامت دور نہیں

জিগার মুরাদাবাদীর কবিতার ভাবার্থ নিম্নরূপ—

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানবতার বেদনায় মানব-হৃদয় সমৃদ্ধ না হবে, জান্নাততুল্য জগতের অধিবাসী হলেও সে জাহান্নামের যাতনায় পিষ্ঠ হবে। অন্বেষার মত্ততা আর পথচলার অনুরাগ ভিন্ন আমার আর কোন আকাংখা নেই। ওহে প্রেমাস্পদ! এবার আমার কি হবে, গন্তব্য নাকি অদূরে? উপদেশদাতার প্রত্যেক উপদেশ যথার্থ, বাক ভঙ্গিমাও মনোরম। কিন্তু নয়নে প্রেমের পুলক ও মুখমণ্ডলে বিশ্বাসের জ্যোতি নেই। আমি আঘাত সহ্য করি আর আঘাতকারীকে বলি যে, যে আঘাত পূর্ণাঙ্গ ও তীব্র নয়, তা বাহুর জন্য অবমাননাকর। লাভ ক্ষতির এ জগত থেকে আমি প্রেমের এ পাঠ গ্রহণ করেছি যে, আমার সব শেষ হোক, আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হোক। জুলুমকারীদের খেদমতে আমার এতটুকু মাত্র নিবেদন

যে, দুনিয়া থেকে কেয়ামত দূরে হলেও, দুনিয়ার কেয়ামত দূরে নয়।"

যখন মানুষ আপন হৃদয়ে বেদনা ও অস্থিরতার তোলপাড় উপলব্ধি করে, তখন তার রসনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দুআ, কিছু বাক্য ও কিছু কবিতা উচ্চারিত হতে থাকে। কারাজীবনে বার বার আমার এ অবস্থা হয়েছে। একবার

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

দুআটি মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ দুআ আমার নির্জনের ধ্বনিরূপে আবির্ভূত হয়। কিছুদিন

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰي مَعَادٍ

পবিত্র আয়াত জিহ্বায় লেগে থাকে। কিছুদিন নিম্নের কবিতাটি আপনা আপনি বারবার মুখে উচ্চারিত হতে থাকে—

ادھر آ شب غم گلے سے لگا لیں
کہ تو بھی اکیلی ہے ہم بھی اکیلے

"হে বিষাদময় রজনী ! আমার ধারে আসো,
আমি তোমাকে আলিঙ্গন করবো।
তুমিও নিঃসঙ্গ, আমিও নিঃসঙ্গ।"

পরিশেষে মাওলানা আবু জান্দালকে দিয়ে কবিতাটি সুন্দর করে লিখিয়ে প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখি। তারপর এর হাত থেকে মুক্তি পাই। কারাজীবনের এ পাগলামী, বরং মত্ততার ধারাবাহিকতা এ কবিতায় এসে শেষ হয়—

نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم
مگر نازم بہ ایں ذوقی کہ پیش یار می رقصم

"আমি বুঝিনা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের সময় আমি কেন নৃত্য করতে থাকি। তবে আমি যে বন্ধুর সম্মুখে নৃত্য করছি, সেজন্য আমি গর্বিত।"

কারাগারের শেষ দিনগুলোর একাকীত্বে, অনেক সময় মজলিস চলাকালে এবং পাঠদান কালেও মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপরোক্ত কবিতাটি এসে যেত। কারাসঙ্গীরা অনেক সময় এর অর্থও জিজ্ঞেস করত। কান্দাহার আসার পর যখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন, তখন কবিতাটি আমাকে মুক্তি দেয়। সুধী পাঠক! কথা অনেক দূর গড়িয়েছে। এবার আসুন মরহুম জিগার সাহেবের কবিতার দিকে ফিরে যাই।

কিছুদিন পূর্বে ভারতের একটি পত্রিকা এবং জার্মানের একটি রেডিও সার্ভিসকে একটি দুঃসাহসমূলক, লাগামহীন ও সুস্পষ্ট সাক্ষাতকার দেওয়া হয়। সাক্ষাতকার তো নয়, এ যেন ধারালো খঞ্জর। জানিনা কোন আবেগ, কোন চিন্তা ও কি কি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সাক্ষাতকার দেওয়া হয়েছে। খঞ্জরের আঘাতে কারা ক্ষত বিক্ষত হল, তা বোধহয় খঞ্জর চালনাকারীও অনুমান করতে পারেনি। সাক্ষাতকারটি ছিল এরকম—

"দাড়ি বড় কর। বসন্ত উৎসব উদযাপন করো না। নেংটি পরিধান করো না। এসব পশ্চাৎপদ লোকদের কথা। দেশে এদের সংখ্যা মাত্র এক শতাংশ।" ইত্যাদি ইত্যাদি। সাক্ষাতকারে এমন বেদনাবিধূর বক্তব্য ছাড়া এমন সংকল্পও ব্যক্ত করা হয় যে, এ এক শতাংশ লোককে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হবে। এ দেশকে একটি মুসলিম মডার্ন দেশে পরিণত করা হবে।

সাক্ষাতকারটি কে দিয়েছিল তা সমগ্র জাতিই জানে। কিন্তু জাতি হয়ত অনুমান করতে পারেনি যে, এ সাক্ষাতকারের কু-প্রভাব কত দূর গিয়ে পড়ছে।

'দাড়ি বড় করো' এটি কোন মৌলভী, মুজাহিদ বা চিন্তাবিদের নির্দেশ নয়। বরং মদীনার সম্রাট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে এ হাদীস উল্লেখিত আছে। হাদীসের সনদ 'সহীহ' এবং 'মতন' হুবহু ঐই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন (তাঁর প্রত্যেক ইরশাদের উপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক।) 'দাড়ি বাড়াও'।

'বসন্ত উৎসব উদযাপন করো না' দেশের কোন ফতওয়া বিভাগ, মাদরাসা কিংবা জিহাদী সংগঠনের ঘোষণা নয়। বরং বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের পথ-পন্থা এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে, তাদের আনন্দ দিবস ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে তাঁর প্রত্যেক উম্মতকে নিষেধ করেছেন। বসন্ত উদযাপনও মুশরিকদের একটি অনুষ্ঠান। যা এ হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ।

'নেংটি পরো না' এটিও কোন মৌলভীর উচ্ছ্বসিত বক্তব্য কিংবা কোন মুফতীর ব্যক্তিগত ফতোওয়া নয়। বরং বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য, শালীন ও আত্মমর্যাদাশীল মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হলো—'ছতর ঢেকে রাখো'। যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রদ্ধা করেন এবং মেনে চলেন, তারা ছতর ঢেকে রাখেন। নেংটি বা হাফপ্যান্ট পরেন না। আর যাদের হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তারা তো নেংটি পরার কষ্ট স্বীকার করা থেকেও স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাদের চোখে তো নেংটি পরার বাধ্যবাধকতাও পশ্চাৎপদ লোকদের অনর্থক কাজ বলে মনে হয়। সাক্ষাতকার দানকারীর যদি এসব কথা অজানা থেকে থাকে, তাহলে এখনও তাওবার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু অপরিণামদর্শী, কুফর পূজারী ও ধর্মদ্রোহী উপদেষ্টারা যদি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলিয়ে থাকে, তাহলে তার একথাও মনে রাখা দরকার যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ নিষেধের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এক শতাংশ নয়। আর যদি এক শতাংশই হয়ে থাকে, তাহলে তারা প্রাণহীন, ব্যক্তিত্বহীন ও মৃতহৃদয়ের নয়।

প্রথমত সংখ্যা ও হিসাব-কিতাব ঠিক করার প্রয়োজন রয়েছে। দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাগজে লিখিত রিপোর্টের পরিবর্তে দেশের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করা দরকার। অন্যথায় মনে রাখবেন, সংখ্যা ও গণনার আনন্দদায়ক, বরং পথভ্রষ্টকারী ভুল সবসময় ধ্বংসের কারণ হয়েছে। অতীতের কতিপয় রাষ্ট্রনায়ককে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের

অল্প কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। উঁচু অট্টালিকার বিলাসপূর্ণ পরিবেশ, নাপাক শরাবে পূর্ণ পানপাত্র এবং নির্লজ্জ নর্তকীদের শূকরের মত থপথপে দেহ শাসকদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল। তারা বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত বক্তব্য ঝাড়ে। ফলে এমন ঝড় শুরু হয়, যা কেউ সামলাতে পারেনি। মুসলমানদের গৃহ বিরান হয়। ইসলাম, ঐক্য ও তাকওয়ার নামে বন্দুকধারীদের হাতে মুসলমান নারীদের সতীত্ব বিনষ্ট হয়। দেশ বিভক্ত হয়ে যায়। ভ্রান্ত উপদেষ্টাদের মুখে কালিমা লেপন হয়। সরকার স্বীয় মস্তকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের খুন, হাজার হাজার নারীর সতীত্ব হরণের কালিমা নিয়ে দৃশ্যপট থেকে সরে পড়ে। জমিনের সাথে সাথে আকাশও তাদের উপর অভিশম্পাত করে। জাতির যে শক্তিকে তারা বাপ–দাদার জায়গীর মনে করত, তা তাদের কোনই কাজে আসেনি। কোথায় আজ ইয়াহইয়া খান? কোথায় সেই ভুট্টো সাহেব? শক্তি ও শরাবের নেশায় নিমজ্জিত জেনারেলরাই বা আজ কোথায়? তারা সবাই এখন মহান আল্লাহর আদালতে একাকী দাঁড়িয়ে। জাতির কেউ তাদের জন্য সূরা ফাতেহা পাঠকারীও নেই। হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট পাঠ করে মেয়ের বাবারা লজ্জায় মস্তক অবনত করছে। 'কয়েকজন বাঙ্গালী', 'কয়েকজন বাঙ্গালী' বলে বুদ্ধিজীবীরা দেশকে এমনভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত আর শক্ত ভাবে দাঁড়ানো নসীব হচ্ছে না।

এবারেও সেই পুরাতন খেলা পুনর্বার খেলা হচ্ছে। এবার 'কয়েকজন বাঙ্গালীর' স্থলে 'কয়েকজন মৌলভী' ও 'কয়েকজন মুজাহিদ' শব্দ মুখে আওড়ানো হচ্ছে। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এ শব্দই দেশের সর্ববৃহৎ সমস্যা হয়ে আছে। দেশের দুশমন সাংবাদিকরা সরকারের এ দুর্বলতা আঁচ করতে পেরেছে। পরান্নভোগী বুদ্ধিজীবীরা এ দুর্বলতা দ্বারা পরিপূর্ণরূপে ফায়দা লুটছে। সর্বত্র কয়েকজন মৌলভী আর কয়েকজন মুজাহিদ চক্ষুশূলরূপে বিঁধছে। মনে হচ্ছে যেন, দেশের মসজিদ, মাদরাসা, উলামায়ে কেরাম ও দেশের জিহাদী সংগঠনসমূহ কয়েকটি দুর্বল, অসহায় ও নিঃসম্বল পশু। যেগুলোকে ধ্বংস না করলে সরকার দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বহাল করতে পারছে না। এগুলোকে ধ্বংস

করতে পারলেই তারা আমেরিকা ও ইউরোপের চোখের জ্যোতি হয়ে যাবে। তারা বর্তমান সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সরকার বলে মেনে নিবে। তাদেরকে সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়ে চিরজীবন ও চিরদিনের ক্ষমতা দান করবে। আর তাই দেশের লোকদের দাড়ি মুণ্ডানো উচিত, তাহলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। নেংটি ও হাফপ্যান্ট পরা উচিত, তাহলে অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। বসন্ত ও বড়দিন উদযাপন করা উচিত, তাহলে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিদূরীত হবে।

এমনিভাবে এ প্রতিক্রিয়াও ব্যাপক আকার ধারণ করছে যে, দেশের ধর্মীয় গোষ্ঠী সরকারের সংযমশীলতার কারণে বেঁচে আছে। অন্যথায় সরকার চাইলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত মসজিদ, মাদরাসা, মৌলভী ও মুজাহিদদেরকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। তাহলে দেশে আসমানী বরকতের বারি বর্ষণ হতে থাকবে। আমাদের দেশ ইউরোপের দৃশ্য তুলে ধরতে থাকবে।

সাথে সাথে সরকারকে একথাও শিখানো হচ্ছে যে, দেশের ধার্মিক শ্রেণী ফার্মের মুরগীর মত দুর্বল। তাতারীদের মত ছুরি আর তরবারী উঠালেই এরা আপন গ্রীবা তরবারীর নীচে পেশ করতে থাকবে। আর দেখতে দেখতেই ইসলামের নাম ঘোষণাকারীরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেশ আল্লাহ ও রাসূলের নাম ঘোষণাকারীদের অস্তিত্ব থেকে পবিত্র (?) হয়ে যাবে। তখন মদপানকারীদের শানে কেউ গোস্তাখী করতে পারবে না। নগ্নতা ও অশ্লীলতার হেফাযতের জন্য সশস্ত্র যুবকদের পাহারা দিতে হবে না। কারো উপর বস্ত্র পরিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আযানের আওয়াজে গান শ্রোতাদের ডিষ্টার্ব হবে না। শহীদদের হাড্ডি দ্বারা বানানো ব্যাট দ্বারা ভারতের ক্রিকেটারগণ সহজে ক্রিকেট খেলতে পারবে। বলিউডের শিল্পীরা এ দেশে এসে উলঙ্গ নৃত্য করতে সন্ত্রস্ত হবে না।

আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এমন সুদৃশ্য চিত্রের স্বপ্ন দেখছে। এর খাতিরে রাতদিন একাকার করছে। এ ধরনের বুদ্ধিজীবী ও উপদেষ্টারা এখন খোলাখুলিভাবে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানসমূহকে মন্দ বলতে আরম্ভ করেছে। তারা সরকারকে কামাল আতাতুর্ক ও জামাল আবদুন নাসেরের কীর্তিগাঁথা শুনিয়ে সাহস বৃদ্ধি

করছে। এমন বেদনাদায়ক পরিস্থিতি দেখে আমার মরহুম জিগার সাহেবের ঐ কবিতা স্মরণ হচ্ছে, যা প্রবন্ধের শুরুতে আপনারা পাঠ করেছেন।

হায়! গাফলতি, পাষণ্ডতা ও শক্তির মদমত্তে নিমজ্জিত উচ্চ অট্টালিকার অধিবাসীদের পর্যন্ত কেউ যদি প্রকৃত সত্য কথা পৌঁছে দিত এবং সরকারকে বুঝিয়ে দিত যে, তারা যেন দুই চার বছরের রাজত্ব ও কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করতে এত অধিক অগ্রসর না হয়, যার ফলে ঈমানের চাদর আর দেশের নিরাপত্তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এদেশে রাসূলের আশেক আর ইসলামের প্রেমিকের অভাব নেই। কারো সন্দেহ হলে সে যেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে জিজ্ঞাসা করে। ভারতের সাত লক্ষ সৈনিককে জিজ্ঞাসা করে। আর আল্লাহ তাওফীক দিলে ইউরোপের সন্ত্রস্ত শক্তিসমূহকে জিজ্ঞাসা করে। হায়! কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানকে পশ্চাৎপদ লোকদের কথা আখ্যা দেওয়ার পূর্বে ক্ষোভে, দুঃখে দ্রবীভূত অন্তরসমূহের প্রতি যদি তাকিয়ে দেখত! হায়! এক শতাংশের ধোকায় পতিত হয়ে ইসলামের উপর তরবারী চালানোর পূর্বে তারা যদি মুসলমানদের ইতিহাসকে হাতিয়ে দেখত।

আমরা অবগত আছি যে, মাদরাসা ও মসজিদ পিষিয়ে ফেলার জন্য বুলডোজার তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু তারা একথা কেন উপলব্ধি করছে না যে, ভারতের মত দেশ এক বাবরী মসজিদকেই হজম করতে পারেনি। অথচ সেখানকার মুসলমানরা দুর্বল ও নিঃসম্বল। আমরা জানি যে, অনেক মুজাহিদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কিন্তু তারা একথা কেন চিন্তা করছে না যে, আল্লাহর প্রেমিকদের খুন বড় তিতা হয়ে থাকে। এ খুন আজ পর্যন্ত দুনিয়া হজম করতে পারেনি। আমরা জানি যে, সরকার সহজে কিছু সংগঠন ও কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তিকে খতম করে দিতে পারে, কিন্তু তারা একথা কেন বুঝতে চাচ্ছে না যে, সংগঠনের নাম এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উপরের খোসা মাত্র। ইসলামের আসল মগজ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কারো কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। শহীদ আফাক ও বিলালকে বিশ্ব কখন চিনেছে? যখন তারা অপ্রতিরোধ্য ঝড় সৃষ্টি করেছে।

হে আল্লাহ! ক্ষমতার মদমত্তে নিজেকে ও আল্লাহকে বিস্মৃত আমাদের শাসকদেরকে হিদায়াত দান করুন। এরা নিজেদের কন্যাদের সতীত্বের পরিধেয় হেফাযতকারীদেরকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এরা মায়ের আঁচল ও বোনদের অবলম্বন ছিনিয়ে নিতে চায়। এরা জাতিকে সেই প্রবৃত্তি পূজারী হিংস্রদের হাতে তুলে দিতে চায়, যাদের নিকট নিজের কন্যাকে নগ্ন করা উন্নতির জন্য আবশ্যক। হায়! এসব লোক যদি শহীদদের মা ও গাজীদের বোনদের আবেগ সম্পর্কে অবহিত হত। হায়! এসব লোক যদি ইউরোপের পদতলে না এসে পবিত্র কুরআনের আলো লাভের চেষ্টা করত। একথা সত্য যে, এদেশে বর্তমানে ইসলাম প্রেমিকদের সংখ্যা এক শতাংশ নয়, বরং ইসলামের শত্রুদের সংখ্যাই এক শতাংশ। এদেশের লোক ইসলামের খাতিরে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানের খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করা নিজের সৌভাগ্য মনে করে। কারো সন্দেহ থাকলে সে যেন পরীক্ষা করে দেখে।

خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے؟

"তীর ধনুকধারীরাই বলে দেবে খেলায় কার হার হল।"

কিন্তু এ পরীক্ষা এটম পরীক্ষার চেয়ে অধিক ভয়ংকর। হে আল্লাহ! দেশকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন। এসব শাসককেই আপনি ইসলামের খাদেম বানিয়ে দিন। এরা কুফরী শক্তির খেদমত করুক, চাই ইসলামের খেদমত করুক, একদিন ক্ষমতা ও প্রাণ উভয়টিই হারাতে হবে। তখন কুফরের খেদমতকারীরা, জবরদস্তিমূলক দাড়ি মুণ্ডনকারীরা, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করে উম্মাতের দিলকে দগ্ধকারীরা এবং বাহ্যিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ঈমান গোপনকারীরা পস্তাবে।

হে মুসলমানেরা! একটু ভেবে দেখ। তোমরা শুধুমাত্র মানুষের দেখাদেখি দাড়ি মুণ্ডন করেছ। ফলে মানুষ একথা বলার সুযোগ পেয়েছে যে, এদেশে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশভূষাকে মুহাব্বতকারী এক শতাংশ। হে নবী প্রেমিকরা! বল, এ কেমন প্রেম?

তোমাদের একটি গোনাহর কারণে নবীকে তিরস্কার করা হচ্ছে? বল, আল্লাহর ওয়াস্তে বল! দাড়ি মুণ্ডন করে তোমরা কি পেয়েছ, আর ভবিষ্যতেই বা কি পাবে? কবরের মধ্যে কিভাবে তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াবে? হায়! তোমরাই যদি দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিতে। তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপহাস করার দুঃসাহস কারো হত না। তোমরা ইসলামকে কিছু দিতে না পারলেও ইসলামের ক্ষতি-করো না।

হে আল্লাহ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তুমি যা চাবে তাই হবে। তুমি ঈমানদারদেরকে নুসরাত করার ওয়াদা করেছ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানদারদের কাতারে শামিল কর। আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন, তাঁর তরীকা, তাঁর তাহযীব ও তাঁর প্রত্যেক হুকুমের সংরক্ষক বানাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের দুশমন কাফেরদের প্রাবল্য, চাপ ও পথ–পন্থা অবলম্বন করা থেকে হেফাজত কর। হে আল্লাহ! ইসলাম ও শান্তির হেফাজত কর। যাদেরকে এক শতাংশ বলে তিরস্কার করা হচ্ছে, তাদেরকে তোমার শক্তি ও সাহায্য দিয়ে বলবান কর। তিরস্কারকারীদেরকে তাওবা করে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান কর, আমীন, ইয়া রাব্বাশ শুহাদায়ি ওয়াল মুজাহিদীন।

ঈর্ষণীয় পরিবার

সম্প্রতি আমি কয়েকজন শহীদের সৌভাগ্যবান ও ঈর্ষণীয় পরিবারের সঙ্গে মোলাকাত করার গৌরব লাভ করি। ঈমানদীপ্ত সেই মোলাকাতকালে আমি তীব্রভাবে উপলব্ধি করি যে, আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামের খাঁটি অনুসরণ, ভালবাসাপূর্ণ প্রতাপ এবং শাশ্বত প্রভাব সহ অনেক পরিবারই আজও জীবন্ত রয়েছে। সেসব পরিবারে প্রথম শতাব্দীর চিত্র সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। শহীদদের মাতাপিতার প্রতিক্রিয়া শ্রবণ করে কুরআন মাজীদের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

২৫শে মুহাররামুল হারাম ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ২০০১ জুমুআবারে জাইশে মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধানে আরেফওয়ালায়

জিহাদভিত্তিক জলসার ব্যবস্থা করা হয়। আরেফওয়ালার মুসলমানগণ জিহাদের সঙ্গে প্রেমিকসুলভ ভালবাসা রাখে। এখানে জাইশের কাজ যথেষ্ট সুসংহত। বুরেওয়ালার দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাদেরিয়ার সম্মেলন শেষে আরেফওয়ালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সফরসঙ্গীরা জানান যে, পথিমধ্যে '৬৭ ই.বি' গ্রাম রয়েছে। সেখানকার চারজন ভাগ্যবান তরুণ শাহাদাতের অমূল্য ভূষণ লাভ করেছেন। রাতে জলসায় যাওয়ার পূর্বে এখানকার শহীদদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে।

মাগরিব নামায পথে পড়ে ছোট সেই গ্রামে পৌঁছি। শহীদদের আত্মীয়-স্বজন একটি গৃহে একত্রিত হয়েছিলেন। অধম তাদের মুখমণ্ডলে প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে অনুভূতি ভাস্বর দেখতে পাই, তা করাচীতে ক্লিফটন ডিফেন্স ও গুলশান ইকবালের প্রাসাদসম অট্টালিকাসমূহে বসবাসকারীদের মুখমণ্ডলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানকার উপস্থিত সুধীজন (যাদের সিংহভাগ ছিল শুভ্র বস্ত্র পরিহিত ও শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত) নিজেদের কলিজার টুকরাকে সত্যের পথে কুরবানী করে সীমাহীন আনন্দিত ও পুলকিত ছিলেন। তারা নিজেদের অন্যান্য সন্তানদেরকে জিহাদে প্রেরণের সংকল্প রাখেন। সংক্ষিপ্ত এ ঈমানদীপ্ত মজলিসে ভালবাসাপূর্ণ অনেক কথাই আলোচনা হয়। উপস্থিত মুরুব্বীগণ পরম প্রেমিকসুলভ আঙ্গিকে মুজাহিদগণ তাদের গ্রামে আসায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মুজাহিদদের আগমনকে তারা নিজেদের শহীদ সন্তানদের বদৌলতে প্রাপ্ত সৌভাগ্য মনে করেন। এ গ্রামের আরো কয়েকজন তরুণ জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, বিধায় এখানে পৃথক একটি জলসা করার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করেন। মজলিসে উপস্থিত বর্ষিয়ান এক বুযুর্গ আমাদের অনেক আকাবিরের মাহফিলে বসেছেন, তাঁদের অমিয়বাণীর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি সেসব মাহফিলের স্মৃতি আলোচনা করে আজকের মাহফিলকে অবিস্মরণীয় করেন।

পরিশেষে দুআ হল। আমরা সে গ্রাম থেকে সম্মুখে রওয়ানা হলাম। আজকের এ মাহফিল দেখে আমার পূর্বের এ অনুভূতি আরো দৃঢ়তর হয় যে, কাঁচা গৃহ ও দরিদ্র পরিবারসমূহ কুরবানী করার কাজে অধিক অগ্রসর

হচ্ছে। পক্ষান্তরে সুরম্য ভবন ও অট্টালিকায় বসবাসকারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। বরং নীচে রয়েছে।

হায়! অট্টালিকায় বসবাসকারীরা যদি এ ব্যাপারে চিন্তা করত এবং সেসব কাঁচা গৃহসমূহকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখত, যেখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদেরকে ক্রয় করছেন। অট্টালিকা ও প্রাসাদসমূহে যদি শুধু মিউজিক বাজতে থাকে, ফিল্ম চলতে থাকে, সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে এবং ব্যক্তিত্বহীনতা, ভীরুতা ও হীনমন্যতা প্রতিপালিত হতে থাকে, তাহলে এসব অট্টালিকা আর প্রাসাদ কিয়ামতের দিনের মত দুনিয়াতেও লজ্জার কারণ হবে। হায়! নিজের রক্ত পানি করে উপার্জিত টাকা দ্বারা নিজের সন্তানদের জন্য গাফলত সৃষ্টিকারী অট্টালিকা খরিদকারীগণ যদি নিজ সন্তানদের ঈমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেন। শীতল কক্ষে তাদের গায়রত নির্জীব হওয়া থেকে তাদেরকে রক্ষা করতেন। অন্যথায় মহান আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন কারো মুখাপেক্ষী নয়। বিত্তশালীরা গাফেল থাকলে এ দ্বীন দরিদ্রদের মাথার মুকুট হবে। পাকা গৃহ গাফেল থাকলে এ দ্বীন কাঁচা গৃহসমূহে জীবন ধারণ করবে। অতীতেও মদীনার ক্ষুদ্র ও কাঁচা গৃহসমূহ থেকে এ দ্বীনের সুবাস ও অগ্রাভিযান শুরু হয়। ফলে কায়সার ও কিসরার প্রাসাদসমূহ পদানত হয়। '৬৭ ই বি' গ্রামের মুসলমানগণ মুবারকবাদ প্রাপ্তির হকদার। আল্লাহ তাআলা তাদের গ্রামকে চারজন শহীদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ গ্রামকে জিহাদের কেন্দ্র এবং এখানকার প্রত্যেক বাড়ীকে দ্বীনের জন্য কুরবানী দাতা করুন।

এমনিভাবে গতকাল অর্থাৎ ২রা সফর ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ২৭শে এপ্রিল ২০০১ সালে পবিত্র জুমুআবারে আমার তিনজন শহীদের বাড়ী যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। অধম গুজরানওয়ালা জেলার নওশেহরাওয়ারকা নামক স্থানে জুমুআর এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে বয়ান করার জন্য যখন ষ্টেজে পৌছি, তখন শহীদ নবীদ হাসানের মাতার পত্র পাই। পত্রে তিনি তার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে দাওয়াত করেন। জুমুআর পর উলামায়ে কেরামের বৈঠক ছিল। বৈঠক শেষে আমাদের কাফেলা শহীদ নবীদ হাসানের বাড়ী পৌছে। ছোট সেই

গৃহ মুজাহিদদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। দুধ ও মিষ্টি দ্বারা মুজাহিদদের আপ্যায়ন করা হয়। শহীদের শ্রদ্ধেয়া মাতা ও বোনেরা জিহাদের ফাণ্ডে অর্থ দান করেন। তারা নিজেদের পবিত্র আবেগ প্রকাশ করেন।

আমি শুনে অভিভূত হই যে, শহীদ নবীদ (রহঃ) তার মায়ের একমাত্র সন্তান ও তিনবোনের একমাত্র ভাই ছিলেন। কিন্তু সেই মহান মা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তাকে আনন্দচিত্তে রণাঙ্গনে প্রেরণ করেন। আল্লাহু আকবার! কি বিশাল কুরবানী। মা–বাবাই জানেন, একমাত্র সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা কত। কি পরিমাণ আদর সোহাগ করে তার লালন পালন করা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের মহিয়ষী এই নারী পার্থিব পূজার কোন্ হীনমন্যতাকে তার পথের প্রতিবন্ধক হতে দেননি। তিনি নিজের সন্তানের জন্য জান্নাতের হুরদেরকে বউ বানিয়ে তবে ছেড়েছেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু জিহাদে মাল ব্যয় করার ধারাবাহিকতাও অব্যাহত রেখেছেন। এর চেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি নিজের কন্যাদের বিবাহ একমাত্র মুজাহিদদের সঙ্গে দেওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার মনের বাসনা, আপনি তাদের বিবাহ পড়াবেন। আমি শহীদের মহিয়ষী মাতার খেদমতে মহিলা বিষয়ক পত্রিকা 'মাসিক বানাতে আয়েশা' পেশ করি। তার নিকট সকল মুজাহিদের জন্য দুআর দরখাস্ত করি।

মাগরিব নামাযের পর আমাদের কাফেলা আমাদের আরো একজন প্রিয় শহীদ বন্ধু ভাই মুহাম্মাদ সাঈদের গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। মৌলভী মুহাম্মাদ সাঈদ কাহরোওয়াড় পাকাতে বাবুল উলূম মাদরাসায় মেশকাত জামাতের ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন তিনি আমার দেহরক্ষী বাহিনীতেও ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন মুজাহিদদের প্রশিক্ষণও দেন। অর্থাৎ ক্যাম্পের প্রশিক্ষক ছিলেন। তিনি সৎস্বভাবসম্পন্ন, নির্ভীক ও পরহেজগার মুজাহিদ ছিলেন। তার প্রত্যেক কর্ম থেকে পরহেজগারী ফুটে উঠত। অধম কিছুদিনের জন্য তাকে করাচীতে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি। তখন তিনি দীর্ঘ দশমাস সময়ে ভাতা হিসেবে শুধুমাত্র পাঁচশ' টাকা গ্রহণ করেন। ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দানকালে তিনি রণাঙ্গনে

যাওয়ার জন্য নাম দেন এবং কুন্দুজের এক তীব্র লড়াইয়ে শাহাদত মদিরা পান করেন।

অধম তাদের গ্রাম ফকিরাওয়ালী তহসীল ডিসকা পৌঁছে বিরাট এক জমায়েতকে মুজাহিদদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষায় দেখতে পাই। শহীদের ভাইয়েরা সমস্ত মুজাহিদকে আপ্যায়ন করান। শহীদের মা পর্দার আড়াল থেকে আমাকে মুবারকবাদ দেন। তার প্রশান্তিময় ও আনন্দদীপ্ত বাচন শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। কিন্তু যখন তিনি তার আরেক সন্তানকে সারা জীবনের জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করার ঘোষণা করেন, তখন আর আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। বর্তমান যুগে যখন প্রত্যেক মানুষ বেঁচে থাকার বাসনায় প্রাণ বিসর্জন করছে, জাতির নারীরা নিজ সন্তানদেরকে ভীরু ও দুনিয়া পূজারী বানাচ্ছে। এমন দুনিয়া আর এমন পরিবেশেই বসবাসকারী এ নারী তার বিশ বছর বয়সী আলেম সন্তানকে কুরবানী করার পর এখন তার আরেক কলিজার টুকরাকে আল্লাহর সমীপে পেশ করছেন। সত্যিই ইসলাম জীবন্ত রয়েছে এবং জীবন্ত থাকবে। দুনিয়া যেখানেই যাক না কেন, আর মানুষের অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন আল্লাহ তাআলার সত্যিকারের প্রেমিক আর দ্বীন ইসলামের প্রকৃত অনুরাগী সব যুগেই আছে এবং থাকবে। তারা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিবে যে, তোমরা লক্ষ অজুহাত তৈরী কর, লক্ষ আপত্তি উত্থাপন কর, আর লক্ষ সমস্যা ব্যক্ত কর না কেন, ইসলামের উপর আমল করা এ যুগেও সম্ভব, বরং মহা সৌভাগ্যেরও বিষয়। হায়! যে সকল মাতা নিজ সন্তানদেরকে ভীরু ও সাহসহীনরূপে গড়ে তোলে এবং যেসব নারী সম্পদের লালসায় নিজ সন্তানদেরকে কাফেররূপে গড়ে তোলে তারা যদি কাঁচা গৃহে বসবাসকারী শহীদ সাঈদের মাতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত!

অনেক দুআ, শুভ কামনা ও ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে আমরা রাতের অন্ধকারে সে গ্রাম থেকে বাইরে বের হচ্ছিলাম, তখন আমার অন্তর বলছিল যে, গ্রাম এখনও শহর থেকে এগিয়ে আছে। রাত সাড়ে এগারোটায় আমাদের কাফেলা লাহোর পৌঁছে। সেখানে আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধু ভাই শহীদ ফয়যান আহমাদ পামলা (রহঃ)এর গৃহে যাই।

এখানকার আলোচনা ও প্রতিক্রিয়া অন্য কোন আসরে ব্যক্ত করবো ইনশাআল্লাহ। সম্ভবত ততক্ষণে শহীদ পামলা (রহঃ)এর অপর দুই বন্ধু শহীদ হুযায়ফা ও শহীদ আবু তালহা (রহঃ)এর সৌভাগ্যবান পরিবারের সঙ্গেও আমাদের মোলাকাত লাভ হবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্ব

তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে বালাকোট আগমন করেন। এখানে ইসলাম ও জিহাদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। পরিশেষে বহু বছরের প্রাণান্তকর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রস্তুত ঈমানদীপ্ত পুরো কাফেলাকে বালাকোটের পাথরের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কুরবানী করেন। এ ঘটনার পর বাহ্যত ইতিহাসের একটি অধ্যায় সমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটি ছিল নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা। কেননা বাহ্যত শাহাদাত সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হয় মহান এক জীবনের সূচনা। এমন জীবন, যার প্রভাব সুদূর প্রসারিত। বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্নরা দেখে যে, লক্ষ্ণৌর রায়বেরেলী অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশকারী মহান জিহাদী আন্দোলন বালাকোট পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে এমনটি নয়। বরং সে আন্দোলন বালাকোট এসে তার কেন্দ্র খুলে বসে। শাহাদাতের মাধ্যমে এ আন্দোলন নতুন জীবন লাভ করে।

দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা দেখছে যে, বালাকোটে বর্তমানে কোন শিখও নেই, কোন গুরুদুয়ারও নেই। ইংরেজের রাজত্বও নেই, কাফেরদের উপাসনা গৃহও নেই। বালাকোটের শহীদদের খুন এ অঞ্চলকে পবিত্র করেছে। পরিচ্ছন্ন করেছে। ফলে এখান থেকে বড় বড় আলেম, পরহেজগার, নেককার ও মুহাদ্দিস পয়দা হয়েছে। শুধু বালাকোটেই নয়, হাজারাভূমি বরং সমগ্র সীমান্ত প্রদেশ ঈমানী নূরে আলোকিত হয়েছে। যুগের মহান ব্যক্তিত্বগণ এখান থেকে আত্মপ্রকাশ করে জ্ঞানের আকাশের সূর্যরূপে আলোকিত হয়েছেন। যখন যেখানেই জিহাদের কোন আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানেই বালাকোট, হাজারা ও সীমান্তের মুসলমানদেরকে সর্বদা সম্মুখ বাহিনী রূপে দেখা গেছে। বালাকোট শব্দটিই জিহাদের প্রতীক হয়ে গেছে। এ শহরের নাম মুখে উচ্চারিত

হতেই সেখানকার সেই শহীদদের স্মৃতি হৃদয়কে উত্তপ্ত করে, যারা বালাকোট থেকে 'বালাখানায়' পৌঁছেছে। সে জিহাদের স্মৃতি ঈমানকে উজ্জীবিত করে, যার নূর লক্ষ্ণৌ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে বালাকোটের দিগন্তে পূর্ণ দীপ্তি সহকারে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

সে যুগের দৃঢ় সংকল্প মুজাহিদগণের পরিশ্রমের স্মৃতি হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করে। পরিশেষে তারা নৈসর্গিক রূপের লীলাভূমি শীতল ও মনোরম অঞ্চল বালাকোটে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলন বাসনার মাধ্যমে ইহজীবন সমাপ্ত করেন।

বালাকোট এ সমস্ত সম্মান লক্ষ্ণৌ থেকে আগত মুজাহিদদের বদৌলতে লাভ করে। তার সম্মানের ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ বালাকোট যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তের দেশ ও অঞ্চল থেকে আগমন করেন। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এখানে এসে নিজ ছাত্রদেরকে ইলম ও জিহাদের সঙ্গম বুঝিয়ে দেন। মুসলিম উম্মাহর খ্যাতনামা কলামিষ্টগণ বালাকোট সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ ও কাসীদা রচনা করেছেন। আবেগ উদ্দীপক লেখার এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত অবধি তা অব্যাহত থাকবে। সুবহানাল্লাহ! বর্তমান যুগের মুসলমান শাহাদাতকে মৃত্যু মনে করে। অথচ শাহাদত এমন এক জীবন, যার সাক্ষ্য পাথর ও বৃক্ষও প্রদান করে থাকে। বালাকোটকে কে জানত আর কে চিনত? যদি শহীদদের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকত? উঁচু উঁচু পাহাড় ও সবুজ শ্যামল বন পৃথিবীতে আরও রয়েছে। কিন্তু বালাকোটের নামের মধ্যে যে আকর্ষণ, মধুরতা, আত্মমর্যাদা ও জীবন পরিলক্ষিত হয়, তা সবই শাহাদাতের নূর। যা বহু শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর আজও অম্লান রয়েছে। বরং প্রতিনিয়ত সে নূর আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বালাকোটের শহীদগণ মুসলমানদের জন্য একটি সনদের রূপ লাভ করেছে। উপমহাদেশের বিবাদময় পরিবেশেও বালাকোটের শহীদদের মর্যাদাকে কেউ মাটি চাপা দিতে পারেনি। বরং প্রত্যেক ফেরকা তাদের সঙ্গে ভালবাসার দাবী করে থাকে। আর টেনে হেঁচড়ে হলেও তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়।

কেউ ভাবতে পারে যে, বালাকোটের রণক্ষেত্রে শিখদের জয় হয়েছিল। আর ঈমানদার বাহিনী বাহ্যত পরাস্ত হয়েছিল। ঈমানদারদের কাফেলা শিখদের আগ্রাসনের মুখে শেষ লড়াইয়ে ছটফটকারী লাশে পরিণত হয়েছিল। হ্যাঁ, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বরং সাইয়্যিদ সম্রাটের কাফেলা কর্তিত অঙ্গ আর বিক্ষিপ্ত লাশে পরিণত হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সিজদায় লুটে পড়া তাঁর মস্তক কর্তিত হয়েছিল। রবের সম্মুখে অবনত তাঁর ললাট ধুলাচ্ছন্ন হয়েছিল। শিখ বাহিনী আনন্দিত ও পুলকিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বালাকোটে শিখদের নাম নিশানাও অবশিষ্ট নেই। বরং ভুলক্রমে কোন শিখ এখানে এসে পড়লে এখানকার পাথর ও পশুরাও তার উপর ঘৃণা বর্ষণ করবে। পক্ষান্তরে সম্মানিত শহীদদেরকে এখানে পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়। আজও মনে হয় যেন, এ অঞ্চলে সাইয়্যিদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রত্যেকেই তাঁদেরকে ভালবাসে এবং তাঁদের নাম স্মরণ করে নিজেদের অন্তরকে জিহাদী উদ্দীপনায় আলোকিত করে।

হতে পারে বালাকোটের লড়াইয়ের যুগে কেউ বলেছে যে, সায়্যিদ আহমাদ শহীদের কাফেলার পরাজয় ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতগুলো মূল্যবান প্রাণ কিছু লাভ করা ছাড়াই খতম হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কেউই এমন কথা বলার সাহস রাখে না। কেননা সময় প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তাঁদের বালাকোট পর্যন্ত পৌছা, জিহাদের নিয়তে অঞ্চলের পর অঞ্চল অতিক্রম করা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিহাদের দাওয়াত ও জিহাদের আমলের সঙ্গে জড়িত থাকা, জিহাদের খাতিরে রায়বেরেলীর মত আধ্যাত্মিক পরিবেশ পরিত্যাগ করা, মুজাহিদদেরকে গঠন করা, এক আমীরের হাতে মুজাহিদদের বায়াত হওয়া, সেই আমীরের অধীনে কাফেরদের মোকাবেলা করা এবং পরিশেষে বালাকোট পৌছে শহীদ হওয়া এ সবই তাঁদের বিশাল সফলতা। তাঁদের এসব সফলতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজও উপলব্ধি করা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথে বের হওয়া ও মস্তক কর্তিত করা এটিই বিরাট সফলতা। বাহ্যিকভাবে বিজয় হোক চাই পরাজয়। নিজের মনকে

জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, নিজের জান ও মাল আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়া, তারপর শাহাদাত লাভ করা, এটাই সুস্পষ্ট সফলতা। নিঃসন্দেহে এটি সুস্পষ্ট বুঝে আসার এবং হৃদয়ে প্রশান্তি দানকারী সফলতা। বালাকোটের শহীদগণ এ সফলতা লাভ করেছেন। আজ সমগ্র বালাকোট, হাজারা, সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান তাঁদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছে। এসব অঞ্চল তাঁদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। কারণ, তাঁদের পবিত্র খুনের বদৌলতে এসব অঞ্চল ঈমান, জিহাদ ও গায়রতের অবিস্মরণীয় শিক্ষা লাভ করেছে। এসব অঞ্চলের মর্যাদা তাঁদের উসীলায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু আজ সে লক্ষ্ণৌর কি অবস্থা? সেই লক্ষ্ণৌ, যার রায়বেরেলী নামের ছোট একটি অঞ্চল থেকে হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) প্রথমে আমীরুল মুজাহিদীন তারপর আমীরুল মুমিনীনরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং দেখতে দেখতে তিনি জিহাদের গগনে সূর্যের মত চমকাতে থাকেন। তাঁর চতুর্পাশে ওলীউল্লাহ খানদানের সুদর্শন ও আলোকউজ্জল নক্ষত্রসমূহের সমাবেশ ঘটে। তারপর সেই কঠিনপ্রাণ কাফেলা অস্তিত্ব লাভ করে, যে কাফেলার অগ্রাভিযান আজও জীবন্ত রয়েছে। যে লক্ষ্ণৌ থেকে জিহাদের এ সূর্য উদিত হয়েছিল, সেই লক্ষ্ণৌ ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এমন একসময় ছিল, যখন সেখান থেকে মুজাহিদগণের অস্তিত্ব লাভ হয়। কিন্তু বর্তমানে সেখান থেকে জিহাদকে বহিস্কার করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)এর খান্দান লক্ষ্ণৌর উপর আচ্ছন্ন ভয়ংকর ও মারাত্মক এ অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন ও প্রতিহত করতে থাকেন। কিন্তু অন্ধকার ছিল গভীর। উপরন্তু ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে জুমুআর দিনে আশার শেষ কিরণটুকুও নিভে যায়, যখন জিহাদী এ বংশের শেষ মুজাহিদ ইহধাম ত্যাগ করেন। অর্থাৎ হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)এর মতাদর্শের নির্ভীক, দুঃসাহসী ও অকুতোভয় ভাষ্যকার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি অব্যাহত অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়তেছিলেন। তাঁকে হারিয়ে লক্ষ্ণৌর ঈমানের আসর অশ্রু বিসর্জন করছে। শিশু সন্তানের মত ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)এর অবর্তমানে লক্ষ্ণৌর উপর কি ঘটেছে? সে উপাখ্যান বড় বেদনাবিধূর ও দীর্ঘ। সুধী পাঠক! শুধুমাত্র নিকট অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে হৃদয় থেকে রক্তাশ্রু ঝরে। লক্ষ্ণৌর ফয়যাবাদে প্রতিষ্ঠিত বাবরী মসজিদকে শহীদ করে দেওয়া হয়। সেই মুজাহিদের জন্মভূমিতে এ জুলুম সংঘটিত হয়, যিনি রায়বেরেলী থেকে আরম্ভ করে কান্দাহার পর্যন্ত এবং কান্দাহার থেকে আরম্ভ করে বালাকোট পর্যন্ত মসজিদসমূহকে আবাদ করেছিলেন। সেই স্বাধীনচেতা মহামানবের জন্মভূমির এ মসজিদকে মুসলিম উম্মাহর গাফলতির সুযোগে শহীদ করা হয়, তার বুকের উপর মন্দির নির্মাণ করা হয়।

সমগ্র লক্ষ্ণৌ কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের এবং বিজেপির ঘাঁটি। কিছুদিন পূর্বে লক্ষ্ণৌর খ্যাতনামা বিদ্যানিকেতন নদওয়াতুল উলামার মর্যাদাকে তারা পদদলিত করার অপচেষ্টা চালায়। এমতাবস্থায় লক্ষ্ণৌ তার রবের দরবারে স্বীয় বেদনার কথা পেশ করে। লক্ষ্ণৌ ভূমি বালাকোট ভূমির নিকট অভিযোগ করে যে, এমন এক সময় ছিল, যখন আমার কোল থেকে আত্মপ্রকাশকারী সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বিশ্বমানবতাকে জিহাদের বিস্মৃত সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। আজ আমার নিজের জন্য মুজাহিদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখানে জিহাদের নাম নেওয়া অপরাধ। এখানে কেউই জিহাদের কথা মুখে আনে না। আমার বুক থেকে বাবরী মসজিদকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমার গলির মধ্যে ইলমে দ্বীনের মর্যাদা ও পবিত্রতাকে নিস্পেষিত করা হয়েছে। এখন আমার কি অবস্থা হবে। আমি তো আমার সর্বস্ব বালাকোট পাঠিয়েছিলাম। বালাকোট কি আমার দয়ার বদলা দিবে না?

লক্ষ্ণৌর এ অভিযোগ শুনে বালাকোটের ঈমানী মাদরাসায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মুজাহিদগণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা বালাকোটের শহীদদের অনুকম্পার বদলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একসময় ছিল, যখন বালাকোটের ভূমিতে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) ও তাঁর বন্ধুদের লাশ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত আকারে পড়েছিল। এবার সময় এসেছে, বালাকোট থেকে আত্মপ্রকাশকারী জাইশে মুহাম্মাদের তিন বাহাদুরের লাশ লক্ষ্ণৌর মাটিতে রক্তাক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তরূপে পড়ে আছে।

হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)এর মত এ তিনজনও নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বে শহীদ হন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্ণৌতে পৌঁছা এবং রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জান কুরবান করা এমন মহান কীর্তি, যা ইনশাআল্লাহ লক্ষ্ণৌকে বালাকোটে পরিণত করবে। আমাদের প্রিয় ও নির্ভীক ভাই হুযাইফা। আমরা তোমাদের শোকর আদায় করছি। তোমরা মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা করেছ। সমস্ত জাতিকে লজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছ। প্রিয় তালহা! প্রিয় পামলা! আমরা তোমাদেরও শুকরিয়া আদায় করছি। তোমরা নিজেদের খুন দ্বারা বালাকোটের শহীদদের মিশনকে তাঁদেরই ভূমিতে পৌঁছে দিয়েছ। হে লক্ষ্ণৌ! সাক্ষী থেকো। আমরা তোমাদের দয়া পরিশোধ করার প্রথম কিস্তি আদায় করেছি। কাল তোমার পক্ষ থেকে আগত শহীদগণ আমার ভূমিকে পবিত্র করেছিল। আজ আমার থেকে প্রেরিত শহীদগণ তোমার ভূমিকে পবিত্র করার জন্য জান কুরবানী করেছে।

হে আল্লাহ! এ কুরবানীকে কবুল করুন। আমাদের পক্ষ থেকে আদায়কৃত প্রথম কিস্তিকে লক্ষ্ণৌ ভূমিতে বিরাট আকারের ঈমানী বিপ্লবের মাধ্যম বানিয়ে দিন। নিঃসন্দেহে আপনিই বালাকোটের শহীদদের বরকতে বালাকোটকে পবিত্র করেছেন। এবার আপনিই লক্ষ্ণৌর শহীদদের বরকতে বাবরী মসজিদ ফিরিয়ে দিন। শুধু লক্ষ্ণৌ নয়, বরং সমগ্র উপমহাদেশকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমাদের নিকট যে মূল্যবান পুঁজি ছিল, তা আমরা আপনার দেওয়া তাওফীকে কুরবানী করেছি। আমাদের হুজায়ফা একটি দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য রত্ন ছিল। আবু তালহা ও পামলাও তোমার খাঁটি প্রেমিক ছিল।

হে আল্লাহ! আপনি তো মূলায়ন করেন। আপনি যেভাবে বালাকোটের শহীদদের মূলায়ন করেছেন এবং তাঁদের বাহ্যিক লক্ষ্যের চেয়ে অধিক ফল তাঁদেরকে দান করেছেন, তেমনিভাবে আপনি লক্ষ্ণৌর শহীদদেরকেও মূল্যায়ন করুন। এ অঞ্চলকে মুশরিকদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে পাক করুন।

জাইশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তিনজন বাহাদুরের লক্ষ্ণৌতে শহীদ হওয়ায় অবশ্যই বিষাদগ্রস্ত। কিন্তু সে এজন্য

পরিতৃপ্ত যে, সে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)এর ভূমি এবং বাবরী মসজিদকে বিস্মৃত হয়নি। এজন্য আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর ফয়েয

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ) সেসব মহামনীষীদের অন্যতম, যাঁদের আলোচনা মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। অনেক রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে। দুনিয়া পূঁজার হৈ-হুল্লোড়ের এ যুগে এ মহান সাহাবীর আলোচনা সেসব হাকীকতের পর্দা উন্মোচন করে, যেগুলো বর্তমানে জাহালাত ও গাফলতের তলে চাপা পড়ে আছে।

তাঁর নাম আমের বিন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। তিনি মক্কী এবং কুরাইশী ছিলেন। দীর্ঘদেহী ও শীর্ণ গঠনের ছিলেন। তাঁর সেই শীর্ণ দেহে বীরত্ব ও সাহসীকতার বিদ্যুত এবং আমানতের নূর পরিপূর্ণ ছিল। আজ সবাই নিজেকে 'প্রথম' বলে দাবী করতে ব্যস্ত। কিন্তু হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) সেসব লোকের অন্যতম, যাঁদেরকে পবিত্র কুরআন 'আসসাবিকুনাল আউয়ালুন' (অগ্রগামী প্রথম দল)এর মধ্যে গণ্য করে এমন এক সারিতে দাঁড় করেছে, যাঁরা কেয়ামত পর্যন্ত সত্যের মাপকাঠি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণে অগ্রগামী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে প্রথম এ শ্রেণীর পিছে দাঁড়াবে, সে সীরাতে মুস্তাকিমের উপর অবিচল থাকবে। যে হতভাগা এ সারি থেকে পৃথক থাকবে কিংবা সারির পুরোধাদের সমালোচনা করবে, সে সীরাতে মুস্তাকিমের ধারেও পৌঁছতে পারবে না।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী সাহাবী ছিলেন। তাঁর চেহারা নূরানী ও আকর্ষণীয় ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাঁর চেহারার আকর্ষণ সৌন্দর্যের স্বাভাবিক নিয়মের কারণে ছিল না, বরং স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী সম্মুখের দুই দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তাঁর চেহারায় রূপ সৌন্দর্যের ঝলক উছলে পড়ত। উহুদ যুদ্ধের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জিহাদের ফরয আদায়কালে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে আহত হন। হায়! মুসলিম

উম্মাহ যদি এ দৃশ্য স্মরণ রাখত, তাহলে জিহাদের বিপক্ষে কোন কুমন্ত্রণা তাদের অন্তরে স্থান পেত না। তথাকথিত নিরাপত্তার খাতিরে কাফেরদের দাসত্ব স্বীকারকারীরা যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহত হওয়ার কথা স্মরণ করত, তাহলে তারা জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ত। যুদ্ধের ময়দানে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ সামরিক পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। তাঁর পবিত্র মস্তকে লৌহ শিরোস্ত্রাণ শোভা পাচ্ছিল। দুশমনের তরবারীর তীব্র আঘাতে তারই লোহার টুকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারায় ঢুকে যায়। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে লোহার টুকরাগুলো টেনে বের করেন। ফলে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য লাভ করেন যে, তাঁর মূল্যবান দাঁত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কুরবান হয়। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে 'আমীনুল উম্মাহ' উপাধি লাভ করেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত) থাকে। এ উম্মাতের আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।' শুধু তাই নয়, রাসূলের মুখে তিনি এমন নিস্কলঙ্কতার সনদ লাভ করেন, যার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের ঈর্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আবু উবায়দা ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু অভ্যাস সম্পর্কে আমি আপত্তি করতে পারি।" আল্লাহু আকবার! কত বড় সনদ! যেন হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) স্বীয় আখলাক, চরিত্র, অভ্যাস ও কর্মপন্থাকে শরীয়তের ছাঁচে এমনভাবে গড়েছিলেন যে, তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজ থেকে শরীয়তের বিধান ঝরে পড়ত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে উত্তমভাবে খাপ খেয়েছিলেন। এসব গুণাবলীর কারণে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র এবং

সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বস্ত ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে খেলাফতের দায়িত্বের জন্য যাঁদের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছিল, তাঁদের মধ্যে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) ছিলেন শীর্ষ তালিকায়। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) ইরশাদ করেন, 'যদি আবু উবায়দা বেঁচে থাকত, তাহলে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করতাম।'

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর ব্যক্তিত্বে আরো অনেক গুণাবলীই সন্নিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তিনি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বড় বড় সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নেতৃত্বে কয়েকবার সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। ইতিহাসের সাধারণ ছাত্রও 'সারিয়ায়ে আম্বার' সম্পর্কে অবহিত আছেন। সেখানে মুজাহিদদের মেহমানদারীর জন্য সাগর বিরাট একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করে। সে মাছের অংশ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ভক্ষণ করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে যুদ্ধের কমাণ্ড দিয়েছিলেন বীরত্ব, আমানতদারী ও বিনয়ের মূর্তপ্রতীক হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ)কে।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পুরুষদের মধ্যে আপনার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুসারে আবু উবায়দা (রাযিঃ) এক্ষেত্রে কখনও দ্বিতীয় এবং কখনও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আল্লাহু আকবার! যে তালিকার কোটিতম স্থান লাভ করাও মহাসৌভাগ্য, তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান লাভ করা কত বড় মর্যাদার ব্যাপার। এত সব মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহজগত থেকে বিদায় নেওয়ার পরও জিহাদের ময়দানের দিকেই তিনি ধাবিত থাকেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এবং হযরত উমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহ তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁর খেলাফতকালে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ)এর স্থলে তাঁকে মুসলমানদের প্রধান

সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ঔপন্যাসিকদের রঙ্গিন কল্পনা নয়, বরং বাস্তবিকই তিনি উৎকৃষ্টতম সামরিক যোগ্যতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি জিহাদের ময়দানে অধিকতর শক্তিশালী দুশমনকে নিস্পেষিত করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের লোকদেরকে জিহাদের দাওয়াত ও সাথীদেরকে আত্মশুদ্ধির দাওয়াত দেওয়া নিজের দায়িত্ব মনে করতেন।

সিরিয়ার লড়াই চলাকালে একবার তিনি মারাত্মকভাবে শত্রুর অবরোধে আটকা পড়েন। শত্রুপক্ষ সাময়িকভাবে বিজয়ী হওয়ার উপক্রম হয়। তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি এরশাদ করেন—'ঈমানদারদের সম্মুখে যখনই কোন জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয়, আল্লাহ তাআলা পরবর্তীতে তাদের কাজ সহজ করে দেন। প্রত্যেক প্রতিকূল পরিস্থিতির পর দুবার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।'

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) চিঠির উত্তরে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি লিখে পাঠান—

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ

"দুনিয়ার জীবন আখেরাতের মুকাবেলায় ক্রিয়া কৌতুকের অধিক নয়।"

বাহ্যত আয়াতটি পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল মনে হয় না। কিন্তু হযরত উমর (রাযিঃ) কথার মর্ম উদ্ধারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পত্রের উত্তর তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি লোকদেরকে একত্রিত করেন। তারপর মিম্বরে উপবেশন করে উপস্থিত লোকদেরকে উত্তরপত্র শুনিয়ে ইরশাদ করেন—

'দেখ! আবু উবাইদা (রাযিঃ) তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তাই তোমরা সবাই জিহাদের দিকে ধাবিত হও।'

নিঃসন্দেহে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের বিশ্বাস মানুষকে জিহাদের ময়দানের দিকে ধাবিত করে। যেখানে তার জন্য চিরস্থায়ী ও অমর জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) সিরিয়ার সফরকালে তাঁর উপায়-উপকরণহীন গৃহ দেখে

বেদনাতিশয্যে কেঁদে ফেলেন। তাঁর ঘরে জিহাদের সামানা ছাড়া কিছুই ছিল না।

হযরত উমর (রাযিঃ) উচ্ছসিত হয়ে ইরশাদ করেন—'হে আবু উবাইদা! দুনিয়ার মোহ সবার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু তোমার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।'

এটি ছিল আমীরুল মুমিনীনের বিনয়। অন্যথা অভিশপ্ত দুনিয়া তাঁর নাম শুনলেও পলায়ন করত।

১৮ হিজরীতে যখন হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর বয়স ৫৮ বছর। তখন ৩৬,০০০ সৈন্য বিশিষ্ট বিরাট এক মুসলিম সেনাবাহিনী শাম দেশে যুদ্ধরত ছিল। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) ছিলেন এর সেনাপতি। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে মারাত্মক প্লেগ রোগ মহামারী আকারে সে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর শীতল প্রতিচ্ছবি বড় বড় বাহাদুরকেও ভীত সন্ত্রস্ত করে, কিন্তু আবু উবাইদা (রাযিঃ) মহামারী দেখে পরম খুশী ও চরম আনন্দিত ছিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) চিন্তা করলেন যে, মুসলিম উম্মাহর আবু উবাইদাকে বড় প্রয়োজন, তাই তিনি আবু উবাইদা (রাযিঃ)কে মহামারী আক্রান্ত অঞ্চল হতে সরিয়ে আনার জন্য তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান। তিনি হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর নামে এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠান—

'আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কাজ রয়েছে, অনতিবিলম্বে আপনি মদীনায় চলে আসুন।'

চিঠি পড়ে আবু উবাইদা (রাযিঃ) ইরশাদ করেন, 'আমি আমীরুল মুমিনীনের জরুরী কাজ কি তা বুঝতে পেরেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাঁচাতে চাচ্ছেন, যে আর এখানে থাকবে না।'

তারপর তিনি ওমর (রাযিঃ)এর নিকট পত্রে লেখেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে আপনার এ আদেশ পালন করা হতে মুক্তি দিন। আমি মুসলমানদের লশকরের মধ্যে অবস্থান করছি, আমি নিজেকে তাদের উপর প্রাধান্য দেই না।'

চিঠি পড়ে হযরত উমর (রাযিঃ) কেঁদে ফেলেন। তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে, মুসলিম উম্মাহর মহামূল্যবান এ ধন তিনি হারাবেন। হযরত

আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর হাতের আঙ্গুলে প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। তিনি সে ফোঁড়াকে ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ, এ ফোঁড়া তাঁকে তাঁর প্রকৃত প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন ঘটাতে এসেছে। এমন এক ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছেন এবং মৃত্যুকে স্বাগত জানাচ্ছেন, সমস্ত মুসলমান যাঁর জীবনের প্রয়োজন উপলব্ধি করছে। কি ছিল এর রহস্য? নিশ্চয় এটি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতের বরকত ছিল যে, তাঁর নিকট বেঁচে থাকার আবেদনের চেয়ে মৃত্যুর প্রেম ছিল প্রবল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, বরং প্রকৃত জীবনের সূচনা।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর এ চেতনা ও আদর্শ আজ মুসলিম উম্মাহর জন্য বড় প্রয়োজন। হায়! মুসলমানরা যদি মৃত্যুকে ভালবাসার ও মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরী থাকত। ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়াতে জীবনের পথ তালাশ করা এবং বেঁচে থাকার জন্য ঈমান বিক্রি করা মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট। আর পৃথিবীতে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে তাকে সন্ধান করা জীবনের চেয়ে অধিক মধুময়। আবু উবাইদা (রাযিঃ) দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও শামদেশে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কেন বসেছিলেন? নিশ্চয় তিনি সন্দেহাতীতভাবে জানতেন যে, আল্লাহর পথের এ মৃত্যু নামে মৃত্যু হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অমর জীবন।

কিছুদিন পূর্বে অধিকৃত কাশ্মীরে জিহাদরত কয়েকজন মুজাহিদের সঙ্গে অধমের যোগাযোগ করার সৌভাগ্য হয়। আমি তাদের একজনকে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসতে বলি। আমার কথা শুনে সে বিচলিত হয়ে পড়ে। আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে আমাকে এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করতে বলে। অথচ বাহ্যত অধিকৃত কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা ছিল মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ফিরে আসা, কিন্তু সে মুজাহিদ সেখান থেকে ফিরে আসাকে জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে ফিরে আসা মনে করছিল, তখন আমার হৃদয় থেকে প্রতিধ্বনিত হল—

'হে আবু উবাইদা! আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার ফয়েয আজও জীবন্ত রয়েছে।'

উর্দী নাকি শেরওয়ানী

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পাকিস্তানের শীর্ষ ব্যবস্থাপককে আলোচনার আহ্বান জানানো তাদের তিনটি পরাজয়ের স্বীকৃতি ও একটি নতুন চালের সূত্রপাত। প্রথমে মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়ত্রয়ের প্রতি একবার দৃষ্টি দিচ্ছি। ভারত ঘোষণা করেছিল যে, পাকিস্তান কাশ্মীরীদের সহযোগিতা করা বন্ধ না করলে, কাশ্মীরের আন্দোলনসমূহকে প্রতিরোধ না করলে এবং পাকিস্তানে বিদ্যমান সামরিক তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। এখন শর্ত তিনটির কোনটার বাস্তবায়ন ছাড়াই যেহেতু আলোচনার প্রশ্ন উঠেছে, ফলে বিশ্ব রাজনীতির শিরা নিরীক্ষণকারীগণ একে ভারতের প্রথম পরাজয় আখ্যা দিচ্ছেন। এটি তাদের মোটের উপর প্রথম পরাজয় নয়, বরং বর্তমানের তাজা বিষয়ের প্রথম পরাজয়। অন্যথা ভারতের চেহারা পরাজয়ের কালিমা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে এবং তার অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।

এ ব্যাপারে ভারতের দ্বিতীয় ও সর্বাধিক শিক্ষণীয় পরাজয় এভাবে হয়েছে যে, সে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতির ঢাক পিটেছিল। ভারতের ধারণা ছিল, বিশ্বের ঠিকাদার দেশসমূহ এজন্য তাকে প্রাণ খুলে বাহ্বা দিবে। মুক্তহস্তে সহযোগিতা করবে। আর পাকিস্তানের মাথায় জুতা মারবে। এভাবে বাহবাও পাওয়া যাবে আবার পাকিস্তানও পায়ে পড়তে বাধ্য হবে। ভারতের এ নাটকও বিফল হয়েছে। ঠিকাদাররা অল্প বিস্তর বাহবা তো দিয়েছে, কিন্তু এর বেশী আর কিছু করেনি। করবেই বা কেন? ভারতের সুধারণা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তারা তো এশিয়ারই অধিবাসী। তাদের চামড়া তো শ্বেত নয়। কাশ্মীরে কি কোন তেলের খনি বের হয়েছে যে, বিশ্ব ঠিকাদারেরা ভারতের ডাকে সেনাবাহিনী নিয়ে চলে আসবে? যা হোক ভারত আচ্ছামত লাঞ্ছিত হয়েছে। ছয় মাসের যুদ্ধবিরতি তাদের পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করছে। উপরন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে তথাকথিত যুদ্ধবিরতির সমাপ্তি ঘটিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিতে হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভারতের তৃতীয় পরাজয় এই হয়েছে যে, সে কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে ফুসলানোর, উস্কানোর ও লক্ষ্য থেকে হঠানোর চেষ্টা করেছিল। চাংকিয়ার দক্ষ রাজনীতিকরা বড় একটি জাল তৈরী করেছিল। সে জাল কাশ্মীরীদের উপর নিক্ষেপ করে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় যে, আস! আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমাদের পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করি। কাশ্মীরে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করি। উন্নয়নের কাজ বৃদ্ধি করি। আমরা সবাই যেহেতু ভারতীয়-দিল্লী ও ভারতে এবং শ্রীনগরও ভারতে, তাই আমাদের নিজেদের আলোচনায় পাকিস্তানকে শামিল করব না। এ জালটি ছিল বড় মারাত্মক। প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, খুন-খারাবি, লুট-ছিনতাই ও নিরাপত্তাহীনতায় অতিষ্ঠ কাশ্মীরী জাতি এ আলোচনার স্বাদকে গনীমত মনে করে দৌড়ে গিয়ে আলিঙ্গন করবে। জাতির ক্লান্ত নেতারা দিল্লীর শীর্ষ সরকারের সঙ্গে আলোচনাকে নেয়ামত মনে করবে। তারপর আলোচনার টেবিলে কাশ্মীরীদেরকে অস্ত্র ত্যাগে রাজী করানো হবে। পদ ও টাকার বর্ষণে কিছু কিছু নেতা ও দলের পথ পঙ্কিল করা হবে। এভাবে কাশ্মীরের উপর ভারতের কর্তৃত্ব দৃঢ় হবে। আর পাকিস্তান হা করে তাকিয়ে থাকবে।

কাশ্মীরী জাতিকে ধন্যবাদ। তারা সংকল্পের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, আশি হাজার লোককে কুরবানী করা সত্ত্বেও কাশ্মীরের মুসলমানরা ক্লান্ত নয়। হাজার হাজার গৃহ জ্বালানো সত্ত্বেও তারা এখনও মাথা নত করেনি। সমস্ত স্বাধীনতাকামী সংগঠন কনফারেন্সে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ ছাড়া আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছে। ফলে ভারতের জাল ছিঁড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। শিবির আহমাদ শাহ এ জালে পা দেওয়ায় লাঞ্ছনা ও নিঃসঙ্গতা ছাড়া সে আর কিছুই লাভ করেনি। কাশ্মীরীদের আইনানুগ অবস্থান এক বৎসরের ভিতরেই ভারতকে তৃতীয় পরাজয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তাই আজ ভারত কতক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে পাকিস্তানকে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। আলোচনার এ প্রস্তাব মোটেও নিষ্ঠাপূর্ণ নয়। বরং ভারত পরাজয়, অপারগতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতিতে বিধ্বস্ত হয়ে নতুন চাল চালতে বাধ্য হয়েছে। কি সেই চাল! সুধী পাঠক! আসুন

সে বিষয়েও আমরা একটু দৃষ্টি দিচ্ছি।

একথা একশো ভাগ নিশ্চিত যে, পাকিস্তানের প্রধান ব্যবস্থাপক ভারতের এ দাওয়াত গ্রহণ করবে (অথচ নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়)। প্রস্তাবিত এ আলোচনা শুরু হলে ভারত প্রথমে পারস্পরিক আস্থা পোষণের পরিবেশ সৃষ্টি করার মত কথা আরম্ভ করবে। এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণে পাকিস্তানকে বাধ্য করবে। পাকিস্তান যদি বিশ্বস্ততার পরিবেশ বহাল করার এবং এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে ভারত তার চালে সফল হবে। ফলে পাকিস্তানে এক ধরনের নৈরাজ্য শুরু হবে। কিন্তু আমাদের সরকার যদি দৃঢ়তার পরিচয় দেয় এবং পরিস্কার ভাষায় ভারতকে বলে দেয় যে, কাশ্মীর স্বাধীন হওয়ার পূর্বে বিশ্বস্ততার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। তাই প্রথমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা হোক। অন্য বিষয়ে পরে আলোচনা হবে। তাহলে পাকিস্তান এমন এক বিজয় লাভ করবে, জাতি যার জন্য ৫৫ বছর ধরে প্রতীক্ষা করছে।

সারকথা এই যে, জেনারেল মোশাররফ যদি তার উর্দীর মান রক্ষা করে কথা বলেন, তাহলে মুসলমানদের বিজয় হবে। আর আল্লাহ না করুন মোশাররফ সাহেব যদি শেরওয়ানী পরে মধুর বচন আওড়ান তাহলে অটল বিহারীর পাতা কৌশল কামিয়াব হবে। অতীতে আমাদের শাসকরা নিজের জাতির সঙ্গে বীববিক্রমে আর দুশমনের সঙ্গে কোমল স্বরে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন।

হায়! মোশাররফ সাহেব যদি নিকৃষ্ট এ ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে দিতেন। তিনি যদি আলোচনা চলাকালে বাজপেয়ীর বিশ্বস্ততামূলক কথায় কান না দিয়ে ধুতীর অভ্যন্তরে তার কম্পিত পায়ের দিকে দৃষ্টি দিতেন। আর প্রত্যেক কথার উত্তর খাকী উর্দী পরিহিত বীরের মত দিতেন, তাহলে কোটি কোটি মুসলমানের দুআ তার সঙ্গী হত।

ইসলামী সাংবাদিকতার বিকাশ
একটি কঠিন পরীক্ষা

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সাংবাদিকতার অঙ্গনে ধর্মহীন গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ইহুদী প্রোটোকলের গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক ইহুদীদের গোমস্তরা সাংবাদিকতার উপর নিজেদের থাবা বসানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছে। এ কাজে তারা কোন প্রকারের বাধার সম্মুখীন হয়নি। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, নভেল, উপন্যাস, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেট সর্বত্র আপনি ইহুদীবাদের বিষ সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন। বিধায় একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান যুগের মিডিয়া এবং বর্তমান যুগের সাংবাদিকতা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর উদ্যোগ।

উপরন্তু চরম জুলুমের কথা এই যে, সাংবাদিকতার অঙ্গনকে এমন মারাত্মকভাবে পঙ্কিল করা হয়েছে যে, আদর্শবান কোন মুসলমান কোনভাবে এ অঙ্গনে পৌঁছলে তাকেও নোংরামী ও পঙ্কিকলতার সংরক্ষক ও ব্যবসায়ী হতে হয়। এজন্য আপনি সেসব পত্র–পত্রিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, যেগুলোর পৃষ্ঠপোষক কিছু কিছু ধর্মীয় দল। যার পরিচালক আমলারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী মুসলমান মনে করে। সেসব পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের বর্তমানে যে দুরাবস্থা চলছে, তা কারো কাছে গোপন নয়। সূদের বিজ্ঞপ্তি থেকে আরম্ভ করে বিউটি পার্লারের প্রদর্শন পর্যন্ত সবই আপনি সেসব পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে দেখতে পাবেন। এতটুকু মাত্র পার্থক্য যে, এসব পত্র–পত্রিকায় কিছু ধর্মীয় প্রবন্ধ ছাপানো হয় বা কিছু ধর্মীয় নেতার ফটো ছাপানো হয়। অথবা কিছু জিহাদী দলের পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। এ ধরনের তথাকথিত কিছু নেককাজ ছাড়া এসব পত্রিকার অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে কোনই পার্থক্য নেই। এমনকি সাংবাদিকতার ব্যবসায় উন্নতির জন্য এসব পত্রিকায় কুফরী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত ছাপানো হয়।

যেমন জাদুটোনা ও জ্যোতিষীদের বিজ্ঞপ্তিসমূহ। যেগুলোতে অনেক সময় নিরেট কুফরী দাবীও করা হয়। কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে যে কোন পত্রিকায় এগুলো ছাপানো সম্ভব। সত্য কথা এই যে, দ্বীনদার কিছু

সাংবাদিক বন্ধুদের নিকট আমাদের এতটুকু প্রত্যাশা অবশ্যই ছিল যে, তারা নিজেদের সাংবাদিকতাকে নিরেট ব্যবসায় পরিণত করবেন না। আর ন্যূনতম পক্ষে তারা ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করবেন না। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের এসব প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হয়েছে। কারণ সাংবাদিকতার প্রচলিত অঙ্গনকে এমনভাবে নাপাক করা হয়েছে যে, সেখানে পৌঁছে প্রত্যেকে নিজেকে ইহুদীদের সামনে মস্তক অবনত করতে বাধ্য মনে করে। বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঘৃণার্হ পাপের প্রসার ঘটানো এবং সব ধরনের অন্যায় অপকর্ম এখন সাংবাদিকতার জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ব্যক্তি যত বেশী মিথ্যুক, প্রতারক, ধোকাবাজ ও বিশ্বাসঘাতক, সে তত বেশী এ ময়দানে সফলতা লাভ করছে। পত্রিকার মালিক ভাল হোক চাই মন্দ হোক, তাকে সাংবাদিকতার মাফিয়া চক্রের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসতে হয় এবং এমন লোকদের সেবা গ্রহণ করতে হয়, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়ও নেই, আখেরাতের ভয়ও নেই।

এমন পরিস্থিতিতে যেসব ধর্মীয় পত্রিকা সাংবাদিকতার প্রচলিত নীতিমালা থেকে সরে এসে শরীয়ত মোতাবেক চলত এবং প্রকাশিত হত, সাংবাদিকতার জগতে সেগুলো গৃহীত হওয়ার কোন পথই বিদ্যমান ছিল না। শত্রুদের শত্রুতা আর নিজের লোকদের অবহেলা এসব পত্রিকার প্রভাব বলয় নিতান্ত সীমিত করে দিয়েছিল। বেশীর ভাগ পত্রিকা নিজের খরচও উসুল করতে পারেনি। ফলে তা অভাব অনটনের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যেসব পত্রিকার পশ্চাতে কিছু সংগঠন বা বড় মাদরাসা কার্যকর ছিল, সেগুলো কষ্টেসৃষ্টে বের হলেও অধিকাংশ পাঠকের খায়েশ হল, পকেট থেকে যেন পত্রিকা বাবদ এক টাকাও বের করতে না হয়। বরং আমরা যেন সৌজন্য সংখ্যারূপে পত্রিকা পেয়ে যাই। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, কিছু খাঁটি ধর্মীয় ও মানসম্পন্ন পত্রিকা যখন প্রচলিত কিছু পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিষদের নিকট পত্রিকা বিনিময়ের আবেদন সহ প্রেরণ করা হয়, তখন নিতান্ত অবজ্ঞাভরে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। আরও দেখতে পেয়েছি যে, কিছু দ্বীনী পত্রিকা বেশ সংখ্যক ছাপানো হত। কিন্তু তা মূল্যের বিনিময়ে তো দূরের

কথা বিনা মূল্যেও বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ছাপানো পত্রিকার বাণ্ডিল বস্তাবন্দী হয়ে উইপোকার প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে।

ধর্মীয় সাংবাদিকতার অবমূল্যায়নের এ যুগে অন্তরে ধর্মের জন্য বেদনা ধারণকারী মুসলমানরা উলামায়ে কেরাম এবং মুজাহিদদের নিকট সাংবাদিকতার ময়দানকে ফাঁকা ছেড়ে না দিয়ে অতিসত্বর এ ময়দানে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার দাবী করতে থাকে। যেন এখানেও ইহুদীবাদের পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী মিডিয়ার বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করা যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক কাজের একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারিত রয়েছে। বিধায় এ জাতীয় কল্যাণকর পরামর্শের উপর খুব বেশী আমল করা সম্ভব হয়নি। তবে নিষ্ঠাবান উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদগণ শরীয়তের সীমারেখার উপর দৃঢ়পদ থেকে এ অঙ্গনে কাজ করতে থাকেন। এমন সময় আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর উপর বিশেষভাবে মেহেরবানী করেন। তিনি তালেবানরূপে এক মহান নেয়ামত মুসলমানদেরকে দান করেন। এ নেয়ামত মূলত ষোল লক্ষ শহীদের খুনের ফল। মূল্যায়নকারী রব তা মুসলমানদেরকে দান করেছেন। এ নেয়ামতের নেপথ্যে আরও বহু নেয়ামত লুকিয়েছিল। ফলে যতই দিন অতিবাহিত হয় এবং তালেবান নিজের মনোনীত হওয়াকে যথাযথভাবে কাজে লাগায়, তখন সেসব নেয়ামত আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে।

এসব নেয়ামতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত ইমারতে ইসলামিয়া, আফগানিস্তানরূপে খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। সেই খেলাফত, বহু শতাব্দী ধরে মুসলমানরা যার প্রতীক্ষায় ছিল। আর অনেক মুসলমান এ নামের উপর আমল না করে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছিল। খেলাফত যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন সঙ্গে সে অনেক বরকত নিয়ে এল। মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় আসল ও খাঁটি মুসলমান জন্ম নিতে আরম্ভ করল। জিহাদী আন্দোলনসমূহ এক নতুন আবেগ ও সাহস লাভ করল। কাফেরদের বড় বড় পরিকল্পনা ধুলায় মিশে যেতে থাকল। ১৪০০ বছরের পুরাতন বসন্তের দোলা মৃত জাতিকে জীবন্ত করতে আরম্ভ করল। খেলাফতের এসব বরকত সাংবাদিকতার জগতেও প্রকাশ পায়। 'যরবে

মুমিনের' নেতৃত্বে খাঁটি ইসলামী সাংবাদিকতার কচি চারা দ্রুত ডালপালাপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হতে থাকে। যরবে মুমিনের পশ্চাতে শহীদদের হাস্যোজ্জ্বল খুন, বেদনাকাতর উম্মাহর বেদনা, উন্মত্ত আবেগের আহ্বান, প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসরমান ইসলামী বাহিনীর অগ্রাভিযান, ঈমানী গায়রত ও লজ্জার সুগন্ধি এবং মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ কার্যকর ছিল। মিথ্যার প্রতাপের যুগে এ পত্রিকা সত্য লিখতে আরম্ভ করে। অতিরঞ্জনের গহ্বর থেকে আত্মরক্ষা করে সে ভারসাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করে। হতাশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সে আশার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে এবং মুসলমানদেরকে তাদের গৌরবময় অতীত স্মরণ করিয়ে দেয়।

আপনি নতুন যুগের ইসলামী প্রতাপ ও সজীবতা অবলোকন করতে চাইলে যরবে মুমিনের পুরাতন ফাইলসমূহ হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকুন। আপনি অনুভব করতে পারবেন যে, যে যুগে মুসলমানদের সাহসবর্ধক সত্যকে গোপন করা হচ্ছিল, সে যুগে যরবে মুমিন সুউচ্চ এক ষ্টেজ তৈরী করে। এমন ষ্টেজ, যা সবার সমানভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সে ষ্টেজে তীব্র আলোর লাইট লাগানো রয়েছে। সে ষ্টেজে যরবে মুমিন এমন ব্যক্তিত্বদেরকে এনে দাঁড় করিয়েছে, যাদেরকে দেখে মুসলমানদের হতাশা আশায় পরিণত হয়। তাদের সুপ্ত উদ্দীপনা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের মত তরঙ্গায়িত হতে আরম্ভ করে। এ ষ্টেজেই মুসলমানরা বর্তমান যুগের প্রকৃত আমীরুল মুমিনীনকে দেখতে পায়। যিনি নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ইসলামের এক একটি বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। এ ষ্টেজেই মুসলমানগণ শায়েখ উসামা বিন লাদেনকে সমগ্র বিশ্বের কাফেররা না চাওয়া সত্ত্বেও হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পায়। এ ষ্টেজেই মুসলমানদের মোল্লা বুরযান, মোল্লা মুহাম্মাদ, মোল্লা মুনীর ও মোল্লা এহসান ফারুকীর মত মহান শহীদ জেনারেলদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। যাঁরা ইসলামকে জীবন দিতে গিয়ে নিজেরা অমর জীবন লাভ করেন। এ ষ্টেজেই মুসলমানগণ শামিল বাসায়ূফ এবং যিলম খানের মত ইসলামের অকুতোভয় সিংহদেরকে রাশিয়ানদের কলিজা বের করতে দেখেছে। এ ষ্টেজেই মুসলমানগণ কান্দাহার ভূমিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্ত সিংহকে

আপন মুখমণ্ডলে পরাজয়ের কলঙ্ক লেপন করতে দেখেছে। এ ষ্টেজেই মুসলিম উম্মাহ্ বিলাল ও আফাকের মত উৎসর্গ প্রাণদের যিয়ারত লাভ করেছে। যাঁরা মুসলমানদেরকে বেঁচে থাকার এক উত্তম পন্থা শিখিয়েছেন। এ ষ্টেজেই মুসলমানগণ মোল্লা মুহাম্মাদ রব্বানীর মত মহান ব্যক্তিত্বকে দেখেছে। যাকে দেখে তাদের অনুভূত হয়েছে যে, প্রকৃত মুসলমান আজও বিদ্যমান রয়েছে।

যরবে মুমিনের সাজানো এ ষ্টেজ মুসলমানদেরকে আজও অনেক কিছু দেখাচ্ছে। এখানে মৃতহৃদয় লোকদেরকে জীবিত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করানো হয়। এখানে ভীরুতার রোগীদেরকে মুজাহিদদের বিজয়ের শক্তি বর্ধক শরবত পান করানো হয়। এখানে খুন দেওয়া ও খুন নেওয়ার মত মহান ইবাদত বিস্মৃতকারী লোকদেরকে রক্তাক্ত লড়াইয়ের ঈমানদীপ্ত চিত্র প্রদর্শন করানো হয় ও বুঝানো হয়। মজার ব্যাপার এই যে, হারাম চিত্র (ফটো) প্রকাশকারী পত্রপত্রিকা মহান ব্যক্তিত্বদেরকে মূল্যহীন করে দেয়। তাদেরকে পদতলে নিষ্পেষিত মূল্যহীন বস্তু বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে যরবে মুমিন মহান ব্যক্তিত্বদের মৃত ছবি প্রকাশ না করে, তাদের জীবন্ত কীর্তিগাঁথা তুলে ধরে। যার ফলে যরবে মুমিনের মহান ব্যক্তিত্বদেরকে এক নজর দেখার জন্য বিশ্ব হাপিত্যেশ করতে থাকে। খোদ যরবে মুমিন জীবন্ত কীর্তিগাঁথার অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্বদের বদৌলতে এক তাজা জীবন ও শক্তি লাভ করে। এছাড়া যরবে মুমিনের আরেকটি উৎকর্ষতা এই যে, সে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত এ ষ্টেজের সঙ্গে দুটি দর্পন স্থাপন করে দিয়েছে। যার এক দর্পনে ইসলামের দুশমনদের প্রকৃত ও ঘৃণার্হ চেহারা ও তাদের অন্যায় সংকল্পসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। আর অপর দর্পনে অতীতের যুগ নির্মাণকারী মুসলমান ব্যক্তিত্বদের সুদৃশ্য আলো দৃষ্টিগোচর হয়।

সুধী পাঠক! আসুন, এবার যরবে মুমিনের একটি করে কপি হাতে নিন। আপনি তাতে আহমাদ শাহ মাসউদ থেকে আরম্ভ করে দোস্তম পর্যন্ত এবং আরব উপসাগরে বর্তমান আমেরিকান সৈন্য থেকে আরম্ভ করে আরবের মরুভূমিতে অবস্থিত তাদের ঘাঁটিসমূহ পর্যন্তের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ সহজ শব্দে চিত্রিত দেখতে পাবেন। আপনি এ দর্পনের মাধ্যমে ইয়াসির আরাফাত, ফারুক আবদুল্লাহ ও আরবের মুনাফিকদের প্রকৃত

চেহারা দেখতে পাবেন। মোটকথা, ইসলামের যেসব দুশমনকে ইহুদী মিডিয়া ইসলামের বন্ধুরূপে দেখিয়ে মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে চেষ্টা করেছে, যরবে মুমিন সেই ইহুদী মুখোশকে উন্মোচন করে চোর ও গাদ্দারদেরকে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়েছে।

এমনিভাবে যরবে মুমিনের অপর দর্পনে আপনি অতীতের সুগন্ধিময় ব্যক্তিত্বসমূহের সুবাস ভরা আলোচনা দেখতে পাবেন। কুফর ও নিফাকের দুর্গন্ধময় পরিবেশে এ আলোচনা আমাদের নাসারন্ধ্রকে নতুন জীবন দান করে। আল্লাহ তাআলার আরো অধিক দয়া ও অনুকম্পা এই লাভ হয়েছে যে, তিনি যরবে মুমিনকে এমন বিশুদ্ধ অলংকারময় সাবলীল ভাষা দান করেছেন, যা গদ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কাব্যে দক্ষতা রাখে। যা সাংবাদিকতা শিল্পের বৈধ সূক্ষ্মতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। একথায় মোটেও অতিরঞ্জন নেই যে, যরবে মুমিনের কিছু কিছু কলামিষ্ট এ যুগের শ্রেষ্ঠতম কলামিষ্ট। এরা যদি প্রচলিত সাংবাদিকতার বাজারে নিজেদের কলম থেকে শব্দের মিছিল বের করত, তাহলে অনেক নাম করা কলাম লেখকের কলমের লজ্জায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রশান্তি ও প্রতিদান এসব কলামিষ্টকে অন্যদিকে দেখতেই দেয় না।

মোটকথা, যরবে মুমিন সত্য আবেগের বসন্ত আর শহীদদের খুনের সুবাস নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ায়, ইসলামী সাংবাদিকতা নতুন জীবন লাভ করে। যরবে মুমিনের পরে আত্মপ্রকাশকারী এ আঙ্গিকের বেশ কিছু পত্রিকা প্রচলিত সাংবাদিকতার হিরো পত্রিকাসমূহকে চরমভাবে হেয় করে ছাড়ে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যে, যরবে মুমিনের পর পাক্ষিক 'জাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)' এবং 'মাসিক বানাতে আয়েশা' পাঠক সমাজে কল্পনাতীত মকবুল হয়। ইসলামী সাংবাদিকতার এ সফলতা একদিকে দ্বীনের খাদেমদের জযবা ও সাহস বৃদ্ধি করে, অপরদিকে ইসলামকে মুহাব্বতকারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে খালেস ইসলামী ভাবধারার দৈনিক পত্রিকা বের করার দাবীও তীব্র হতে থাকে। গত এক বৎসরে অধমের নিকটও এ দাবী সম্বলিত অনেক চিঠি ও মৌখিক পরামর্শ আসতে থাকে। কিন্তু এ কাজ এত সহজ নয়

যে, পরামর্শ শুনতেই তার বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে। সুতরাং অধম এ ধরনের প্রত্যেক পত্রের উত্তরে দুআর দরখাস্ত করেই ক্ষান্ত হই। কিন্তু অন্তরে এর বাসনা বারবার জাগ্রত হতে থাকে যে, হায়! সত্যিই যদি এমন হত!

সময় অতিবাহিত হতে থাকে। আমরা পাক্ষিক পত্রিকা বের করার পর একটি মাসিক পত্রিকা বের করতে সক্ষম হই। কিন্তু দৈনিক পত্রিকা বের করার কল্পনা করতেও ঘাম ঝরতে থাকে। আল্লাহ তাআলা সাপ্তাহিক যরবে মুমিনের ব্যবস্থাপকদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তারা সৎ ও উচ্চসাহসিকতা প্রদর্শন করে 'দৈনিক ইসলাম' বের করার ঘোষণা দিয়েছেন। কেমন হবে এ দৈনিক? আপনাদের মত আমিও তীব্র আবেগ সহকারে তা দেখার জন্য প্রতীক্ষা করছি। তবে দৈনিকের সুন্দর নাম এখন থেকেই হৃদয়তন্ত্রীকে আনন্দাতিশায্যে গতিশীল করে দিয়েছে। সত্যিই কি ইসলামী সাংবাদিকতা দৈনিক বের করার যোগ্যতা লাভ করেছে? সত্যিই কি এমন এক দৈনিক আত্মপ্রকাশ করবে, যা প্রত্যেক মুসলমান স্বগৃহে মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রীর সম্মুখে নিয়ে যেতে পারবে? সত্যিই কি এখন আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের জিহাদের তাজা সংবাদ প্রতিদিন পড়তে পারব? সত্যিই কি শহীদদের আলোচনায় প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টি শীতল হবে? সত্যিই কি হারাম চিত্র ও নাজায়েয বিষয় থেকে পবিত্র একটি পত্রিকা প্রতিদিন সড়কে সড়কে বিক্রি হবে?

এসব প্রশ্ন আনন্দের তরঙ্গ হয়ে হৃদয়ে ভেসে উঠছে। আর মনকে পুলকিত করছে। কিন্তু কিছু আশংকা কালাসাপের মত ফনা উঠিয়ে দূর থেকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। এমন তো হবে না যে, দৈনিক পত্রিকা বের করার পরামর্শদাতারা বিশ্বাসঘাতকতা করে এ পত্রিকাকে বাদ দিয়ে উলঙ্গ ছবিওয়ালা পত্রিকা কিনতে থাকবে? পত্রিকার হকারদের মাফিয়া চক্র এ পত্রিকার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না তো? মুসলিম উম্মাহর দুশমন বিশ্বাসঘাতক সাংবাদিকরা এ পত্রিকার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে নাতো? মুসলমানদের পকেট এ পত্রিকা ক্রয় করতে কৃপণতা আরম্ভ করবে না তো? এ পত্রিকা থেকে জিহাদের বন্ধন কোন এক পর্যায়ে দুর্বল হয়ে যাবে না তো?

আমার অন্তর উত্তর দেয়, এ সমস্ত আশংকা অমূলক ও অনর্থক। নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ পত্রিকার পথে প্রতীক্ষার দৃষ্টি বিছিয়ে বসে আছে। তাদের দৃঢ় সংকল্প এই যে, এ পত্রিকাকে তারা একটি নেয়ামত মনে করে বুকে চেপে ধরবে। প্রত্যেক মুসলমানের নিকট এটি পৌঁছে দেয়াকে তারা নিজের সৌভাগ্য মনে করবে। উপরন্তু এ পত্রিকার পশ্চাতে এই মতাদর্শের বিরাট একটি শ্রেণী রয়েছে। এমন শ্রেণী, যা মুসলিম উম্মাহর নির্ভীক ও মুত্তাকী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। বিধায় আল্লাহর নুসরাত ও এই শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা এ পত্রিকার উপর কোন আঁচড় লাগতে দেবে না। বাকী সাংবাদিকদের হিংসার যে ব্যাপার, সে সম্পর্কে আমাদের কথা হল, এ পত্রিকা মুসলমানদের জন্য সন্ধি ও ভালবাসার পয়গাম নিয়ে আসছে। এটি কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। বরং এটি তো ইসলামের পুনর্জাগরণের পয়গাম। যে পয়গামে অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরাও লাব্বাইক বলে সাড়া দিবেন, ইনশাআল্লাহ। এ পত্রিকার সঙ্গে জিহাদের সম্পর্কের ব্যাপারে বক্তব্য এই যে, দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক যতটুকু, এ পত্রিকার সঙ্গে জিহাদ ও জিহাদের দাওয়াতের সম্পর্কও ঠিক ততটুকু। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। এ পত্রিকা দ্বারা জিহাদ আর জিহাদ দ্বারা এ পত্রিকা শক্তিশালী হবে।

হৃদয়ের উত্তর যথার্থ। সমস্ত আশংকা অনর্থক। তবে সত্য কথা এই যে, 'দৈনিক ইসলাম' মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। যদি আমরা পত্রিকার গায়ে লিখিত 'ইসলাম' শব্দের মর্যাদা রক্ষা করি ও তার মূলায়ন করি তাহলে এ শব্দ কাগজ থেকে অবতরণ করে ভূমিকে আলোকিত করবে। কিন্তু আল্লাহ না করুন, আমরা যদি তার মান রক্ষা করতে না পারি ও তার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে অকৃতজ্ঞতার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাসের শিক্ষা কি তা মনে রাখবেন!

শ্বেতাঙ্গদের কলঙ্ক

যে মুসলমান জাতি দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বকে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের সঙ্গে আহার দিয়েছে। আজ সেই জাতির কিছু দরিদ্র লোককে খাদ্য বন্ধ করে দিয়ে অনাহারে মারার ভয় দেখানো হচ্ছে।

যে মুসলিম উম্মাহ আফ্রিকার জংলীদেরকে ও ইউরোপের হিংস্রদেরকে মানুষের মত জীবন যাপনের পন্থা শিখিয়েছে, আজ সেই উম্মাহর আত্মমর্যাদাশালী লোকদেরকে উপবাসে মারার চেষ্টা চলছে।

যে জাতির ভূমি থেকে উদগত তেল সম্পদ আজ সমগ্র বিশ্বের প্রাণ। সে জাতিরই কিছু লোকের স্ত্রীদেরকে খাদ্যের বিনিময়ে আবরুহীন হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

যে মুসলিম উম্মাহ খৃষ্টান নারীর আবরু রক্ষার্থে কাল পর্যন্ত উন্দুলুসের উপকূলে নিজেদের কিশতি জ্বালিয়ে রক্তাক্ত লড়াই লড়ছিল, আজ সেই উম্মাহর মেয়েদেরকে কাফেরদের দাসী ও চাকরানী করার জন্য অনাহারী মুসলমানের পেটে তরবারী চালানো হচ্ছে।

যে জাতির সদস্যদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক এমন রয়েছে, যাদের সম্পদ গণনার জন্য লক্ষ টাকা বেতন দিয়ে আধুনিক, দক্ষ একাউন্টেন্ট রাখতে হয়। যাদের দস্তরখান থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার খাদ্য ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়, যাদের গৃহে পালিত কুকুর মখমলের কম্বলে নিদ্রা যায়, মাখন মাখানো পাউরুটি দ্বারা নাস্তা করে। যাদের সন্তানেরা অধিক তৈলাক্ত খাবার ভক্ষণ করার কারণে বাল্যকাল থেকে ডায়াবেটিসের রোগী হয়ে যায়, যাদের সম্পদের স্তূপ সামলাতে সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাংক অপারগ হচ্ছে, সেই জাতির কিছু লোকের শুকনো রুটি বন্ধ করার জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক মেধাবী লোকেরা গত একমাস ধরে আলোচনার নামে একটি ঘৃণিত ষড়যন্ত্র করে চলছে। কি সেই ষড়যন্ত্র? সে ব্যাপারে একবার ভেবে দেখুন।

১. একদিকে কাবুলের চুল্লীর বিষয় সমগ্র বিশ্বের মিডিয়াতে আলোচনায় আনা হয়েছে। যেন বিশ্ববাসী জানতে পারে যে, জাতিসংঘের সহমর্মী কর্মীরা আফগানিস্তানের তিন লক্ষ অনাহারী লোককে বহু বছর ধরে খাবার খাওয়াচ্ছে। এরা যদি আফগানীদেরকে

খাদ্য না দিত, তাহলে আফগানীরা অনাহারে মরত। কিন্তু তাদের এই বিরাট দয়া সত্ত্বেও তালেবান জাতিসংঘের কৃতজ্ঞতা আদায় না করে বরং সর্বদা তার সঙ্গে চোখ রাঙায় ও তার অবাধ্য হয়। জাতিসংঘের এ চক্রান্ত খুব জোরে শোরে চালু রয়েছে। বিবিসি লণ্ডন, থেকে আরম্ভ করে ভয়েস অব আমেরিকা পর্যন্ত সর্বত্র চুল্লী ও খাদ্যের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এ রকম বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আফগানীদের খাদ্যের ব্যবস্থা শুধুমাত্র জাতিসংঘই করছে। অথচ এখানে এমন অনেক বাস্তবতা রয়েছে, যেগুলো জেনে শুনে ইচ্ছা করে আড়াল করা হচ্ছে। যথা ঃ

ক. আফগানিস্তানের অধিবাসী কি তিন লাখ? তা না হলে অবশিষ্ট আফগানীদের খাবার অতীতে কে দিয়েছে এবং বর্তমানে কে দিচ্ছে?

খ. আফগানিস্তানের বিধবা, এতীম, পঙ্গু ও অসহায়দের সংখ্যা কি তিন লাখ? তা না হলে অবশিষ্টদের ব্যবস্থাপনা এ পর্যন্ত কে করেছে? আর বর্তমানে কে করছে?

গ. জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কতগুলো মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে অর্থ পায়? এসব অর্থের কত অংশ গরীব মুসলমানদেরকে খাদ্য দেওয়ার জন্য ব্যয় করা হয়?

ঘ. এসব চুল্লীর পেছনে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক পঁচিশ কোটি টাকা। এ কথা কি সত্য নয় যে, এ অংক জাতিসংঘের ছোট একটি সভার খরচের সমানও নয়?

এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে পাকিস্তানের কোন দূত বা মন্ত্রীর বহির্দেশের একটি ভ্রমণও হবে না। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে জাতিসংঘে কর্মরত কর্মকর্তাদের বেগমদের একদিনের দাওয়াই কেনাও হবে না।

আফসোস, যে জাতিসংঘের জুতার পালিশ আর গাড়ীর সার্ভিসের জন্য মুসলমানদের শত শত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, তারা একটি মুসলমান দেশে বার্ষিক পঁচিশ কোটি টাকার ছোট্ট একটি বাজেটের জন্য অশ্রু বিসর্জন করছে।

উপরোক্ত বাস্তবতাসমূহকে সামনে রাখলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আফগানিস্তানের মুসলমানরা মোটেও জাতিসংঘের সাহায্যে প্রতিপালিত হচ্ছে না এবং জাতিসংঘ কখনও তাদের উপর কোন প্রকার

অনুকম্পা করেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, সে যুদ্ধও তারা জাতিসংঘের সাহায্যে লড়েনি। এমনিভাবে গত ছয়, সাত বছর ধরে সমগ্র বিশ্বের কাফেরদের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে যুদ্ধও তারা জাতিসংঘের সাহায্যে লড়ছে না। অথচ যুদ্ধে অভিজ্ঞ লোকেরা অবগত আছেন যে, ছোট থেকে ছোট যুদ্ধেও অনেক সময় এত অধিক পরিমাণ গোলা বারুদ ব্যয় করতে হয়, যার মূল্য হয় পঁচিশ কোটির অধিক।

বর্তমানে বিশ্বের কাফের দেশসমূহ আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আর অগণিত অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। এসব অস্ত্র ব্যবহারে বহু ঘর বিরান হচ্ছে, প্রতিদিন বহু নারী বিধবা হচ্ছে। শিশুরা এতীম হচ্ছে, জীবনের গতি থেমে যাচ্ছে। বর্তমানে আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ বিধবা ও এতীম রয়েছে। পঙ্গুদের সংখ্যাও কম নয়। বিশ্বের জালিমরা বারুদের স্তূপ পাঠিয়ে তরুণদের রান উড়িয়ে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই পঙ্গুদের খাদ্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে সকলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দুই এক গ্রাস যাও বা দেওয়া হচ্ছিল, সারা বিশ্বে তার ঢোল পিটিয়ে বিভিন্ন বাহানায় এখন তাও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

২. চক্রান্তের দ্বিতীয় দিক আফগানিস্তানের জনসাধারণকে তালেবান আন্দোলন সম্পর্কে খারাপ ধারণায় লিপ্ত করা এবং তাদেরকে এ কথা বিশ্বাস করানো যে, জাতিসংঘ তাদেরকে সস্তায় খাদ্য দিতে এবং তাদের নারীদেরকে চাকরী দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু তালেবান হঠকারিতা করে আফগান জনসাধারণকে এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করছে।

উপরোক্ত ষড়যন্ত্রটি খুব জোরেশোরে চালানো হচ্ছে। তবে আফগানিস্তান থেকে দূরে অবস্থিত মুসলমানরা তো এ ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। কিন্তু খোদ আফগান জাতির উপর এর কোন প্রভাব পড়ছে না। কারণ, তাদের সম্মুখে তালেবানের সেই চেহারা বিদ্যমান, যা বিশ্ববাসীর সম্মুখে নেই। তালেবান আফগানিস্তানের যুদ্ধবিধ্বস্ত জনসাধারণকে নিরাপত্তা দিয়েছে। এমন নিরাপত্তা দিয়েছে, যার জন্য আফগান অধিবাসীরা বিশ বছর ধরে ব্যাকুল ছিল। তালেবান আফগান জাতিকে

ইসলামী ব্যবস্থা দিয়েছে। সে ব্যবস্থার বরকত দ্রুত দেখা দিচ্ছে। ইনশাআল্লাহ সে সময় দূরে নয়, যখন আফগান জাতিই সমগ্র বিশ্বে খাদ্য বিতরণ করবে। বিশ্বের দরিদ্র লোকেরা নিজেদের ভবিষ্যত গোছানোর জন্য আফগানিস্তানে আসবে। সে সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। তবে শর্ত হলো, আফগানিস্তানের লোকেরা ইসলাম ও শরীয়তের ব্যাপারে তাদের বর্তমানের ঈমানী রূপরেখার উপর অবিচল থাকতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ ও তার গোমস্তারা তালেবানকে সেই সোনালী মূলনীতি থেকে সরাতে চায়, যে মূলনীতির বরকতে অতীতে মুসলমানরা উন্নতি লাভ করেছিল। তারা আফগানিস্তানকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। যেখানকার শাসকগোষ্ঠী বৈষয়িক উন্নতির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও আমেরিকার সর্বপ্রকার আবর্জনা গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশ ইউরোপ হওয়ার পরিবর্তে দ্রুত আফ্রিকা হতে চলেছে। হায়! মুসলমানরা যদি একথা বুঝত যে, এই শ্বেত কাফেররা নিজেদেরকে ছাড়া কাউকেই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে ও মর্যাদার সাথে জীবন ধারণ করতে দিতে চায় না। তারা বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সূদভিত্তিক যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়েছে, তাতে মুসলমানদের উন্নতির অবকাশ মাত্রও নেই। বরং এটি এমন এক তলাহীন খাদ, যার প্রত্যেক পদক্ষেপে পূর্বেরটার চেয়ে অধিক গর্ত। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা সূদের কারণে সৃষ্ট সেই গর্তের পথপ্রদর্শক তথা গাইড। এসব বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ও তাদের প্রভাব–প্রতিক্রিয়া যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান অর্থ ব্যবস্থা আমাদের জন্য যদি সঠিকই হত, তাহলে অর্থনীতিবিদরা দেশের দরিদ্রতা এতদিনে দূর করতে পারত। অথচ প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। হায়! বিষয়টি যদি মুসলমানগণ ভেবে দেখত। হায়! শাসকগোষ্ঠী যদি স্বাধীনচেতা হয়ে সাহসের পরিচয় দিত।

জাতিসংঘের ধারণা ছিল যে, চুল্লি বন্ধের কথা উঠলেই সমগ্র আফগানিস্তানে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ঝড় শুরু হয়ে যাবে। তালেবানের বিরুদ্ধে বিধবা ও এতীমদের মিছিল বের হবে। 'উপবাস হঠাও, দেশ বাঁচাও' এর শ্লোগান দিয়ে নেতারা মাঠে নেমে আসবে। পরিশেষে

তালেবানকে বার্ষিক পঁচিশ কোটি টাকার খাদ্য লাভ করার জন্য জাতিসংঘের শর্তাবলীর সম্মুখে মাথা নত করতে হবে। কিন্তু আফগানিস্তানে এ ধরনের কোন কিছুই হয়নি। সারা বিশ্বের মিডিয়া চুল্লি বন্ধ হওয়ার কারণে সম্ভাব্য যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিল, তার নাম গন্ধও আফগানিস্তানে দেখা যায়নি। কারণ—

ক. আফগানিস্তানের মুসলমানরা ভালভাবেই জানে যে, তাদের রিযিকদাতা মহান আল্লাহ্।

খ. আফগানিস্তানের মুসলমানদের সে দেশের দ্বীনদার, জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান শাসকদের উপর আস্থা রয়েছে যে, তারা তাদেরকে বিপদের গর্তে একাকী ফেলে রাখবে না।

গ. আফগানিস্তানের সরকার যদি এসব কারণে মাথা নতই করত তাহলে বামিয়ানের মূর্তির মূল্য স্বরূপ তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার উসূল করতে পারত। এবং সে অর্থ দ্বারা বড় বড় চুল্লি জ্বালাতে সক্ষম হত। কিন্তু তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্মুখে কখনো মাথা নত করার ইচ্ছাই করেনি।

ঘ. আফগানিস্তানের মুসলমানরা জানে, মুসলিম উম্মাহ আজও বন্ধ্যা হয়নি। যে নারীরা আফগানিস্তানের আযাদীর জন্য বিশ্বের চতুর্দিক থেকে নিজেদের কলিজার টুকরোদেরকে প্রেরণ করে শহীদ করতে পেরেছে, তারা আফগানিস্তানের দরিদ্র লোকদের জন্য খাদ্য প্রেরণ করতেও সক্ষম। যারা নিজ সন্তানদেরকে শহীদ করাতে পারে, তাদের জন্য খাদ্য প্রেরণ করা কোন জটিল ব্যাপার নয়।

ঙ. আফগানিস্তানের মুসলমান আমেরিকান জাতির মত লালসী ও পেট পূজারী নয় যে, খাদ্যের জন্য তারা পথে নেমে আসবে। তারা তো ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ জাতি। তারা সর্বদা মুখের গ্রাস ত্যাগ করে ঈমান ও গায়রতের হেফাযত করে এসেছে।

চ. আফগানিস্তানের মুসলমানরা দেখছে যে, তাদের এ দরিদ্রতা ও রিক্ততা ক্ষণস্থায়ী। ইনশাআল্লাহ সত্বর তাদের উপর বিজয়ের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হবে। তাই সাময়িক ক্ষুধা নিবারণের জন্য চিরদিনের মর্যাদা কেন বিক্রি করব?

ছ. আফগানিস্তানের মুসলমানরা একা কালিমা পাঠ করেনি। তারা নিজেরা সার্বিক ত্যাগ-তিতিক্ষা শুধু নিজের স্বার্থে করেনি। বর্তমান বিশ্বে কালিমা পাঠকারীর সংখ্যা শত কোটির অধিক। কালিমা পাঠকারী মুসলমানদের অনেকেই আফগানীদেরকে নিজেদের উপর অনুগ্রহকারী মনে করে। তাদের নেতৃত্বকে অভ্যর্থনা জানায়। আফগানিস্তানের তিন লক্ষ মুসলমানের খাদ্যের ব্যবস্থা করা সমস্ত মুসলমানের জিম্মাদারী। ইনশাআল্লাহ তারা সে জিম্মাদারী পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। কারণ, তারা ভাল করে জানে যে, কৃপণতা ইহুদীদের স্বভাব। পক্ষান্তরে মুসলমানের স্বভাব দানশীলতা। মুসলমান তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে মূল্যবান নেয়ামতরাজি লাভ করে থাকে, যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে মন খুলে দান করে।

তালেবান সরকারের জাতিসংঘের সাথে আলোচনা চলছে। আলহামদুলিল্লাহ, আফগানিস্তানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। মুসলিম বিশ্বের নামকরা পরহিতব্রতী প্রতিষ্ঠান 'আর রশীদ ট্রাষ্ট' মুসলিম উম্মাহর মান রক্ষা করে ঘোষণা করেছে যে, জাতিসংঘ আফগানিস্তানের চুল্লীসমূহ বন্ধ করে দিলে আল্লাহর দেওয়া তাওফীক ও মুসলমানদের সহযোগিতায় আমরা সেগুলো চালু রাখব।

এ মুহূর্তে আমরা আর রশীদ ট্রাষ্টের সমবেদনশীল ব্যবস্থাপকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দুআ দিয়ে বলছি যে, আপনারা নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ ভাববেন না। আফগানিস্তানের উপর থেকে শ্বেত কাফেরদের কলঙ্ক পরিষ্কার করার কাজে সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকুন। আল্লাহ তাআলার নুসরাত ও তাঁর বান্দাদের সহযোগিতা আপনাদের সঙ্গে আছে।

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

'আল্লাহ তিনি, যিনি আপনাকে স্বীয় নুসরাত ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।' (আল-কুরআন)

দিল্লীর ডায়েরী

আমাদের দেশের নতুন 'রাষ্ট্রপ্রধান' দিল্লী, আগ্রা ও আজমির যাচ্ছেন। দিল্লীতে তিনি নিজ ভবন দেখবেন এবং সেখানকার রাষ্ট্রপতির ভবনে জিয়াফত খাবেন। আগ্রায় তাজমহল রয়েছে অর্থাৎ এক বাদশাহ ও তার রানীর ভালবাসার কবর। নিশ্চয়ই জীবিত যে কোন স্বামী-স্ত্রীই তা দেখে, তাদের সেই সময়ের কথা স্মরণ হয়, যখন তারা দুনিয়ায় থাকবে না, বরং পরজগতে নিজেদের আমলের হিসাব দিতে থাকবে। আশা করি তাজমহলকে দেখে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রী মহোদয়ও অন্তরে আখেরাতের চিন্তার নেয়ামত বয়ে আনবেন। তাদের অন্তরে অবশিষ্ট জীবনে এমন কিছু নেকী করে যাওয়ার উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, যা মরণের পরে কাজে আসবে। আগ্রায় আরো অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু প্রতারক হিন্দুরা সেগুলো দেখতে দিবে না। অন্যথা দিল্লী ও ইউ.পির সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানদের ক্ষত, তার চিহ্নসমুহ ও ক্ষতস্থানের উপর সজ্জিত হৃদয়বিদারক বহু উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে।

আজমীর শরীফ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)এর বাসস্থান। তিনি এমন এক মুজাহিদ ও দরবেশ বুযুর্গ, যাঁর চেহারার নূর হিন্দুদেরকে মুসলমান হতে উদ্বুদ্ধ করত। বর্তমানে খাজার শহরের সে নূরকে বিলুপ্ত করার জন্য বিদআত, কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্লাবন অশ্লীলভাবে ফুঁসে উঠছে। মানুষ সেখানে যায়, আর ফিরে এসে কক্ষের সমান বিরাট ডেগ, চুলার মত হা করা কাওয়াল, নৃত্য ও আস্ফালনের আসর এবং যিয়ারতকারীদেরকে লুণ্ঠনকারী চোর ও লুটেরাদের দাস্তান শোনায়। খাজার আলোচনা করে না। চিশতিয়া সিলসিলার স্বাদপূর্ণ আলোচনাও করে না। তাদের কোন কাজে হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)এর নূরানী প্রভাবও দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ করুন, আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যেন স্বীয় মুখমণ্ডলে সেই নূর ধারণ করে ফিরে আসেন, যে নূর হযরত খাজা সাহেবের চেহারায় চমকাত। চাঁদের মত ঝলমল করত। মানব হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করত।

সফর থেকে ফিরে তিনি পুনরায় দিল্লী আসবেন। এখানে লালকেল্লা অবস্থিত। যা কারো জন্য প্রতীক্ষা করছে। একটি বৃদ্ধ কুতুব মিনার

রয়েছে। যা প্রত্যেক পথিকের নিকট কুতুবউদ্দীন আইবেকের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। 'কুওয়াতুল ইসলাম' নামে একটি মসজিদ রয়েছে। যে মসজিদ নামাযীদেরকে নয় বরং গাজীদেরকে সন্ধান করছে। এ দিল্লীতেই তিহার কারাগারও রয়েছে। যেখানে বহু যুবক ধুঁকে ধুঁকে জীবন অতিবাহিত করছে। অনেক উদ্দীপনা ছটফট করছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের আলোচনা হলে আশা করি রাষ্ট্রপতি সাহেব তিহার কারাগারের কথাও স্মরণ রাখবেন। এখানে মকবুল বাটকে কেন ফাঁসি দেওয়া হল? সাজ্জাদ শহীদ স্বীয় জীবনের মূল্যবান দিন এখানে কেন অতিবাহিত করলেন? এখানে আজও কাশ্মীরের আযাদীর জন্য স্বীয় যৌবন ও আযাদী কুরবানকারী অনেক তরুণ বন্দী রয়েছেন। আশা করি রাষ্ট্রপতি সাহেব তিহার কারাগারের উঁচু প্রাচীরের অন্তরালে বন্দীদেরকে এবং তাদের আবেগসমূহকে বিস্মৃত হবেন না।

রাষ্ট্রপ্রধান সাহেবের দিল্লী সফর আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আমারও সে দিনের কথা স্মরণ হচ্ছে, যখন আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কাশ্মীর যাই। তারপর বন্দী হয়ে পুনরায় দিল্লী নীত হই। সেখানে জীবনের দুটি বছর অতিবাহিত হয়। এ তিহার কারাগারেই আমি অনেকগুলো স্মরণীয় কথা লিখে রাখি, যার কিছু ছাপা হয়েছে, আর কিছু ছেপে বের হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান সাহেবের সফরের বিস্তারিত আলোচনা তো আপনারা পত্রপত্রিকায় পাঠ করবেন। কার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন? কোথায় গেলেন? কি খেলেন? কি পেলেন? ঋতু কেমন ছিল? মুড কেমন ছিল? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কাশ্মীরের আযাদীর জন্য লড়াইরত মুজাহিদগণ যখন বন্দী হয়, তখন কারা–প্রকোষ্ঠে তাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হয়?

সুধী পাঠক! আসুন সে সম্পর্কে আমি দিল্লীর তিহার কারাগারে লিখিত ডায়েরীর একটি পৃষ্ঠা পাঠ করছি। তখন আমাদের বন্দী জীবনের ভাল সময় কাটছিল। নির্যাতনের ধারাও বন্ধ ছিল। ফলে লেখার কোথাও কোথাও রস ও উচ্ছাস উছলে পড়েছে।

"আজ বৃহস্পতিবার। ১৪১৭ হিজরীর রবিউস সানী মাসের ৬ এবং ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসের ২২ তারিখ। মনোরম ঋতু। হালকা হালকা

বর্ষণ ও শীতল বায়ূ গ্রীষ্মকে শীতে পরিণত করেছে। ভারতে এইচ. ডি. দেবগৌড়ের মোটা সোটা কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায়। প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ প্রদেশের কর্নাটকের অধিবাসী। তিনি জনতা দলের লিডার। ক্ষমতায় জনতা দলের সঙ্গে আরো তেরটি শরীক দল রয়েছে। সরকারের মাত্র একজন মৈত্রী মন্ত্রী আর দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুসলমান। কংগ্রেসের সভাপতি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও প্রতারণা ও ছলচাতুরীর দায়ে একটি মামলায় ফেঁসে আছেন। অপরদিকে সি.বি.আই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ইনভেষ্টিগেশন বেওয়ার্ড তথা জাতীয় তদন্ত সংস্থা অতর্কিত আক্রমণ করে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী শিখরামের বাড়ী থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা জব্দ করেছে। কাশ্মীরে সামনের মাসে নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়েছে। ডঃ ফারুক আবদুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্স নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজকে কাশ্মীরে দুটি বারুদ তৈরীর কারখানা ধরা পড়েছে। কারখানা দুটো হরকাতুল আনসারের বলে পত্রপত্রিকা দাবী করেছে।

আমি ১ নম্বর তিহার কারাগারের ৫ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ হাই সিকিউরিটি ওয়ার্ডের ই–ব্লকের তিন নম্বর সেলে বসে এ ডায়রী লিখছি। নতুন দিল্লীর তিহার কারাগার পাঁচটি কারাগারের সমন্বয়ে গঠিত। আমি ১ নম্বর কারাগারে অবস্থান করছি। ১ নম্বর কারাগারের কয়েকটি ওয়ার্ড রয়েছে। তার ১ নম্বরটি ভি.আই.পি ওয়ার্ড। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীও বন্দী ছিলেন। বর্তমানে সেখানে প্রখ্যাত হিন্দু সাধু নি.সি. চাঁদজী—যিনি চন্দ্রা স্বামী নামে পরিচিত, প্রতারণা মামলায় বন্দী আছেন। এ ওয়ার্ডের বন্দীরা খুব সুবিধা পেয়ে থাকে। ৮ নম্বর ওয়ার্ডটি ফরেনার ওয়ার্ড। এখানে বহির্দেশের লোকেরা বন্দী রয়েছে। আমাদের সাথীদের মধ্য থেকে নাসের মাহমুদ আফতাব (আযাদ কাশ্মীর) এবং মুহাম্মাদ আজীজ খান (আযাদ কাশ্মীর) ৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকেন। এতদ্ব্যতীত মাহফুজ আহমাদ, মুহাম্মাদ তাইমুর, আমজাদ খান ও মুহাম্মাদ শরীফ (বাংলাদেশ)ও এ ওয়ার্ডেই রয়েছেন। এসব ওয়ার্ড দুপুর ২টা থেকে ৩টা এবং রাত ৭টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। অবশিষ্ট সময় খোলা থাকে।

৫ নম্বর ওয়ার্ড অন্য সবগুলো থেকে পৃথক। এটিকে হাই সিকিউরিটি ওয়ার্ড এবং সর্বসাধারণ হাইলাইট বলে থাকে। এখানে তামিলনাড়ুর পুলিশ ফোর্স টি.এস.পি পাহারা দেয়। ওয়ার্ডটি ২৪ ঘন্টা বন্ধ থাকে। এ ওয়ার্ডের তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশকে ডি–ব্লক বলে। এতে দশটি সেল রয়েছে। সেগুলোতে ফিরোজ নামের কাশ্মীরী এক শিয়া যুবক ছাড়া বাকী সমস্ত বন্দী হয় হিন্দু না হয় শিখ। এক বছর পূর্বে আপন স্ত্রী নিম্মাশাহীকে হত্যা করে আগুনে জ্বালানোর দায়ে গ্রেফতারকৃত ইয়ুথ কংগ্রেসের লিডার সুশীল শর্মাও ডি–ব্লকে রয়েছে।

দ্বিতীয়টি ই–ব্লক। এতেও দশটি সেল রয়েছে। নয়টিতে লোক বাস করে। আর একটি অনাবাদ রয়েছে। অনাবাদ সেলটিতে অনেক পূর্বে একটি সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। আফ্রিকান মুসলমানরা পালানোর জন্য এটি খনন করেছিল। তখন এ ওয়ার্ডটিও ফরেনার ওয়ার্ডের অংশ ছিল। বর্তমানে সেলটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার লোকেরা সেলকে 'চাক্কী' বলে। ডি–ব্লক সংলগ্ন এক নম্বর সেলে আমাদের সঙ্গী নাসরুল্লাহ মানসূর রয়েছেন। আফগানিস্তানে রক্তাক্ত লড়াইকারী এ মুজাহিদ কমাণ্ডার তিরানব্বই সালের অন্ধকার এক রাতে অকস্মাৎ ভারতীয় সৈন্যদের বেষ্টনীতে আটকা পড়েন। একজন সাথীসহ বন্দী হন। দুই নম্বর সেলে রয়েছেন তিন ব্যক্তি। নাসিহুল্লাহ আফগানী, তিনি আফগানিস্তানের পাঞ্জেশীর প্রদেশের প্রখ্যাত আলেম কাজী আবদুল লতীফ সাহেবের সন্তান। তিনি ৯৪ সালে আর্মিদের হাতে বন্দী হন। সম্প্রতি তার পিতা ভারতে এসেছেন। এখন দুপুর দুটা বেজে ২৪ মিনিট। তিনি তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দেউড়িতে (গেটে) গিয়েছেন।

হাইলাইটের বন্দীরা সপ্তাহের শুধুমাত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আপনজনদের সাথে দেখা করতে পারে। নাসিহুল্লাহর মুক্তির ব্যাপারে আফগান দূতাবাস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সফল করুন। তিনি একজন ভাল ক্বারী। অধিকাংশ সময় তিনি আমাদেরকে নামায পড়ান। তার সঙ্গে রয়েছেন রেজাউল্লাহ আওয়ান। তিনি গুজরানওয়ালা জেলার উজিরাবাদের অধিবাসী। একজন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির সৎপ্রকৃতির সন্তান তিনি। বিবাহিত। এক মেয়ের পিতা।

তিরানব্বই সালে ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে বন্দী হন। ঐ সেলের তৃতীয় ব্যক্তি সাইফুল্লাহ খালিদ। মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। আযাদ কাশ্মীরের সুং (কাঁচরী)এর অধিবাসী। তিনি তিনজন সাথীসহ তিরানব্বই সালে ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে বন্দী হন।

তৃতীয় সেলে রয়েছি আমি। যার উল্লেখযোগ্য কোন অতীতও নেই, বর্তমানও নেই। চতুর্থ সেলে রয়েছেন সাজ্জাদ খান। তিনি কাশ্মীরে সাজ্জাদ আফগানী নামে পরিচিত। কাশ্মীরে হরকাতুল আনসারের প্রধান। ৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অকস্মাৎ তিনি ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে ধৃত হন। পাঁচ নাম্বার সেলে চেঙ্গিস খান নামের এক পেশাদার অপরাধী রয়েছে। তিনি ইউ.পির সাহসোয়ান এলাকার অধিবাসী। ছয় ও সাত নাম্বার সেলে রাজেন্দ্র ও হরিপ্রকাশ নামের দুজন হিন্দু থাকেন। উভয়ের নামে অনেকগুলো হত্যা মামলা রয়েছে। তারা হরিয়ানার অধিবাসী। প্রত্যুষে তারা আমাদেরকে রাম রাম বলে সালাম করে থাকে। আমাদেরকেও প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মাথা নেড়ে বা হাত নেড়ে উত্তর দিতে হয়।

আট নাম্বার সেলে শাহেদ লতিফ রয়েছেন। তিনি গুজরানওয়ালা জেলার মোড় আইরানাবাদের অধিবাসী। প্রথমে ৯৩ সালে হযরতবাল দরগাহে ধরা পড়েন এবং পালিয়ে যান। পরে ৯৪ সালে জম্মুতে ধৃত হন। ছয় নাম্বার সেলে খালিদ মাহমুদ রয়েছেন। তাকে পালোয়ান নামে ডাকা হয়। তিনি মাশহারার লোক। কিন্তু লাহোরে প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি ৯৪ সালে দিল্লীতে ধৃত হন। তৃতীয়টি এফ ব্লক। তাতে বাবর খালেছা ইন্টারন্যাশন্যালের দুই শিখ এবং দাউদ ইবরাহীমের পুরাতন সঙ্গী সাবাশ ঠাকুর ও যতীন্দ্র ঠাকুর রয়েছেন। তারা বর্তমানে দাউদের কট্টর বিরোধী। এফ ব্লকে শুধুমাত্র পাঁচটি সেল রয়েছে। এভাবে হাইলাইট ওয়ার্ড মোট পঁচিশটি সেলের সমন্বয়ে গঠিত। আমি এ ওয়ার্ডের তিন ব্লকেই থেকেছি। প্রথমে এফ ব্লকে ছিলাম। তারপর ডি ব্লকে যাই। এখন ই-ব্লকে রয়েছি।

আমার সেলের মধ্যে একটি ঘড়া রয়েছে, তার মধ্যে পান করার পানি রয়েছে। আরেকটি ঘড়া রয়েছে, তার মধ্যে আমি শুধু তেল আর

লবন দিয়ে কাঁচামরিচের আচার বানিয়েছি। প্রথম দিকে তা আমি খেতাম আর কেউ খেত না। এখন অন্যেরা খায়, আমি খাই না। একেক সময়ের একেক অবস্থা। একটি চাটাই রয়েছে, তাতে নামায পড়ি। একটি মশারী, একটি বিছানা, একটি পুরাতন ব্যাগ, কিছু কিতাব, কয়েকটি কলম রয়েছে, যেগুলো কখনো লেখে আর কখনো লেখে না। মাটির মধ্যে বানানো পানির ছোট একটি হাউজ রয়েছে। চিড়িয়াখানার পিঞ্জিরার মধ্যে যেমন থাকে। একটি পায়খানা রয়েছে। তাতে আমি পর্দা ঝুলিয়েছি। দুটি খাতা রয়েছে। একটি পলিথিন ব্যাগে কুরআন মাজীদ এবং মুনাজাতে মকবুল রয়েছে। আরেকটি ব্যাগে চিঠিপত্র রয়েছে। আরেকটি পলিথিন ব্যাগে রয়েছে ছাতু। সেগুলো বাড়ী থেকে ডাকযোগে এসেছে। সবগুলো ব্যাগ দেওয়ালে লটকানো রয়েছে। আর আমি খালি বিছানায় বসে এ কথাগুলো লিখছি।"

বসন্ত ঋতুর পুষ্প কুড়িয়ে নিন

কাশ্মীর জিহাদ অনেক লোকেরই চোখের শূল হয়ে বিঁধছে। আর কেনই বা বিঁধবে না? জিহাদের যে মহান কাজ প্রতিহত করার জন্য সমগ্র বিশ্বের ইহুদীরা বহু শতাব্দী ধরে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যা বন্ধ করার জন্য অনেকগুলো রাষ্ট্র বড় বড় বাজেট পাশ করেছে, যাকে বিলুপ্ত করার জন্য বিশ্বের অনেকগুলো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেই কাজ অর্থাৎ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বর্তমানে কাশ্মীর উপত্যকায় পূর্ণ প্রতাপের সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে। জিহাদ ইসলামের বিজয়ের জামানত ও মুসলমানদের অস্তিত্বের আলামত। জিহাদের শ্লোগান মুসলমানদের ঈমানের উত্তাপ ও প্রাণের মধুরতা। তাই কাফের গোষ্ঠী সর্বাবস্থায় জিহাদকে প্রতিহত করতে চায়, তাকে বন্ধ করে দিতে চায়। বর্তমানে জিহাদের বদৌলতেই ভারতের আগ্রাসী অস্তিত্ব বিপদের মুখে। জিহাদের অঙ্গার ভারতের অভ্যন্তরে সুদূর বিস্তার লাভ করেছে। জিহাদ মজলুম জাতিকে আযাদীর পাঠদান করে। তাদেরকে বেঁচে থাকার বরং মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার গূঢ় রহস্য শিক্ষা দেয়।

বহির্দেশের ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ ভারতের ঘাড়ে পা রেখে কাশ্মীরের জিহাদ বন্ধ করার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারতকে তারা বলছে যে, এতে শুধু তোমাদেরই নয়, বরং সমগ্র কুফরী বিশ্বের বিপদ রয়েছে। ইতিহাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মুসলমান যখন মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে যায়, সমগ্র বিশ্ব তখন তাদের পদধুলিতে পরিণত হয়। কিছু মুসলমান যখন কুরবানী করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তখন সে জাতির ঝঞ্ঝা বায়ুর অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করার শক্তি কারো থাকে না। উপরোক্ত প্রমাণসমূহ শুনে ভারত আলোচনার জন্য রাজি হয়ে যায়। তারা যে পাকিস্তানকে সব সময় শত্রু বলত, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। একথা সত্য যে, পৃথিবীর কোন শ্বেত বা কৃষ্ণ কাফেরই কাশ্মীরের মুসলমানদের ব্যাপারে সামান্যতম সমবেদনাও রাখে না। অন্যথা জাতিসংঘ ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র বোমার বৃষ্টি বর্ষণকারীরা কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতিসংঘের আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও চোখ বুঝে বসে আছে কেন? কাশ্মীরীরা মিছিল বের করেছে, কিন্তু তা দেখে কারো চক্ষু সিক্ত হয়নি। কাশ্মীরীরা বিক্ষোভ করেছে, কিন্তু তাতে কারো কান খাড়া হয়নি। কাশ্মীরী মুসলমানরা জাতিসংঘকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু জাতিসংঘ এ ব্যাপারে তাদের স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কাশ্মীরীরা হরতাল করেছে, কিন্তু কেউ কাশ্মীর সমস্যাকে 'সমস্যা' মনে করতেই তৈরী হয়নি।

বিশ্বের এ উদাসীনতা, অবচেতনা ও নিকৃষ্টতম অন্যায় পক্ষপাতিত্বের সুযোগে ভারত কাশ্মীরের উপর শক্তভাবে থাবা বসিয়ে দেয়। নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করে নেয়। বিশাল বিশাল সেনা ছাউনী, বাংকার, প্রত্যেক এলাকায় জঙ্গী হেলিপ্যাড, সশস্ত্রবাহিনী, স্থল ও আকাশ বাহিনীর বড় বড় সেনাদল কাশ্মীরের বুকের উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে যাচ্ছে। ফিল্ম কালচারকে ব্যাপক করা হয়েছে, যাতে কাশ্মীরের তরুণরা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বলিউডের পাগল হয়ে যায়। সিনেমা, ক্যাবল নেটওয়ার্ক, নাইট ক্লাব, বার এবং দুর্গন্ধময় পর্যটকদের শয়তানের দল কাশ্মীরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেন কাশ্মীরীরা মুসলমান না থাকে। আত্মমর্যাদাশীল না থাকে। যা কিছু কমতি ছিল তাও কাশ্মীরের নাপাক ও নির্লজ্জ পণ্ডিতেরা

পূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মুসলমান ও হিন্দুদের মাঝে বিবাহের প্রথা চালু করেছে, যেন আযাদীর উচ্ছাস শাহওয়াতের (যৌনতার) ঢলে ভেসে যায়।

এর সাথে সাথে কাশ্মীরীদেরকে পরস্পরের বিরোধীই শুধু নয়, শত্রুতে পরিণত করেছে। এক আল্লাহর কালিমা পাঠকারী কাশ্মীরীদেরকে পাহাড়ী ও শহুরে, গুজরী ও কাশ্মীরী দলাদলিতে লিপ্ত করেছে। শ্রীনগরের অধিবাসীদেরকে কপওয়াড়ার অধিবাসীদের শত্রু বানিয়েছে। অপর দিকে কপওয়াড়ার অধিবাসীদের অন্তরে শ্রীনগরের অধিবাসীদের বিরোধিতার বীজ বপন করেছে। 'মীর' ও 'বুট' 'ডারের' বিরোধী হয়েছে। পক্ষান্তরে 'ডার'কে 'বুটের' বিপক্ষে খাড়া করা হয়েছে। আমি 'সুপুরের' অধিবাসী, আমি 'অনন্তনাগের' অধিবাসী, আমি 'ডোড্হ'এর অধিবাসী, আমি 'পুঁছ' এর অধিবাসী, এসব সবক কাশ্মীরীদেরকে ছোট শিশুদের মত শিখানো হয়। এ সবই বাহ্যত অতি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার অধীনে করা হয়েছিল। সামরিক, জঙ্গী, ফিল্মী ও শয়তানীর এসব ব্যবস্থা দেখে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এখন কাশ্মীরীরা কিয়ামত পর্যন্ত ভারতের গোলাম হয়ে থাকবে। কাশ্মীরের মুসলমানরা হিন্দুদের চাকর হয়ে থাকাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে।

এসব ব্যবস্থা দেখে ভারতের প্রত্যেক লিডার ২+২=৪ এর মত অংক কষে দেয় যে, 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'। কথাটি ভারতের প্রত্যেক শয়তান গর্ব করে বলে, ভারতের পার্লামেন্ট একে আইনের মর্যাদা দেয়। মন্দীরের প্রসাদ ভক্ষণকারী দিশারীরা এ পরিস্থিতি দেখে আনন্দাতিশয্যে বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করতে থাকে। তারা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত আযাদ কাশ্মীরকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলতে থাকে। নির্বোধ সেই মুশরিকদেরকে খুশী করার জন্য ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এক নারী সম্মেলনে ঘোষণা দেয় যে, 'অতিসত্বর আমরা আযাদ কাশ্মীরকেও ফিরিয়ে নেব।' ঘোষণা শুনে মুশরিক নারীরা আত্মহারা হয়ে এমনভাবে নৃত্য করতে থাকে, যেভাবে নৃত্য করেছিল বদর যুদ্ধের পূর্বে মক্কার মুশরিক নারীরা।

কিন্তু এ সমস্ত জাদু মুহূর্তের মধ্যে অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়ে। সমগ্র বিশ্ব কাশ্মীরী মুসলমানদের জিহাদী শ্লোগান শুনে বিমূঢ় হয়ে যায়। গলায়

লকেট পরিধানকারী এবং ফার্নের নিচে জিন্সের প্যান্ট পরিধানকারী কাশ্মীরের তরুণরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে নেমে আসে। পরস্পরের বিভেদ জিহাদের উত্তাপে বিগলিত হয়। ভীরুতা 'ডল' ঝিলের গভীরে ডুবে মরে। ইণ্ডিয়ান কালচার পুলিশের ভয়ে পলায়নপর চোরের মত বোম্বের দিকে ছুট দেয়। সেনা ছাউনীসমূহ মুজাহিদদের শিকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। হেলিপ্যাড ভয়ে বিরান হয়ে যায়। কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদের আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। অথচ বিভিন্ন দিকের বুদ্ধিজীবীরা একে অসম্ভব বলত। নেতারা শীতল শ্বাস ছেড়ে বলত যে, কাশ্মীর আফগানিস্তানের মত নয়। কিভাবে লড়ব? কত জনের সাথে লড়ব? কোথায় লড়ব? অস্ত্র আনব কোত্থেকে? জাতির ভীরুতার সমাধান কিভাবে করব? পরস্পরের মতবিরোধ কিভাবে দূর করব?

কিন্তু এক মুহূর্তে চিত্র পাল্টে যায়। ক্লাসিনকভের মুখ তরতর করে সব প্রশ্নের হাতে কলমে উত্তর প্রদান করতে আরম্ভ করে। কাশ্মীরের পণ্ডিতরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। সি.আই.পি.এফ ভয়ে উচ্চ আদালতের দরজার কড়া নাড়তে থাকে। বি.এস.এফ এর হিরোরা বন্য পশুর মত পালাতে আরম্ভ করে। আর্মির বড় বড় সেনাদল কাশ্মীর পৌছতে থাকে। কিন্তু আন্দোলন আরো উত্তপ্ত হতে থাকে। মুশরিকরা সাহায্যের জন্য ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠায়। ইসরাইলীরা মাটি ঠুকে মাঠে নামে। কিন্তু তাদের নিজেদের লাশ নিয়ে ফিরে যেতে হয়। বিমান বাহিনী ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কাশ্মীরের পাহাড় ও অরণ্য তাদেরকে আচ্ছামত উপহাস করে। ব্লাকক্যাট কমাণ্ডো আসে, কিন্তু তারা মুখে কালি লেপন করে চলে যায়। রাষ্ট্রীয় রাইফেলস বাহিনী দর্পভরে আসে। কিন্তু খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে যায়। ভারত সরকার জগমোহনকে নিয়ে আসে। কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা ও সন্ত্রাস ভীরু বিড়ালের আওয়াজ প্রমাণিত হয়। তারপর একাত্তরের পরীক্ষিত খেলোয়াড় সাকসিনাকে আনা হয়। কিন্তু সেও খালি জাল আর ফাঁদ নিয়ে ফিরে যায়। তারপর অহংকারী কৃষ্ণ রায়ের যুগ আসে। সে বিরাট বিরাট দাবী করে। পরিশেষে লাঞ্ছিত হয়ে পরাজয়ের কালিমা মেখে প্রত্যাবর্তন করে।

ভারত সব কৌশলই প্রয়োগ করে, কিন্তু 'অটুট অঙ্গে' লাগা অগ্নি হনুমানের লেজে লাগা অগ্নিশিখার মত বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রথমে উপত্যকায় আন্দোলন চলছিল, ভারত নির্যাতন বৃদ্ধি করায় ডোড়হ এর পাহাড়ে আন্দোলনের দীপ জ্বলতে আরম্ভ করে। ভারত শক্তি বৃদ্ধি করে ফলে 'পুঁছে' ডোগ্রা শাহীর আঘাত খাওয়া মুসলমানরাও দাঁড়িয়ে যায়। কাশ্মীর আন্দোলন পীর পাঞ্জালের পাহাড় সারিকে নিজের গৃহ বানিয়ে নেয়। তারপর অধমপুর, রাজুরী এবং সমস্ত সীমান্ত জেলাসমূহ জিহাদের আওয়াজে প্রকম্পিত হতে থাকে। বর্ডারে তিন লক্ষ আর্মি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু মুজাহিদদের কাফেলা ঠিকই যাতায়াত করতে থাকে। ভারত মুজাহিদদের অস্ত্র ভাণ্ডার দখল ও ধ্বংস করার দাবী করে, কিন্তু তিন দিন পর্যন্ত মুজাহিদদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। হে আল্লাহ! এত বেশী অস্ত্র আল্লাহর সেই সিংহদের নিকট কোত্থেকে আসে? যা দেখে বিশ্বের কাফেররা বিমূঢ় হয়ে যায়। ভীতির তরঙ্গ তাদের মস্তকে আঘাত করে।

ভারত বহির্দেশের শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাশ্মীরে নির্বাচনের ছলনা করে। একজন কাঠের পুতুল প্রধানমন্ত্রীকে গদিতে বসিয়ে আবেগের বসে ঘোষণা করে যে, এখন কাশ্মীরের আন্দোলনের জাকান্দানী (মুমূর্ষু) অবস্থা। সে ঘোষণার প্রতিধ্বনি ইথারে ভাসছিল, এমন সময় অকস্মাৎ কারগীলের ঝড় সমগ্র ইণ্ডিয়াকে প্রকম্পিত করে। ভারতকে কুত্তার বমি চেটে খাওয়ার মত তার দাবী ফিরিয়ে নিতে হয়। অবস্থা দেখে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে বিলুপ্ত করার অলীক স্বপ্ন দর্শনকারীদের বদহজম শুরু হয়। কিছু গাদ্দারের মধ্যস্থতায় তারা কারগীলের আগুনকে নিভিয়ে দেয়। মুজাহিদদের হিতাকাংখীরা বিষাদগ্রস্ত হয়। প্রশ্ন উত্থাপনকারীরা প্রশ্ন উত্থাপনের নতুন সূত্র হাতে পায়। তারা প্রশ্ন করতে থাকে যে, কাশ্মীর আন্দোলনের পরিণতিও কি কারগীলের মত হবে? চায়ের টেবিলে কি আশি হাজার শহীদের খুনকে বিক্রি করে দেওয়া হবে? এভাবে পিছে হটতে থাকলে কাশ্মীরের ফলাফল কবে প্রকাশ পাবে? কাশ্মীর আন্দোলন গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে চলছে। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে না তো? এসব প্রশ্ন শুনে অনেকে কাশ্মীর জিহাদে সহযোগিতা করা

হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর অনেকে নানা প্রকার আশংকায় আক্রান্ত হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে কাশ্মীর জিহাদের দিগন্তে ঈমানের নূর নিয়ে 'জাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)' উদিত হয়। শহীদ আফাকের আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ভারতের চেতনা হরণ করে। অপরদিকে শহীদ বেলালের আত্মঘাতী আক্রমণ সমগ্র বিশ্বের কাফেরদের চরম ভাবনায় ফেলে দেয়। বিশ্বের শ্বেত ও কৃষ্ণ কাফেরদের চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। ভারতের হাত, পা ফুলে উঠতে থাকে। এমন সময় ইসলামের দুশমন–মস্তকসমূহ পুনরায় একবার একত্রিত হয়ে বসে। তারা কাশ্মীরীদেরকে টোপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারত সরকার কাশ্মীরী নেতাদেরকে আলোচনার টেবিলে আহবান জানায়। তাদের আহবানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাশ্মীরীদের মুখে স্বায়ত্বশাসনের টফি দিয়ে জিহাদের শ্লোগান বন্ধ করানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কাশ্মীরীদের সাথে সমবেদনার কথা বলে তাদেরকে মুজাহিদদের ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো তাদের লক্ষ্য ছিল। শান্তি ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আহত কাশ্মীরীদেরকে প্রলুব্ধ করা ও শান্ত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কাশ্মীরীরা এখন জিহাদের হাপরে জ্বলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে, হুররিয়াত কনফারেন্স দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

কোন কোন নেতার শিথিলতা সম্মিলিত সংকল্পের সম্মুখে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রচার মাধ্যমসমূহ কাশ্মীরীদের সাহস দীপ্ত ঘোষণা প্রচার করে যে, আমরা পাকিস্তানকে ছাড়া আলোচনা করব না। তখন ইসলামের দুশমন–মস্তকসমূহের মধ্যে পোকা কিলবিল করতে থাকে। দুশ্চিন্তা ও ব্যর্থতার কালো মেঘ তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে। বাধ্য হয়ে তারা শেষ খেলার সূচনা করে। যে সরকারকে তারা স্বীকারই করত না, তারা তাকে আলোচনার জন্য আহবান করে। আর কাশ্মীরীদেরকে সরিয়ে রাখে। যেন পাকিস্তান ও কাশ্মীরীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তারপর আলোচনার টেবিলে পাকিস্তান সরকারের সম্মুখে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার জন্য অশ্রু বিসর্জন করে তাদেরকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করা হবে, যা দ্বারা মুজাহিদদের এবং সরকারের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে।

ফলে কাশ্মীরে প্রজ্জ্বলিত আগুন ভারতের দিকে ধাবিত না হয়ে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবে।

গভীরভাবে পরিস্থিতি নিরীক্ষণকারীগণ ভাল করেই বুঝেন যে, ভারত খুশীতে নয়, বরং বাধ্য হয়েই আলোচনার জন্য আহবান করেছে। তিনটি ব্যাপার ভারতকে এ আহবান করতে বাধ্য করেছে। মুজাহিদদের স্বার্থক আত্মঘাতী আক্রমণ, হুররিয়াত কনফারেন্সের আলোচনায় অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি এবং কাশ্মীরী মুজাহিদদের ভারতের ভিতরে ঢুকে পড়ে বাবরী মসজিদের স্থলে নির্মিত মন্দির ধ্বংস করার প্রোগ্রাম। এ তিন কারণ না ঘটলে হিন্দু বেনিয়ারা এ পরিমাণ নত হত না। এখন তারা জোরেশোরে অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তানের হৃদয় বিক্রেতা কর্মীরা ও শিল্পীরা পংকিলতা গেলার আশা নিয়ে ভারত যাচ্ছে। অনেকে কাশ্মীর জিহাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় আছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রলোভিত করার জন্য দিল্লী ও আগ্রাকে বধূর মত সাজানো হচ্ছে। কাশ্মীর থেকে দৃষ্টি হটানোর জন্য ভিসা চালু করার কথা পত্রিকায় ছড়ানো হচ্ছে। এখন রাত সোয়া দুইটা, জুলাইয়ের ১২ তারিখ শুরু হয়েছে, আলোচনা আরম্ভ হতে মাত্র দু'দিন বাকী।

উঁচু পাহাড়ের পশ্চাতে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রাতদিন কুরবানকারী সিংহরা আলোচনা থেকে বেপরওয়া হয়ে জিহাদের পবিত্র রাজপথে অবিচল রয়েছে। তারা শহীদদের রক্তের রেখা ধরে তাদের পশ্চাতে পাগলপারা হয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের পকেটের কুরআন প্রত্যেক নামাযের মধ্যে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয় যে, তোমরা কখনই ব্যর্থ হতে পার না। কেননা জিহাদে সফলতা ছাড়া আর কিছু নেই। কাশ্মীরের চাবি ইসলামের এসব সিংহের হাতে। তাদের বৃদ্ধা মায়েরা সারা রাত জায়নামাযে অতিবাহিত করেন, আর তাদের যুবতী বোনেরা আঁচল প্রসারিত করে নিজের ভাইদের জন্য আল্লাহর দরবারে বিজয় ভিক্ষা চান। পবিত্র মক্কা–মদীনার আকাশ তাদের জন্য উত্থিত কান্নার রোলে সুবাসিত। বাতাস তাদের দেহ আলিঙ্গন করাকে সৌভাগ্য মনে করে। এরা ভারত জিহাদের এমন ঘোড় সওয়ার, যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের সুসংবাদ বহু শতাব্দী পূর্বে মুজাহিদদের ইমাম, তরবারীধারী

নবী, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল। সুউচ্চ মর্যাদার শাহাদাত কিংবা দিল্লীর মুকুট তাদের পথ চেয়ে আছে।

আফগানিস্তানের জিহাদে যারা অবিচল ছিলেন, তারা অনেক কিছু লাভ করেছেন। কাশ্মীরের মুজাহিদরাও অনেক কিছু পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ অনেক কিছু পাবেন। বর্তমান যুগের মুসলমানদের সৌভাগ্য যে,তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ দেওয়া ভারত জিহাদ লাভ করেছে।

হে মুসলমানেরা! এখন ঈমানের বসন্ত ঋতু। একদিকে জাইশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নির্ভেজাল শরয়ী ও ইসলামী দল, আর অপরদিকে ভারত যুদ্ধের মহান সৌভাগ্য। নিঃসন্দেহে এটি বসন্ত ঋতু। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে বঞ্চিত না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হোন। জাইশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহান এ জিহাদের স্বাদ লুটে নিন। দামী ও পবিত্র হওয়ার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করুন। আর আখেরাতের লাভজনক সঞ্চয়ের জন্য সম্পদও বিলাতে থাকুন।

সমাপ্ত

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪